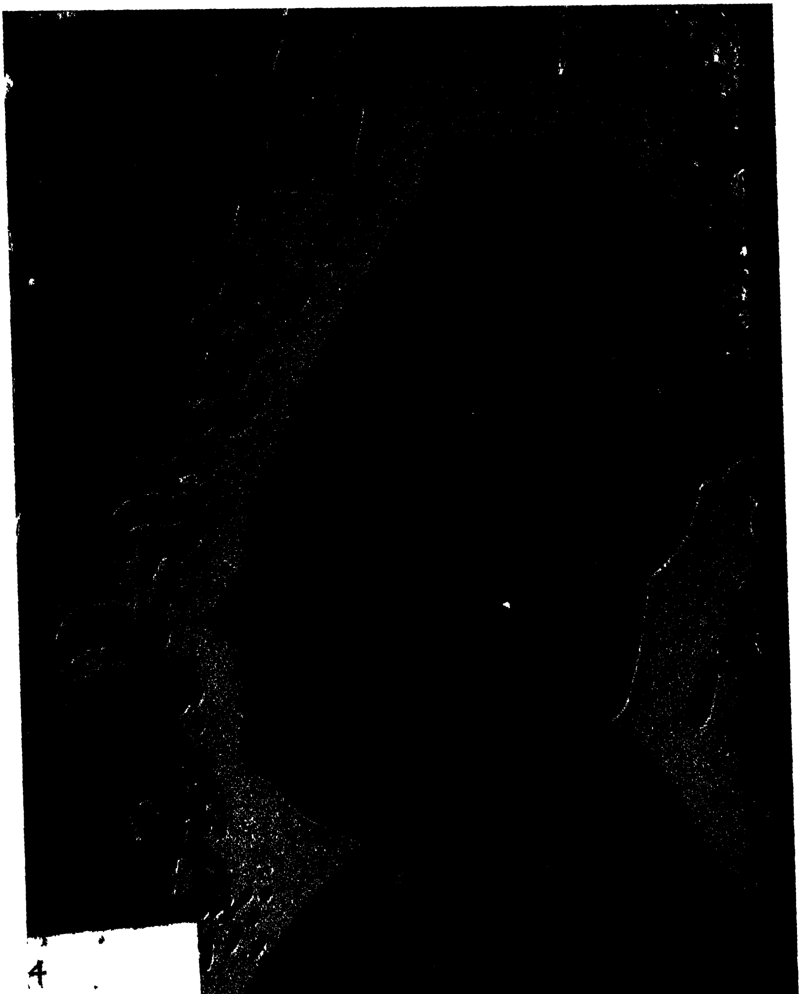


ঠাকুর বাড়ির গগনঠাকুর

পূর্ণিমা দেবী

ঠাকুরবাড়ীর গগনঠাকুর

পূর্ণিমা দেবী

যামিনী প্রকাশ ভবন

১০৬/১, রামমোহন সরণী,

কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রকাশক :
শ্রীমতী শান্তি সান্যাল
১০৬/১, রাজা রামমোহন সরণী
কলকাতা—৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ, দোল পূর্ণিমা—১৩৬১

প্রচ্ছদশিল্পী
মনোজ বিশ্বাস

দাম
দশ টাকা

মুদ্রক :
শ্রীঅনিল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
শঙ্কর প্রিণ্টার্স
২৭।৩বি হরি ঘোষ ষ্ট্রীট
কলকাতা—৬

পরিবেশক :
স্ট্যাণ্ডার্ড পাবলিশার্স কনসার্ন
৩, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট
কলকাতা—৭০০০০৯

যাঁর আশীর্ব্বাদে এই স্মৃতির মালা আনন্দে গেঁথে এসেছি আজও সেই
আপনজনের কথাই সবসময় জেগে উঠছে। তাঁরই উদ্দেশ্যে এই
স্মৃতির মালা অর্পণ করলুম। পাঠক পাঠিকারা যদি এই
বই পড়ে ও তাঁর কথা জেনে আমার মত আনন্দ পান
তাহলে আমি আরো সুখী হবো।

যে সকল সুধীজনের সাহায্য নিয়ে আমার এই প্রচেষ্টা
সার্থক হল তাঁদের আমার আন্তরিক
ধন্যবাদ জানাই।

ইতি—লেখিকা
পূর্ণিমা দেবী (চট্টোপাধ্যায়)

১৫বি, যতীন বাগচী রোড
কলিকাতা—২৯

মুখবন্ধ

যখন আমার বোনের ছেলে শ্রীদ্বারকানাথ চট্টোপাধ্যায় আমাকে বাবার কথা লেখার প্রেরণা দেয়, তখন বাবার অভাব নতুন করে অনুভব করলুম। বাবার স্মৃতিচিহ্ন বাইরে কোথাও বিশেষ পেলুম না। বাবার বাড়িটাও তখন লুপ্ত হয়ে গেছে। কিন্তু মনের দিকে নজর পড়তে দেখি আমার স্মৃতির পট বাবার কথায় ভরা, কোথাও একটু ফাঁক নেই। সেখানে শুধু বাবা একা নয়, বাবার সঙ্গে জড়িত সব কিছুরই সন্ধান পাওয়া গেল। এমন কি বাড়ির ঘরের কোণে আমাদের খেলার পুতুলগুলোতেও বাবার হাতের ছোঁয়া একটুও ম্লান হয়নি। এই স্মৃতিকাহিনী বাবার উদ্দেশ্যেই উৎসর্গ করলুম।

(১)

দ্বারকানাথ ঠাকুরের মেজ ছেলে গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দুই ছেলে ও দুই মেয়ে। বড় ছেলে গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ছোট ছেলে গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বড মেয়ে কাদম্বিনী ও ছোট মেয়ে কুমুদিনী। গণেন্দ্রনাথ অল্পবয়সে নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যান। গুণেন্দ্রনাথের তিন ছেলে—গগনেন্দ্রনাথ, সমরেন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ—এবং দুই মেয়ে—বিনয়িনী দেবী ও সুনয়নী দেবী। দ্বারকানাথ ঠাকুরের বৈঠকখানা বাড়ি ছিল বলে আমাদেব বাড়িটা জনসাধারণের কাছে বৈঠকখানা বাড়ি বলেই পরিচিত ছিল। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়িটা অন্দব বাড়ি ছিল। দ্বারকানাথ ঠাকুর লেনে ঢুকে ডানদিকে দুটো ফটকওয়ালা বাড়িটা ছিল আমাদের। তার এখন আর কোন চিহ্ন নেই। রাস্তার সোজা গেলে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়ি দেখা যায়, সেটা এখনও দাঁড়িয়ে আছে। বাঁদিকে আমাদের আস্তাবল বাডি ছিল। সামনে রেলিং ঘেবা মাঠ, ফোয়ারা ও বাগান ছিল।

আগে রবিদাদাব (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর) লাল বাডি ছিল না। হঠাৎ একদিন দেখলুম ইঁট, চুন, সুরকি এল বাড়ি হবে বলে। আমাদের চোখেব সামনে বাডি উঠতে দেখলুম। নীচে বিচিত্রা হল ছিল, উপবতলায় রবিদাদাব পরিবার থাকত।

১৮ই সেপ্টেম্বর, ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দ (বাংলা ৩রা আশ্বিন, ১২৭৪ সন), বুধবার, ঝড মাথায় করে পৃথিবীতে এসে জন্মালেন একটি ভাগ্যবান মহাপুরুষ—গগনেন্দ্র নাথ—স্থির শান্ত স্বভাব—মায়ের (সৌদামিনী দেবী) কোল আলো করে। মাও সকল দুঃখকষ্ট ভুলে গেলেন। বংশের, সকলের স্নেহের দুলাল, আদর-যত্নে মানুষ হতে লাগলেন। তখন কে জানত কত বড় শক্তি তাঁর ভিতর লুকিয়ে আছে, একদিন তিনিই স্বনামধন্য শিল্পী হবেন!

দিদিমার (সৌদামিনীদেবী ঠাকুরমাকেই আমরা বড়পিসীর মেয়েদের দেখাদেখি দিদিমা বলতুম) মুখে শুনেছি ছোটবেলা থেকেই বাবার অসীম ধৈর্য ছিল, কিন্তু মন খুব নরম ছিল, কারও কষ্ট দেখতে পারতেন না। এমন কি

মাছ-কাটা দেখলেও অজ্ঞান হয়ে যেতেন, রক্ত দেখলে সহ্য করতে পারতেন না। আমরা বড় হয়েও দেখেছি রক্ত দেখে অজ্ঞান হয়ে গেছেন।

যখন তাঁর বছর পাঁচেক বয়স তখন বাবাকে তাঁর অভিভাবকেরা St. Xaviers স্কুলে ভর্তি করে দেন। তখন আমার ঠাকুরদাদা বেঁচে ছিলেন। স্কুলে সে সময় খাটা পায়খানা ছিল। একদিন সেখানে বসতে না পেরে বাবা ভিতরে পড়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু কাঁদা বা কাউকে চেঁচিয়ে ডাকা কিছুই করেন নি। ছুটির পর বাড়ির চাকর তাঁকে আনতে গিয়ে ছেলের খোঁজ করলে দেখা গেল সেইখানেই দাঁড়িয়ে আছেন, কেউ জানে না। তখন চাকর তাঁকে চান করিয়ে বাড়িতে নিয়ে আসে। বাড়ি ফিরেও আবার চান করিয়ে কত ল্যাভেণ্ডর, সেণ্ট ঢেলে তবে ঘরে তোলা হয়। দিদিমা বলতেন, "ছোট গগনকে যখন যা-কিছু করতে বারণ করেছি, কখনও সে আমার কথা অমান্য করত না। যা বলতুম, তাই শুনত। ওর সরল স্বভাবের জন্য ওকে সকলেই ভালবাসত।"

ঠাকুরদাদা গুণেন্দ্রনাথের অকালমৃত্যু হওয়ায় দিদিমা খুব কাতর হয়ে চোদ্দ বছরের ছেলে গগনকেই আঁকড়ে ধরেছিলেন। অন্যান্য ছেলেরা তখন ছোট ছিলেন। ছেলেও হয়ত মায়ের দুঃখ কিছুটা অনুভব করেছিলেন বলেই সব সময় মায়ের কাছে থেকে তাঁকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করতেন। মাও নয়নের মণি গগনকে চোখের আড়াল করতে পারতেন না। সচরাচর দেখা যায় কোলের ছেলেমেয়ের উপরই মায়ের টান বেশী হয়। কিন্তু দিদিমার বেলায় দেখেছি বড় ছেলের উপরই তাঁর স্নেহ যেন বেশী ছিল, তাঁকে ছেড়ে থাকতে পারতেন না। আমরা বড় হয়েও দেখেছি যেখানেই যেতেন বাবার ঘরের পাশেই তাঁর থাকবার ব্যবস্থা থাকা চাই। তা না হলে তিনি আরাম পেতেন না। বাবাও তাঁর মতের বিরুদ্ধে যেতেন না, তিনি যা পেলে সন্তুষ্ট হন, তাই করতেন। এমন কি বাবার ছেলেমেয়েদেরও দিদিমা কাছ ছাড়া করতে পারতেন না। তাঁর নাতি-নাতনীর অভাব ছিল না, কিন্তু বাবার ছেলেমেয়েদেরই বেশী নিজের কাছে রাখতেন। বোধহয় বাবার স্বভাবের জন্যই নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছিলেন।

দিদিমার সব সময় ভয় ছিল যে, তখনকার দিনে অন্যান্য বড়লোকের ছেলেদের মত মাথার উপর পুরুষ অভিভাবক কেউ না থাকায় সাবালক হলে তাঁর ছেলেদের মধ্যেও হয়ত পানদোষ আসতে পারে। কারণ ঠাকুরবাড়িও

সে দোষ থেকে মুক্ত ছিল না। তাই ছেলেরা বয়স্ক হলে একদিন বাবাকে ডেকে বলেছিলেন, "আমার পা ছুঁয়ে কথা দে, কখনও মদ ছুঁবি না!" বাবাও মায়ের কাছে শপথ করে ধৈর্যের সঙ্গে বরাবর কথা রেখে এসেছিলেন। কোথায় মায়ের প্রাণে আঘাত লেগেছে বুঝতে পেরেই বোধ হয় মায়ের মনকে শান্ত রাখবার চেষ্টা করতেন। তিনি জানতেন, পানদোষেই গুণেন্দ্রনাথ মারা যান। দিদিমাও বোধহয় তাঁর গুণ ও মাতৃভক্তি দেখে তাঁকে অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন। তিনিও মায়ের আশীর্বাদে ধৈর্যের সঙ্গে অগ্রজের গুরুদায়িত্ব পালন করতে পেরেছিলেন। ছোট ভাইয়েরাও তাঁর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে চলতেন। যা দাদা করতেন তাঁরাও তাই করতেন, যেন একটি বৃন্তে তিনটি ফুল। বোনেরাও দাদাকে ছাড়া কিছুই জানতেন না। মাও ছেলেদের দেখে মনে শান্তি পেয়েছিলেন।

বাবাকে সকলে শিল্পী হিসাবেই বড় বলে জানে, কিন্তু পারিবারিক জীবনেও যে তিনি কত কৃতিত্ব রেখে গেলেন সে খবর হয়ত অনেকেই রাখে না। তাঁর কাছে বড় ছোট, আপন-পর, গরীব বড়লোক কোন তফাত ছিল না। কর্মচারীদের সামান্য দানও তিনি আদর করে গ্রহণ করতেন। আমার বড়দাদা গেহেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ও দিদি সুনন্দিনী চট্টোপাধ্যায়কে মানুষ করেছিল দাসী নিচুর মা। সে দেশ থেকে আসবার সময় ভেটের খই ও কদমা নিয়ে আসত। বাবা সেই কদমা ও খই ক্ষীর দিয়ে খেতে ভালবাসতেন। তারাও আড়াল থেকে খেতে দেখে আনন্দ পেত। বাবাকে ছোটবেলায় দুধ খাইয়েছিল যে দাই বাবা তাকে মাসোহারা দিতেন। সে যখন নিতে আসত, আমরাও তাকে দেখেছি। খুব বুড়ো হয়ে গিয়েছিল। আমরা তাকে 'ডাইনী বুড়ি' বলে রাগাতুম। বাবা আমাদের বকতেন। সে এসে বাবার দাড়িতে হাত দিয়ে চুমো খেত, গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে আশীর্বাদ করত, বলত, "গগন আমার ছেলের বাপ হয়েছে! বেঁচে থাক, একশ বছর পরমায়ু হোক! আমার কাছে ও সেই ছোটই আছে।" আমরা অবাক হয়ে দেখতুম। বাবা বিরক্ত হতেন না, বাধাও দিতেন না, পাছে সে মনে কষ্ট পায়। কাউকে তিনি কষ্ট দিতে ভালবাসতেন না।

ঐশ্বর্যের গর্ব তাঁর মধ্যে দেখতে পেতুম না একবার আমার শ্বশুরবাড়ী হাতীবাগানে বাবা বেড়াতে গিয়েছিলেন। মাও সঙ্গে ছিলেন। আমার শাশুড়ী (কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের মেয়ে সরোজিনী চট্টোপাধ্যায়) বাবাকে বলেন, "তোমার

জন্য একটা খদ্দরের উপর ছাপা কাজ-করা চাদর কিনেছি। যদিও তোমার অনেক শাল দোশালা আছে, তার কাছে সামান্য দাম। নেবে?" তাই শুনে বাবা বললেন, "আপনি যখন আমাকে ভালবেসে দিচ্ছেন আমার কাছে এর দাম শাল-দোশালার চেয়ে অনেক বেশী। নেব বৈকি, দিন।" অল্প শীতের সময় একদিন সেটা গায়ে দিয়ে শুয়েছিলেন। আমি গিয়েছিলুম। বললেন, "দেখ্, এই চাদর গায়ে দিয়েছি। বেশ ভাল চাদর।"

সকলকে বাবা সমান অধিকার দিয়েছেন। ভগবানের সৃষ্ট জীবকে তিনি ভালবাসা দিয়ে জয় করতে পেরেছিলেন। অতি বড় শত্রুও তাঁর সামনে এলেই শত্রুতা ভুলে যেত দেখেছি। তাই মনে হয় তাঁর শত্রু ছিল না। এমন মিষ্টি কথা কইতেন যে কথার বাঁধন ও মুখের সরল হাসি দেখেই লোকে রাগ ভুলে যেতে বাধ্য হত।

বাবার রঙ যে খুব ফর্সা ছিল তা নয়, কিন্তু তাঁকে সুপুরুষ বলা যায়। তাঁর এমন স্বভাবসুলভ সৌন্দর্য ছিল যে ঘরে বাইরে সকলেই আকৃষ্ট না হয়ে থাকতে পারত না। একবার আমার স্বামী নিশানাথ চট্টোপাধ্যায় কাজের ব্যাপারে প্রমথ প্রামাণিকের কাছে গিয়েছিলেন। তিনি বলেন, "মশাই আপনার শ্বশুরকে কি সুন্দর দেখতে। থিয়েটারে গিয়ে দেখি ওঁরা তিন ভাই বসে আছেন। থিয়েটার দেখব কি, আমি হাঁ করে খালি আপনার শ্বশুরকেই দেখছি!" বাবাকে সাধারণতঃ কখনও কোন বিষয়ে ধৈর্য হারাতে দেখি নি। কিন্তু একবার দেখেছিলুম, যখন আমার বড়দাদা মারা যায়, তখন ধৈর্য হারিয়ে শুয়ে পড়েছিলেন।

বাবার গানের গলা বেশ ভাল ছিল। পিয়ানো খুব ভাল বাজাতে পারতেন। ছবিও খুব ভাল তুলতে পারতেন। কতরকম সাজের ছবি তুলতেন। ছোটপিসী ও মাকে বাইজির সাজে সাজিয়ে হাতে এস্রাজ নিয়ে বসিয়ে ছবি তুলেছিলেন। অ্যালবামে সেই সব ছিল দেখেছি। দিদিও কতরকম কায়দায় ছবি তুলেছেন। কনে সাজান বা থিয়েটারের সাজ এবং স্টেজ সাজান ও কোথায় কিরকম সাজালে ভাল হবে বলে দিতেন।

(২)

দিদিমার মুখেই গল্প শুনেছি, দাদামশায় মারা গেলে অভিভাবক কেউ ছিল না। তাঁর বড় নন্দাই বিচক্ষণ লোক ছিলেন। তাঁর পরামর্শমত

চলতেন। দাদামশায় দেনা রেখে মারা যান। তিনি বড় খরচে লোক ছিলেন, বুঝে চলতে পারতেন না। খুব সৌখীন ছিলেন, অকাতরে দান করতেন, যে যা চাইত তখনই তাই দিয়েছেন। বাবার বড় পিসেমশায়কে আমরা দেখেছি, মাথায় টাক, ঠিক যেন পাকা আমটির মত ছিলেন। ইদানীংও দেখেছি কোনও কিছুর দরকার হলে তিনি আসতেন। তাঁর পরামর্শ নিয়েই সব কাজ হত। দাদামশায়ের চেয়েও তাঁর বোন বয়সে বড় ছিলেন বলে দিদিমাও তাঁকে সমীহ করে চলতেন। তাঁকে আমরা বেনে পুকুরের দাদা বলতুম। তাঁর নাম ছিল যজ্ঞেশপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়।

বাবার পিসীরা আগেই মারা যান, পিসেমশায়রা বেঁচেছিলেন। তাঁদের মধ্যে ছোট যিনি, তাঁর নাম নীলকমল মুখোপাধ্যায়। বড়পিসীর নাম কাদম্বিনী ছোট ছিলেন কুমুদিনী। বড়পিসীকে দেখতে খুব সুন্দর ছিল, ছোটকে তেমন দেখতে ছিল না। বড় যতদিন ছিলেন, তিনিই গৃহিণীপনা করতেন, খুব পাকা গিন্নী ছিলেন। বাবাদের বিয়ের পর ঘরের অভাব হওয়ায় দিদিমার সংসার তাঁর হাতে তুলে দিয়ে বাবার পিসীরা নিজেদের বাবার দেওয়া বাড়িতে চলে যান। এখানে তখন নতুন ঘর তৈরী হয়, সেখানে আমার ছোটপিসী থাকতেন। সেই ঘরের পাশে বারান্দা ছিল, সেই বারান্দায় দিদিমা বসতেন, যেমন বাইরে বসতেন বাবা কাকারা। দিদিমার কাছেই খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা ও লোকজনের আসা যাওয়া হত।

বাবার সতের বছর বয়সে তাঁর পিসীরাই তাঁর বিয়ের ঠিক করেন। গাজীপুরের সাবজজ মৃত্যুঞ্জয় মুখোপাধ্যায়ের পরমাসুন্দরী তৃতীয় কন্যা প্রমোদ কুমারীকে দেখে পছন্দ হয়। মায়ের মুখে শুনেছি, মায়ের ঠাকুরমার একটু মাথার দোষ ছিল। বারে বারে দিদিমার মেয়ে হতে দেখে রেগে যেতেন। যখন বৌয়ের সন্তান হবার সময় হোত খেতে দিতেন না, ঘরে চাবি দিয়ে রেখে দিতেন। আমার দিদিমা তখন ঘরের জানলা দিয়ে নীচে তাঁর ঝিকে বলতেন। সে দোকানের খাবার এনে দিলে তিনি গায়ের কাপড় খুলে উপর থেকে ঝুলিয়ে দিতেন। সে কাপড়ে খাবার বেঁধে দিত, তিনি তুলে নিয়ে খেতেন। শাশুড়ী জানতে পেতেন না। বোধহয় এই সব কারণে ছটি মেয়ে মারা যায়। তাই দেখে আমার দাদামশায় ভাবেন, কি করে এর প্রতিকার করা যাবে। এদিকে মাকেও কিছু বলতে পারেন না। তখন ঠিক করলেন, বিদেশে কাজ নিয়ে চলে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। তাই গাজীপুরে গিয়ে ওকালতি করেন।

সেই সময় আমার দিদিমাকেও এখান থেকে নিয়ে গেলেন। গাজীপুর থেকে পরে এলাহাবাদে সাবজজ হয়ে আসেন। এলাহাবাদেই মায়ের জন্ম হয়।

দাদামহাশয় রিটায়ার করে কাশীতে বাড়ি তৈরী করে বসবাস করতেন বলে আমরা তাঁকে কাশীর দাদা বলতুম। তাঁর ছেলে ছিল না, ছয় মেয়ে ছিলেন। বড় বাদে সব মেয়েদেরই ঠাকুর-পরিবারে বিয়ে হয়। দাদামশায় গাজীপুরে থাকতেই বড মাসী ভূপেন্দ্রবালার বিয়ে দেন। বড় মেসোমশায়কে আমরা কখনও দেখি নি। মেজমাসী নরেন্দ্রবালাব সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দৌহিত্র সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়ের বিয়ে হয়। মা মেজ। হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মেজ ছেলে ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে ন মাসী ধৃতিকুমারীর, আর নতুন মাসী সুনীলার সঙ্গে যজ্ঞেশপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়েব ছেলে জ্যোতিঃপ্রকাশের ছেলে শিল্পী যামিনীপ্রকাশের বিয়ে হয়েছিল। ছোটমাসী অনিলার একটু বেশী বয়সে বিয়ে হয়েছিল তাই আমাব খানিকটা মনে আছে। মায়ের সঙ্গে চোরবাগানে গিয়েছিলুম। মায়ের দূর সম্পর্কের বোন—কিবণমাসীর ছেলে নিকুঞ্জনাথ ঠাকুরের সঙ্গে বিয়ে হয়। দাদামশায় যখন কাশীতে এসে জজিয়তী করতে থাকেন তখন আরদালী বাজারে দুখানা বাড়ি করে বসবাস কবছিলেন। ছোটমেসোমশায়ের অবস্থা ভাল ছিল না বলে দাদামশায় ছোটমাসীকে নিজের কাছেই রেখেছিলেন। নিকুঞ্জনাথ ঠাকুর মারা গেলে কোন অভিভাবক না থাকায় আমার বাবাকে একজিকিউটর কবে ছোটমাসীর ছেলে সুনীতকেই সব দিয়ে যান। সে এখন চোরবাগানের বাড়িতে থাকে। মাসীদের নাম মায়ের মুখ থেকে যেমন শুনেছি সেইরকমই এখানে দিলুম।

দাদামশায়ের আদি বাড়ি ছিল চোরবাগানে। খুব বড নয়, তবে দোতলা চকমেলানো দু-মহলা বাড়ি। যখন কলকাতায় আসতেন সেইখানেই উঠতেন।

দাদামশায় ছিলেন চোরবাগানের ঠাকুর পরিবারেব হরচন্দ্র ঠাকুরেব দৌহিত্র। দিদিমা (কাশীর দিদি) সুরসুন্দরী দেবী ছিলেন দ্বারকানাথ ঠাকুরের বডভাই রাধানাথ ঠাকুরের পৌত্রী, মথুরানাথ ঠাকুরের কন্যা। বিয়ের সময় মায়ের বয়স ছিল ন বছব। মায়ের গানের গলা খুব ভাল ছিল। নাচতেও পারতেন। দেখতেও সুন্দর ছিলেন। সাদা গোলাপী আভা রং ছিল। বেশ লম্বা, চওড়া চেহারা। মা ও মেজমাসীকে দেখলে ভুল হোয়ে যেত। তিনিও খুব সুন্দরী ছিলেন। অন্য বোনেরা অত সুন্দরী ছিলেন না। দিদিমা ও

দাদামশায়কেও সুন্দর দেখতে ছিল। পশ্চিমে থাকার ফলে মা, মাসীরা দিদিমা সকলেই এমন ভাল হিন্দী কথা বলতেন যে বাঙালী বলে মনে হোত না। যখন সেখানকার লোকদের সঙ্গে কথা কলতেন, তখন পশ্চিমা বলেই মনে হোত। তখনকার দিনের সাধারণ মেয়েদের মতই লেখাপড়া জানতেন। অন্য মাসীরা তবু সময় পেয়েছিলেন। মায়ের ন বছর বয়সে বিয়ে হওয়ায় লেখাপড়া বিশেষ শেখা হয়নি। এখানে এসে মেম রেখে ইংরিজি শিখেছিলেন। তাও বেশী শিখতে পারেন নি। এগারো বছর বয়সে ছেলে হলে লেখাপড়া থামা পড়ে যায়। তার মধ্যে থেকে যতটুকু শিখেছিলেন কাজ চালাতে অসুবিধে হোত না। মা ন বছরে বিয়ে হয়ে এসেছিলেন, কিন্তু দিদিমার মৃত্যুর সময় কাশীতে যাওয়া ছাড়া কখনও তাঁকে বিদেশে দাদামশায়ের কাছে যেতে দেখিনি। এখানে চোরবাগানের বাড়িতে যেতেন বটে, কিন্তু রাত কাটাতেন না। আমাদের এখানে সকল ভার তাঁর উপরেই ছিল। হাসিমুখেই সব দায়িত্ব নিয়েছিলেন। স্বাস্থ্যও খুব ভাল ছিল। শেষ অবধি নিজের কাজ নিজে করতেন। তেমনি পরিষ্কার পরিপাটি ছিলেন। অপরিচ্ছন্নতা দেখতে পারতেন না। সেবাযত্নেও পটু ছিলেন।

(৩)

যখন আমার তিন বছর বয়স—মা দিদিমার কাছে শুনেছি—বড় ভূমিকম্প হয়েছিল কলকাতায়। বাবা কাকারা, এ বাড়ি ওবাড়ির সবাই কংগ্রেসের কনফারেন্সে গিয়েছিলেন নাটোরের রাজবাড়িতে. বাড়িতে পুরুষদের মধ্যে ছিলেন একমাত্র ছোট পিসেমশায় (রজনীমোহন চট্টোপাধ্যায়)। বিকেলবেলা চারটা নাগাদ ভূমিকম্প শুরু হয়। সকলে মিলে তাড়াতাড়ি বাড়ি ছেড়ে বাগানে নেমে গেলেন। সেখানে গিয়ে মায়ের খেয়াল হল যে আমি নেই। ‘বুড়ি (আমার ডাক নাম ছিল বুড়ি) কোথায় গেল’ ‘বুড়ি কোথায় গেল’ বলে খোঁজাখুঁজি করতে লাগলেন। আমার দেখাশোনার ভার ছিল শ্যামাদাসীর উপর। সে ছিল একটু হাবাগোবা গোছের। তাকে জিজ্ঞেস করলেন আমার কথা। সে ঠিক করে কিছু বলতে পারল না। বাড়ি তখন ভীষণ দুলছে, উপরে যেতেও কেউ সাহস করছে না। এদিকে আমি তিনতলায় দিদিমায় বারান্দায় বাথটবের মধ্যে জল নিয়ে খেলা করছি। মাথার উপরে যে একটা টালি ঝুলছে সে খেয়াল করার বয়স তখনও হয়নি। গঙ্গাদীন ভারী জল

দিতে গিয়ে আমাকে ঐভাবে দেখতে পেয়ে তাড়াতাড়ি করে কোলে তুলে সরিয়ে নিতেই ঝুলন্ত টালিটা ভেঙে বড়ল। বাড়ির চারদিকে সব কিছুই তখন দুলছে, সিঁড়ি দেয়াল ভেঙে পড়ছে। তারই মধ্যে দিয়ে কোনরকমে সিঁড়ি টপকে লাফাতে লাফাতে আমায় নিয়ে গঙ্গাদীন নীচে এসে থামল। সেই দেখে সকলে আশ্বস্ত হলেন।

ভূমিকম্প শেষ হবাব পর রাতের দিকে খুব বৃষ্টি নামল। বাড়ির চারদিকে ভাঙাচোরা। কেউ আর উপরে উঠতে সাহস করলেন না। ছোটপিসীর মহলের দিকটা নতুন করে তৈরী হয়েছিল। সেদিকের একতলার ঘরগুলো পরিষ্কার করে সেখানেই রাত কাটানোর ব্যবস্থা হল। একটু স্থির হয়ে বসে তখন বাবা কাকাদের জন্য ভাবনা শুরু হল। তাঁদের কোন খবর নেই। ট্রেন বন্ধ, টেলিগ্রাম বন্ধ। তিনদিন বাদে জলকাদা ভেঙে হাঁটতে হাঁটতে সবাই বাড়ি ফিরলেন। ফিরে এসে বাবা গঙ্গাদীনের কথা শুনে তাকে মোটা বখশিস করলেন। এদিকে বাড়ি আগাগোড়া মেরামত করা দরকার। তাই ঠিক হল সপরিবারে চেঞ্জে যাওয়া হবে মুঙ্গেরে, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বাড়িতে, পীর পাহাড়ে।

এ পর্যন্ত আমার শোনা কথা। বছর পাঁচেকের পর থেকেই আমার সব কথা মনে আছে। দিদিমা সন্ধ্যেবেলায় মুখহাত ধুয়ে এসে হলঘরে বসতেন। আত্মীয়স্বজন লোকজনের আসাযাওয়া শুরু হত, গানবাজনা চলত।

দিদিমার এক দূর সম্পর্কের বোন ছিলেন, কলকাতায় সিমলেয় তাঁর বাড়ি ছিল। তাঁকে আমরা সিমলের দিদি বলে ডাকতুম। তিনি মাঝে মাঝে আমাদের বাড়িতে এসে থাকতেন। তাঁর কাছে সন্ধ্যের সময় হলে বসে আমরা রূপকথা, রাজা রাণী, গোলেবকাওলীর গল্প হাঁ করে শুনতুম। তাঁর থলের গল্প ফুরিয়ে গেলেও ছাড়তুম না। তখন তিনি বলতেন, "এক রাজার এক খাঁচা ভর্তি পাখী ছিল। রোজ একটি করে পাখী ফুরুত হয়ে যেত।" সে গল্প শুনতে আমাদের ভাল লাগত না। আমরা ধরে বসতুম ভাল গল্প বলতে হবে। সেই শুনে দিদিমা একদিন বললেন, "আমার কাছে আয়, আমি একটা ভাল গল্প বলছি।" আমাদের উৎসাহে দিদিমা বলতে শুরু করলেন, "তোর বাবার যখন চার বছর বয়স, তোদের দাদামশায়ের সঙ্গে আমার একবার খুব তর্ক হয়—বিপদের সময় মা নিজের জীবন আগে বাঁচাতে চায়, না ছেলের কথা আগে ভাবে। আমি বললুম, ছেলের জীবনই মায়ের কাছে সবচেয়ে প্রিয়।

তিনি বললেন, না, নিজের কথা বিপদের সময় সবাই আগে ভাবে। সেদিন তর্কের আর মীমাংসা হয়নি। তারপর অনেকদিন কেটে গেছে, তর্কের কথা ভুলেই গেছি। সেবার মল্লিকদের রিষড়ের বাগান ভাড়া করে বেড়াতে গেলুম। গগনকেও সঙ্গে নেওয়া হল! তোর বেনে পুকুরের দাদা-দিদিরাও ছিল। বাগানে গিয়ে সন্ধ্যের সময় একদিন ঘাটে বসে আছি, গগন কাছেই রয়েছে। হঠাৎ 'হালুম' করে একটা বাঘ এসে লাফিয়ে পড়ল। তখন সে অঞ্চলে বাঘ বেরোন কিছু অসম্ভব ছিল না। বাঘের ভয়ে সবাই হাঁউমাউ করে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলুম। তাড়াহুড়োয় গগন বাইরেই পড়ে রইল। ধাতস্থ হয়ে খেয়াল হল সে কথা। তখন তোর দাদামশায় বললেন, 'দেখলে তো, ছেলেকে ফেলে সবাই পালিয়ে এলে! এখন দেখগে' সে কোথায় গেল।' ভয়ে ভয়ে বেরিয়ে দেখি, কোথায় বাঘ! বাঘের সাজে বহুরূপীর সঙ্গে ছেলে খেলা করছে। বহুরূপীর সঙ্গে চুপিচুপি বন্দোবস্ত করেই তোর দাদামশায় এই কাণ্ড করিয়েছিলেন। তখন পুরনো তর্কের কথা মনে হতে সবাই মিলে হাসাহাসি করতে লাগলুম! তর্ক করে যে কথার মীমাংসা হয়নি, এখন সহজেই তা প্রমাণ হয়ে গেল!

রোজই এমনি সন্ধ্যেবেলা সকলে এসে জড় হত। আর সবাই চলে গেলে তখন আমাদের আসর বসত। সাড়ে নটায় তোপ পড়লে দিদিমা খেতে যেতেন, আমরা শুতে চলে যেতুম।

(৪)

বড়পিসী আমাদের বাড়িতে দিনকতক এসে ছিলেন। তখন তাঁর একটি ছেলে হয়। প্রসবের সময় খুব কষ্ট পেয়েছিলেন। কালীর মানসিক করে ছেলে হয়েছিল বলে নাম রেখেছিলেন কালিদাস (বড়পিসেমশায় শেষেন্দ্রভূষণ চট্টোপাধ্যায়ের ছেলে)। দিদিমার ঘর ও আমাদের ঘরের মাঝখানে বড়পিসীর মেয়েরা, অমিয়বালাদি (ডাক নাম ক্ষুদি) এবং প্রতিমাদিদি থাকত। তখন অপর্ণা হয়নি। বড়পিসীর পুরনো দাসী মালতী ধুপ জ্বাল দেওয়া হলে ওদের ঘুম থেকে উঠিয়ে দুধ খাওয়াত। আমার সেই দৃশ্যটাই মনে আছে। সে সময়কার ঘটনা খুব অল্পই মনে পড়ে।

বড়পিসীর শরীর খারাপ হওয়ায় তাঁকে নিয়ে বেনারস যাওয়া হয়। বড়পিসী আমাদের ঘরের পাশের ঘরেই থাকতেন। তার পিছনে একটা ছোট

বারান্দা ছিল, সেখানে বড়দাদা আর কনকদাদা দুজনে দুটো বাঁদর পুষেছিল, তাদের বেঁধে রাখত। আমাদের ঘরের পাশে পোড়ো একটা মাঠ ছিল। সেখানে রাত্রে ঝমঝম শব্দ হত। আমাদের ভয় করত। মা বলতেন, "ও কিছু না শজারু আসে। সকালে খুঁজলে তার কাঁটা পাবে, বেশ কলম হয়।" একদিন মায়ের কামিনী দাসী—যে কনকদাদাকে মানুষ করেছিল—একটা কাঁটা কুড়িয়ে পায়। মা তাই দিয়ে কলম করেছিলেন। আর একদিন বাবা কাকারা আমাদের নিয়ে ক্যান্টনমেণ্টে বেড়াতে যান কোম্পানীর বাগানে। সেখানে বড় গোলাপ দেখে অবাক হয়েছিলুম, এক একটা থালার মত। অত বড় গোলাপ আর কখনও দেখিনি। কিন্তু হাত দিতে বা তুলতে দিত না। সেখান থেকে ফিরে আসছি। হঠাৎ একটা গরু ছোটকাকার ছোটমেয়ে তপ্‌সীর লাল কাপড় দেখে শিঙে তুলে ফেলে দেয়। মোটা কাপড় গায়ে থাকায় বিশেষ লাগে নি। সে আমারই সমবয়সী ছিল। ঐ রকম মোটামুটি ঘটনা মনে পড়ে।

কলকাতায় ফিরে আসার মুখে একটা বাঁদর দড়ি ছিঁড়ে শার্শি ভেঙে বড়পিসীর অটল চাকরকে কামড়ে দেয়। ফিরে এসে তাকে হাসপাতালে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু শুনেছিলুম সে মারা গেছে। সেই থেকে বাঁদর বিদায় করে দেন।

আমার মেজদাদা কনকেন্দ্রনাথ ম্যালেরিয়ার মত পুরনো জ্বর হয়ে অনেকদিন ভুগেছিল। জ্বর ছাড়ত না, খুব রোগা হয়ে গিয়েছিল ডাক্তার বললে, "চেঞ্জে নিয়ে যান, না হলে জ্বর যাবে না।" এখানে অনেকদিন চেষ্টা করা হল, কিন্তু কিছুই হল না। তখন আমার মেজভাই পেটে, কি করে যাওয়া হবে? ঠিক হল সেখানে গিয়ে প্রসবের ব্যবস্থা করা হবে। দাই, ডাক্তার পাওয়া যাবে, সেইরকম জায়গায় যাওয়া হবে। আমাদের ডাক্তার এম, এন, ব্যানার্জী বললেন, "এলাহাবাদে পাওয়া যাবে। সেইখানে যান।" তাই ঠিক হল। বাড়ি ভাড়া করা হল, যাতে সকলে মিলে—বাবা কাকারা তিন ভাই ও তাঁদের ছেলেমেয়ে সব—যেতে পারে। ছোটপিসী বাড়িতেই ছিলেন, কারণ ছোট পিসেমশায়ের ছুটি ছিল না। দুটো কম্পার্টমেণ্ট রিজার্ভ করা হল। তখনকার দিনে একটা গাড়িতে মাঝখানে দরজা থাকত, বন্ধ করে দিলে আলাদা ঘরের মত, আলাদা বাথরুম থাকত। একটাতে আমরা, বাবা ও মা রইলুম, পাশেরটাতে দিদিমা বড়দাদা গেহেন্দ্রনাথ ও কনকদাদাকে নিয়ে

উঠলেন। পাশের গাড়িতে মেজকাকা ও ছোটকাকা তাঁদের পরিবার নিয়ে উঠলেন সত্য জ্যাঠামশায়, (দেবেন্দ্রনাথের বড়মেয়ের ছেলে সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি আবার আমাদের মেসোমশায়ও হতেন) সব বন্দোবস্ত করে উঠিয়ে দিয়ে আসেন, যাতে কোনও কষ্ট না হয়। কারণ বাবা ভয়ানক ব্যস্তবাগীশ লোক ছিলেন। একটুতেই বড় ব্যস্ত হয়ে পড়তেন। বিশেষ করে বিদেশে যেতে হলে যতক্ষণ না ট্রেনে উঠে বসতেন নিজেও ছটফট করতেন, অন্য সকলকেও ব্যস্ত করে তুলতেন। মা বলতেন, "তুমি সরে যাও, সব ঠিক হয়ে যাবে। বাইবে গিয়ে চুপ করে বসে থাক।" তখন যেমন ছোট ছেলেরা বকুনি খেয়ে মুখ চুন করে সরে যায়, তাই করতেন। হাত উল্টে ঠোঁট বেঁকিয়ে হেসে চলে যেতেন। সেবারে গাড়ি যখন ছেড়ে দিয়েছে, মালপত্র সব ওঠানো হয়ে গেছে, একটা ক্যাশবাক্স তখনও প্ল্যাটফর্মে পড়ে রয়েছে দেখে বাবা নিজেই তাড়াতাড়ি করে সেটা তুলে চলন্ত ট্রেনে ওঠার সময় চাকার মধ্যে একটা পা চলে যায়। সঙ্গের লোকজন ঠিক সময়ে ধরে ফেলায় খুব বেঁচে গিয়েছিলেন। গাড়ি তখন সবে ছেড়েছে, তাই বিশেষ ক্ষতি হয়নি, ডান পা-টা শুধু একটু ছড়ে গিয়েছিল।

এখানে বাড়িতে রেখে গেলেন দাদামশায়ের আমলের পুরনো সরকার রামদুলালবাবু আর দিদিমার বেয়ারা, দ্বারভাঙা জেলার কিষণকে • ঘরটর পরিষ্কার করবে বলে। রামলালবাবু বাড়ির খবর দিয়ে রোজ চিঠি লিখতেন।

হরিশ হালদারও সঙ্গে গিয়েছিলেন। বাবা কাকারা তাঁকে নিয়ে খুব মজা করতেন। তিনি না থাকলে চলত না। বাবা তখন স্কেচ করতেন। বাবা হরিশবাবুর ছবি এঁকেছিলেন—হুঁকো হাতে বসে আছেন। ওখানে পিতলের বাসন বিক্রি করতে একটা বুড়ো আসত, তারও ছবি এঁকেছিলেন। একটা লোক নানারকম খেলা ও ম্যাজিক দেখাতে আসত, তারও ছবি আঁকেন। তাকে দশটাকা দিয়ে বরদাদাও কনকদাদা তার কাছে ম্যাজিক শেখে। কনকদাদা একটা পোর্ট্রেট সেই সময় আঁকেন, কতটা চেঞ্জ হয়েছে দেখার জন্য। ওখানে মাটির নীচে একটা ঘর ছিল হরিশবাবু সেইখানে থাকতেন। সেখানে বাজারের হিসাবপত্রের ভার তাঁর উপরই ছিল। আমরা তাঁর কাছ থেকে পয়সা চেয়ে এনে এটা সেটা খেতুম। মাখন বিক্রি করতে আসত একজন, আমরা কিনে খেতুম। এক পয়সায় ছোট বলের মতন, দু-পয়সায় বড় বিলিয়ার্ড বলের মত, কাল হাঁড়িতে জলে ভাসিয়ে আনত।

আজকাল সে জিনিস দেখতে পাই না। হরিশবাবুর ঘরের কাছে ছোলাগাছ ছিল, আমরা তুলে এনে খেতুম, ঠিক কচি কড়াইশুটির মত মিষ্টি। আমাদের কি আনন্দে দিন কাটত। ভাই-বোনেদের মধ্যে আমিই তখন সবার ছোট, দাদাদের ও বাবার আদর আবদারে ছিলুম। আমার তখন ছ বছর বয়স, দিদির আট, কনকদাদার বার, বড়দাদার তের বছর। অগ্রাণ মাসে আমার সেজভাই নরেন্দ্রনাথ জন্মাল। ভোরে উঠে শুনলুম ভাই হয়েছে, আমরা তখন এলাহাবাদেই আছি। প্রসব হয়ে যাবার পর বাড়ির দাই সুলতানা মেমকে কলকাতা থেকে টেলিগ্রাম করে নিয়ে যাওয়া হল। তার হাতে আঁতুড়ের সব ভার ছেড়ে দিয়ে দিদিমা নিশ্চিন্ত হলেন।

এলাহাবাদে থাকতে একদিন বাবার বন্ধু জজ প্রমদাবাবুর বাড়ি বেড়াতে গিয়েছিলুম। তাঁরা খুব আদর করে মিষ্টি খাওয়ালেন ও পুতুল কিনে দিলেন—ভুষির পুতুল—তখন পাওয়া যেত। মুখটা ও হাত পা কাঁচের, বাকী ভুষি ভরা, আজও স্পষ্ট মনে পড়ে।

দিদিমার কিষণ বেয়ারা বাবাকে চিঠি লিখে জানায় যে রামলালবাবু তার জরিমানা করেছেন। সে রাজমিস্ত্রির কাজ জানত। কাঠের উপর চুন সুরকি দিয়ে একটা খেলার বাড়ি বাবার জন্য তৈরী করেছিল। রামলালবাবু রাগ করে তার বাড়ি ভেঙে দিয়েছেন সে লেখে। "আমি বড়মার ঘরে আয়না সাফ করতে গিয়ে তার মাথায় কাঠের ফুলটা ভেঙে ফেলেছি, তাই রামলালবাবু রাগ করেছেন।" বাবা তখন রামলালবাবুর কাছে চিঠি দিয়ে জানেন যে সে খবর ঠিক। তাই শুনে বাবা সেখান থেকেই রামলালবাবুকে লিখলেন, "আমার খরচা থেকে আয়না মেরামত করিয়ে নেবেন, আর কিষণকে অবসর সময়ে যেন বাড়ি তৈরী করতে দেওয়া হয়।" আমরা ফিরে এসে দেখি কিষণ সুন্দর কোঠাবাড়ি করেছে। বাবা খুশী হয়ে বখশিস করছিলেন। বাড়ির বারান্দায়, ঠুনকো কাঁচের রঙবেরঙের বল পাওয়া যেত, তাই ঝুলিয়ে বেল লণ্ঠন করেছিল। বাবা সেটা নেলীদিদিকে (ছোটকাকার মেয়ে উমারাণী মুখোপাধ্যায়) দিয়েছিলেন, ছোটকাকার মহলে যেতে টেবিলের উপর সাজান ছিল। তারপর বাবা তাকে আর একটা ভাল করে বাড়ি তৈরী করতে অর্ডার দেন। সেটা আরও ভাল করেছিল, বাগানবাড়ি, আয়না দিয়ে নদী করেছিল। সেটা দিদিমার হলে সাজান থাকত।

এলাহাবাদ থেকে ফিরে এসে বাবা দাদাদের শিক্ষাব্যবস্থায় মন দেন। তখন ওরা সেণ্ট জেভিয়ার্সে পড়ত। কিন্তু বাড়িতেও তিন চারজন শিক্ষক ছিলেন। নরেন্স বলে একজন সাহেব মাস্টার ছিলেন, ইংরাজী পড়াতেন। একজন বাংলা পড়াতেন, পিয়ানো শেখাব একজন শিক্ষক ছিলেন। পরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বাড়িতে বসে দাদাদেব আঁকা শেখাতেন। বাবাও দেখিয়ে দিতেন, সবসময় কাছে কাছে রাখতেন, ছবি তোলা শেখাতেন। কনকদাদা বেশ ভাল ছবি তুলতে পারত, বড়দাদাও তুলত। বাবা নিজের ছবি তোলার সব সরঞ্জাম ওদের দিয়েছিলেন। ওদের দেখতুম কি সব নুনের মত ওষুধ দিয়ে ট্রে-র ভিতর জল দিয়ে নাড়িয়ে নাড়িয়ে ছবি ডেভেলাপ করত। খারাপ হয়ে গেলে ফেলে দিত, আমি কুড়িয়ে নিতুম। ওরা এলাহাবাদ থেকে ম্যাজিক শিখে এসেছিল, কলকাতায় ফিরে এসে সবাইকে সেই খেলা দেখিয়ে তাক লাগিয়ে দিত। কিন্তু আমি তাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকতুম বলে তাদেব সব ফন্দি জানতে পেরে গিয়েছিলুম। তাদের কাছে অনেক অনেক কিছুই শিখেছিলুম। ওরা স্কুল থেকে কাগজেব বাক্স, বাড়ি তৈবী কবা শিখে এসে আমায় শেখাত।

সন্ধ্যের সময় গানের মাস্টাব শ্যামসুন্দরবাবু (শ্যামসুন্দব মিশ্র) আসতেন। আবার সকালেব দিকে কখনও কখনও বাধিকা গোস্বামীও আসতেন। সব ছেলেমেয়েবাই শ্যামসুন্দববাবুব কাছে গান শিখত।

সকালবেলায় নটা নাগাত দিদি (সুনন্দিনী চট্টোপাধ্যায) ও আমাকে * নিযে বাবা সাহেবপাড়ায় দোকানে যেতেন। সেখানে আমাদের খেলনা কিনে দিতেন, নিজেও নতুন কিছু চোখে পড়লে কিনে নিতেন। আবার কখনও কখনও চুল কাটতে যেতেন। দিদিকেও নিযে গিযে চুল কাটিযে আনতেন। দিদির মাথায় যেমন খুব চুল ছিল, আমাব মাথায় তেমনি কম চুল ছিল, মাঝে মাঝে কামাতে হত। সেই সময় বাবা কতরকম বাহারী পরচুলা কিনে দিতেন। দিদিব মাথার চুল কাটা দেখলেই মা ও দিদিমা খুব বাগ করতেন, বলতেন, "ওর অমন সুন্দর চুল, কেন কাটলে!" বাবা বলতেন, "অত ছোট বয়সে অত চুলের জন্য শরীর খারাপ হয়।" দোকান থেকে এসে চান করে দিদিমার

সামনে ছোটপিসীর বারান্দায় বাবারা তিনভাই একসঙ্গে খেতে বসতেন। বাইরের বারান্দার ধারে পাথরের ঘরে ফরাসপাতা গের্দা দেওয়া বিছানা পাতা থাকত। সেখানে দিনের বেলায় শুতেন। তখন ইলেক্‌ট্রিক ফ্যান ছিল না, বেয়ারা বারান্দায় বসে টানা পাখা টানত। বিশ্বম্ভর বেয়ারা গড়গড়ায় বালাখানার অম্বুরী তামাক সেজে দিয়ে যেত। কি সুন্দর গন্ধ বেরোত! আমাদের ছোট ছেলেমেয়েদের সব এগারটার সময় খাওয়া হয়ে যেত। দিদি ও আমি বাবার কাছে গিয়ে গল্প শুনতুম। লণ্ডন নিউজ আসত, বিলেতের খবর থাকত। রাজার করোনেশন, জুবিলীর খবর বাবা পড়ে শোনাতেন। একটা বাজলে বলতেন, "যাও, এবার পড়গে"। একটার সময় আমাদের মাস্টারমশায় আসতেন। দিদিরা একজন মহিলার কাছে পড়ত, তাঁর নাম ইন্দুবালা। আমরা তাঁকে ইন্দুমাসী বলতুম। বড়দিদি, (বীণাপাণি ঠাকুর) নেলীদিদি ও দিদি তাঁর কাছে পড়ত ও সেলাই শিখত। দাশুদিদি (প্রভাতী রায়) ছোট পিসেমশায়ের কাছে পড়তুম, সবে তখন অক্ষর পরিচয় হচ্ছে।

বাবা কাকারা তিনটের সময় ঘুম ভেঙে উপরে দিদিমার কাছে হলে গিয়ে বসতেন। তখন দিনুদাদার (দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বড় নাতি) ডাক পড়ত। সে দিদিমাকে গান গেয়ে শোনাত। দিনুদাদা পান খেতে খুব ভালবাসত। গানের পরে তাই দিদিমার মশলা দেওয়া পান বখশিস হত।

ছোটপিসীর বড়মেয়ে বড়দিদি বীণাপাণির সঙ্গে দিনুদাদার বিয়ে হয় বোধহয় ১৩০৬-৭ সালে। বিয়ের কথা আমার ঠিক মনে নেই। বছর দুই বাদে বড়দিদি ডিপথিরিয়া হয়ে মারা যায়। তার কোনও ছেলেমেয়ে হয়নি। বোধহয় ওদের বিয়ের সময় হঠাৎ একদিন বিদ্যেসুন্দরের যাত্রা হয়েছিল। সুন্দরের সন্ন্যাসী বেশে সেজে আসা দেখে আমি ভয়ে পালিয়ে গিয়ে মায়েরা যেখানে চিকের আড়োলে ছিলেন, সেইখানে লুকিয়েছিলুম। তারপর ভিস্তি সেজে এসেছিল, সে সব কিছু কিছু মনে আছে।

ছোটপিসী মাঝে মাঝে থিয়েটারের হুজুগ তুলতেন। কে কি পার্ট নিলে ভাল হবে তিনিই ঠিক করতেন। দিদিরও তখন বিয়ে হয়নি, দাদারাই একটু বড় হয়েছে, একদিন আলিবাবা থিয়েটার হয়। দিদিমার হলের একপাশে

রড দিয়ে পর্দা ঝোলান থাকত। সেই পর্দাই সেবার ড্রপসিনের কাজ করে। পর্দার পিছনে তক্তা দিয়ে টবের গাছ দিয়ে স্টেজ সাজান হত। হলের পাশে সিঁড়ি দিয়ে নেমে যে ঘর ছিল, সেইটা গ্রীনরুম হয়, আমার বেশ মনে আছে। ছোটদের ছেলেখেলা বলে বেশী হাঙ্গামা করা হয়নি বইও বোধহয় বাদছাদ দিয়ে ছোট করে দিয়েছিলেন। দর্শক ছিল বাড়ির লোক, আর বেনেপুকুরের দাদারা ছিলেন; বড়পিসীর মেয়েরা ছিল—বড়মেয়ে ক্ষুদিদিদি, ছোট প্রতিমাদিদি।

কে কি সেজেছিল সঠিক মনে পড়ে না। দাদারা ডাকাত সেজেছিল, নেলীদিদি মর্জিনা আর দাশুদিদি আবদুল্লা সাজে। দাশুদিদি খুব নকুলে ছিল। দ্বিপু জ্যাঠার (দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছেলে দ্বীপেন্দ্রনাথ) মাসী আসতেন। তিনি বোধহয় বুড়ো দর্জি সেজেছিলেন। আমরা গেরুয়া কাপড় পরে ভিক্ষের ঝুলি কাঁধে নিয়ে গাইতে গাইতে আসি। আমার ন্যাড়া মাথা পরচুলো পরা। ছোট ছোট মেয়েরা সকলেই দল বেঁধে গান গাই। ছোটপিসী গানের মাস্টার ছিলেন।

"দিন চলে না ঘুরি ফিরি ভিক্ষা দিয়ে যা" গানটা গাওয়া হয়।

মাঝে মাঝেই ঐ রকম থিয়েটারের হুজুগ আসত। কিন্তু হয়ত শুধু রিহার্সাল অবধি হয়েই থেমে যেত। বাড়িতে অসুখ-বিসুখ হলে আর শেষ পর্যন্ত হয়ে উঠত না।

(৬)

আমার মনে পড়ে ছোটবেলায় একবার আমার ব্রঙ্কাইটিস হয়েছিল। তখন ছয় কি সাত বছর বয়স হবে। বুকে সর্দি বসে যায়। তখনকার দিনের চিকিৎসা, মনে পড়লেই ভয় হত। ঘরের চারিদিকে জানালা বন্ধ, লোকের মুখ দেখতে পাচ্ছি না। কেবল মেরীশশী বলে নার্স কাছে আছে আর মসনের পুলটিস বুকে বেঁধে দিচ্ছে, বদলাচ্ছে, আর সময়মত খাবার দিচ্ছে, টেম্পারেচার নিচ্ছে, তাই দেখছি! পথ্য ছিল পাঁউরুটি পোড়া ভিজিয়ে জল, না হয় মুড়ি ভিজিয়ে জল, আর বেঙ্গার্স ফুড নয়ত দুধবার্লি। সকালে দরজা একটু খুলে বাবা ডাক্তারকে সঙ্গে করে আনতেন। মা সব কাজ সেরে খেয়েদেয়ে এসে বসতেন! মেরীশশীকে দেখতে খুব কাল, মোটা নয় পাতলা লম্বা, মুখে বসন্তের দাগ। হাতে দুগাছি সোনার বালা, পরনে সরু কালোপেড়ে শাড়ি। তখন

হিন্দু নার্স পাওয়া যেত না, ক্রীশ্চান নার্স ছিল। কারও বেশী অসুখ হলেই সে আসত। কিন্তু সে খুব যত্ন করত। সারাদিন তার মুখ দেখতে দেখতে অরুচি ধরে যেত। যেদিন খাবার দিত, আগে থেকে আসন পেতে বসে থাকতুম, কখন ফুলকো রুটি আর মাগুর মাছের ঝোল আসবে। তাই তখন কত ভাল খাবার মনে হত। এখনকার চিকিৎসা অনেক ভাল হয়েছে। লোকের মুখ দেখতে পাওয়া যায়। ইদানীং একজন হিন্দু নার্স আসত, দেখতে তেমনি কাল, বেঁটে মোটা। তার নাম ছিল সৌদামিনী। দিদিমার নাম বলে তাকে নার্স বলেই ডাকা হত।

অনেকদিন ভুগেছিলুম বলে ভাল হবার পরেও পা টলত, চলতে পারতুম না। তিনতলায় লাঠি ধরে চলাফেরা করতুম! তখন দেখতুম একজন পুরনো ঘড়িওয়ালা আসত। রবিবারে রবিবারে সমস্ত ঘড়িতে দম দিয়ে যেত। একটু চলতে পারলে নীচে এসে দেখি বিলিয়ার্ড ঘরে নিতুকাকা বসে আছেন। আর যত ছেলেরা ঘিরে দাঁড়িয়ে "আমায় দাও", "আমায় দাও" করছে। নিতুকাকা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সেজছেলে নিত্যেন্দ্রনাথ। তিনি যেমন পান খেতেন, তেমনি সিগারেট খেতেন। সিগারেটের প্যাকেটের ভিতর ছবি থাকত। তাই ছেলেদের দিয়ে বলতেন, "যা, ছোটকাকীমার কাছ থেকে পান নিয়ে আয়। যতগুলো পান আনবি, ততগুলো ছবি দেব।" আমরা দিদিমার কাছে পান চাইতে গেলে বলতেন, "এত পান তোরা কোথায় নিয়ে যাস্? নিতু এসেছে বুঝি?" তিনিও জানতেন নিতুকাকা এলেই পান চেয়ে পাঠান। সেই ছবি নিয়ে আমাদের মধ্যে কাড়াকাড়ি লেগে যেত! নিতুকাকা লালবাড়িতে থাকতেন, দেখতে পেতুম। লালবাড়ির ঘরেতেই মারা যান।

(৭)

আমরা যখন চিড়িয়াখানায় যেতুম বা সার্কাস দেখতে যেতুম ছোট ছেলে-মেয়েদের রামলালবাবু আর দারোয়ান চাকরের সঙ্গে পাঠিয়ে দিতেন, কিন্তু যখন ভার্নিভাল বা অন্য কিছু আসত, বাবা কাকারা নিজেরা সঙ্গে নিয়ে যেতেন। দাদারা বড় হলে তাদের সঙ্গেই যেতুম। তখন শীতকালে ভোরবেলা ময়দানে প্যারেড হত, চারটের সময় উঠে দাদাদের সঙ্গে দেখতে যেতুম।

রাজার করোনেশনের সময় ময়দানে বাজি হয়েছিল, দেখতে গিয়েছিলুম।

কলকাতার সব বাড়ি, দোকানে আলো দিয়েছিল। তখন ইলেকট্রিক্ ছিল না, রঙবেরঙের ফুঁকো শিশি দিয়ে সাজান হত। চমৎকার দেখতে হত। তেমন বাহার এখন হয় না। বাজিও যা দেখেছি! এডোয়ার্ডের মুখ ও কুইন এলিজাবেথের মুখ, কদমগাছ, আরও কতরকম বাজি আকাশের গায়ে ছবির মত দাঁড়িয়েছিল। আমরা বাড়ি ফিরে এসে তখনও দেখেছি আকাশে রয়েছে। পঞ্চম জর্জ যখন প্রিন্স অফ ওয়েলস্ হয়ে আসেন তখনও দেখেছি, রাজা হয়ে এলেন তাও দেখেছি। এখন ছেলেদের আনন্দ দেবার কিছুই নেই। তখন শীতের সময় কত রকম খেলা আসত, আমাদের দেখতে যাওয়ায় বাবা বাধা দিতেন না। একবার বললেই তখনই ব্যবস্থা হত। কনকদাদা এসব খবর খুব রাখত এবং আমাকে ঠেলে দিত, "যা বাবার কাছ থেকে পারমিশন্ নিয়ে আয়, তোকেও নিয়ে যাব।" আমি তখনই ছুটতুম। তখন দাদারা বড় হয়েছিল, নিয়ে যেতে পারত। বড়দাদা চুপচাপ, একটু শান্ত প্রকৃতির ছিল। কনকদাদা কিন্তু কখনও কিছু বাদ দিত না, নতুন কিছু এলে না দেখে থাকতে পারত না। কলকাতায় যখন অ্যানা পাভ্লোভার নাচ আসে আমরা তখন পুরীতে ছিলুম। ও সেখান থেকে নাচ দেখতে আসে। বড়দাদা তখন মারা গিয়েছিল।

বড়দাদা গাইতে পারত, গলা ভাল ছিল। কনকদাদার গলা ভাল ছিল না বলে গাইত না, কিন্তু ওর বাজনার হাত খুব ভাল ছিল, যে কোন বাজনা না শিখেও আয়ত্ত করতে দেরী হত না। ছোটকাকারও তাই ছিল। তিনি নতুন নতুন বাজনা আনলে কনকদাদা তাতে হাত লাগাতে ছাড়ত না, অল্পদিনের মধ্যেই শিখে ফেলত। কাকারাও ওদের দুজনকে ভালবাসতেন, বাড়ির সকলের বড় বলে ত বটেই, তাছাড়া ওদের শিক্ষা ও নম্র স্বভাব সকলকেই আকর্ষণ করত। ঘরে বাইরে সকলেই কাছে ডাকত। যখনই কেউ তাদের নাম করত, 'গুপু কনক' ছাড়া একলার নাম বলত না। সেই ছেলেদের একটি যখন জোড় ভেঙে চলে গেল বাড়ির তখন যে কি অবস্থা হয়েছিল যে না দেখেছে সে বুঝতে পারবে না। বড়দাদার গুণ প্রকাশ হবার আগেই তার জীবনদীপ নিভে গেল।

(৮)

যখন আমাদের চার ভাইবোনে মিলেমিশে কাটছে। (নবু তখন ছোট বলে ঠিক আমাদের দলে ছিল না) তখন একদিন শুনি যে দিদির বিয়ের ব্যবস্থা

হচ্ছে। শুনে খুব আনন্দ হয়েছিল। দিদির বয়স তখন ন' বছর, আমার সাত বছর। নবুর বয়স তখন সবে এক বছর, টুকটুকে সুন্দর দেখতে ছেলে। তার লাল ভেলভেটের স্যুট তৈরী হল। আমার ফ্রক তৈরী হল। দিদির কাপড়-গয়না আসতে লাগল। বাড়ি সাজান হতে লাগল। দিদিমার কাছে বামুন-চাকর আসাযাওয়া করতে শুরু করল। খাবারের ফর্দ হচ্ছে। অথচ কার সঙ্গে বিয়ে হবে তখনও জানতুম না। হঠাৎ শুনলুম নাকি বাঁটুলদাদার (দ্বারকানাথ ঠাকুরের ভাগ্নে মদনমোহন চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ির প্রিয়নাথ চট্টোপাধ্যায়ের ছেলে প্রভাতনাথ) সঙ্গে বিয়ে হবে। বাঁটুলদাদা আমাদের বাগানে খেলতে আসত। দাদাদের সঙ্গে ক্রিকেট, টেনিস, ফুটবল খেলত। আমাদের বড় বাগানে খেলা হত। দিনুদাদা, রথীকাকা, সুপ্রকাশদাদা, নির্মলদাদা (দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়, নির্মলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়) সবাই থাকত। এই নির্মলদাদার বাবা নলিনবাবুর (নলিনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়) সঙ্গে আমাব বাবার খুব হৃদ্যতা ছিল। যখন তিনি মারা যান বাবার হাত ধরে বলে গিয়েছিলেন, "তুমি ওকে দেখো, আমি চললুম। ওকে তোমার হাতে দিয়ে গেলুম।" বাবা সেকথা ভুলতে পারেননি, ছোটকাকার মেয়ে উমারাণীর সঙ্গে তার বিয়ে দিয়েছিলেন এবং তাকে ছেলের মত ভালবাসতেন।

বিয়ে-থা হলে আগে থেকে আত্মীয়-স্বজনেরা অনেকে এসে বাড়িতে থাকতেন। বাড়ি লোকে গিজ্‌গিজ্‌ করত। বাবাদের পাঁদাড়িপিসীমা এসে আমাদের বাড়িতে অনেকদিন থাকতেন। পাঁদাড়ে জন্মেছিলেন বলে তাঁব ঐ নাম ছিল। তিনি বাগবাজারে থাকতেন, তাই আমরা তাঁকে বাগবাজাবের দিদি বলে ডাকতুম। তাঁব মেয়ে ভুতিমাসীও মাঝে মাঝে এসে থাকতেন। মায়ের এক বোন আসতেন, তাঁর নাম ছিল কিরণ (নবীনমাধব ঠাকুরের স্ত্রী. কিরণময়ী ঠাকুর) আমরা তাঁকে কিরণমাসী বলতুম। সাদা পাথরের মত রঙ, বেঁটে রোগা ছোট্ট মানুষটি ছিলেন। আগে থাকতে কত কাজ হত। কিশ্‌মিশ্‌ বাছা, বড়ি দেওয়া, পান সাজা সব তখন বাড়িতে হত। এখন ত সব অর্ডার দিলেই পাওয়া যায়। এখনকার মেয়েরা সেজেগুজে গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়িয়ে বেড়ায়। আমাদের সিঁড়ি উঠতে নামতে পায়ে ব্যথা হয়ে যেত। ফুলের মালার অর্ডার নিত ভাগবত মালী। ঝাড়লণ্ঠন ও আটচালার ডেকরেশনের বায়না নিতেন মতিবাবু। বাঈজী আনার ভার ছিল শ্যামসুন্দরবাবুর। [illegible]

ভিতর মহলে খেমটাওয়ালীর বায়না নিত পুরনো দুজন মেয়েমানুষ, কুসুম আর আর নগেন। তাদের কেউ বলত নগনী, কুসমী, কেউ বলত কাল জুড়ি। কারণ দুজনকে একই রকম যমজের মত দেখতে ছিল। দুই বোন, একজন একটু মাথায় ছোট, আর একজন একটু লম্বা, মিশকাল দোহারা চেহারা। তারা অনেকদিনের পুরনো লোক। ঠাকুর পরিবারের সব বাড়িতেই যেত, গলা খুব ভাল ছিল, গান গেয়ে শুনিয়ে বকশিস্ আদায় করত। মেয়েমহলে গানের আসর তারাই জমাত।

একজন পুরনো জেলে আসত, নাম ছিল রামা। সেও ঠাকুর পরিবারের সব বিয়েতে মাছ সাপ্লাই করত। আর কেউ এলে ঠেঙিয়ে বিদায় করত। বলত, "আমার পুরনো বাড়ি আমি ছাড়ব না"। তার গলার হাকডাকে বাড়ি কাঁপত। বাবা বলতেন, "আওয়াজ শুনেই বুঝেছি এবার রামা বাড়ি ঢুকেছে।" সে বলত, "না চেঁচালে বাবু বিয়েবাড়ি বলে মানাবে কেন?" কোমরে কাপড় বেঁধে নিজেই বসে যেত মাছ কাটতে। শাল, দোশালা, হীরের আংটি না হলে বকশিস্ নিত না। কলকাতায় তার তিন-চারখানা বাড়ি ছিল, গাড়ি ছিল, পালকী গাড়ি, টাট্টু ঘোড়া। কিন্তু সে গাড়ি চড়ে কখনও আমাদের বাড়ির ভিতর আসত না, রাস্তার মোড়ে গাড়ি থেকে নেমে হেঁটে আসত, ময়লা ছোট কাপড় পরে খালি পায়ে মাছ কাটতে বসে যেত। আমরা কিছু বললে বলত, "এই আমার লক্ষ্মী"। তার ছেলেরা আসত যখন টাকা নিতে সেজেগুজে বাবু হয়ে, সে ছেলেদের গালাগালি দিত। বলত, "হারামজাদা ছেলে বাবুর বাড়ি এসেছিস সেজেগুজে।" দিদিমা বলতেন, "ও রামা, ছেলেকে হারামজাদা বললে কাকে গাল দেওয়া হল?" সে উত্তরে বলত, "না মা, ব্যাটাদের বুদ্ধিশুদ্ধি নেই। এ আমার লক্ষ্মী ওরা বোঝে না।"

এলাহাবাদ থেকে ফিরে আসার এক বছরের মধ্যে ১৩০৮ সালের অঘ্রাণ মাসে দিদির বিয়ে হয়। ঠিক তারিখ মনে নেই। গায়ে-হলুদের আগের দিন সকাল থেকেই বাড়ি সাজান হতে থাকে। চারিদিকে ঝাড়লণ্ঠন লাগান হচ্ছে, ঠুনঠুন আওয়াজ উঠছে, আর আমরা ঝাড়ের কলম ভেঙে গেলে কুড়িয়ে নিয়ে চোখে দিয়ে দেখছি কতরকম রং বেরোচ্ছে। তখনও ইলেকট্রিক লাইট হয়নি। ভিতরের বাড়ির বাইরের বাড়ির বারান্দায়, হলে ঝাড় খাটান হতে লাগল। লাইব্রেরী ঘরে বা হলেতে বারমাসই গোলাপ দিয়ে ঢাকা ঝাড় ঝোলান থাকত। দোতলার হলঘরের দেওয়ালে দেওয়ালে পিছনদিকে আয়না দেওয়া জোড়া

জোড়া লাল দেওয়ালগিরি ছিল। আর মাঝখানে বিলেত থেকে আনান পাঁচটা ঝাড় ঝুলত। গেলাপ খুলে দিলে আমরা দাঁড়িয়ে বাহার দেখতুম। কি বাহার ছিল। লাল লিচু ঝুলছে, কাঁচের চেন দিয়ে একটার সঙ্গে আর একটার যোগ রয়েছে, সবুজ পাতাশুদ্ধ ডালে ডালে ফানুস, তারই ভিতর বাতি দেওয়া হত। এত সূক্ষ্ম কাজ ছিল যে দেখলে মনে হত যেন মোমজাতীয় জিনিস দিয়ে তৈরী। দেওয়ালগিরির পিছনে আয়না থাকায় জোর আলো হত।

বর বসার জন্য মসলন্দ পাতা হল, জরির কাজ করা ভেলভেটে গের্দা পড়ল। সামনে সাদা চাদরের ফরাস, তার মাঝে মাঝে সাদা গের্দা পড়ল। সন্ধ্যের সময় লোকজন জমা হলে দু-পাশে তকমা আঁটা উর্দি পরা ছ-জন বেহারা হাওয়া করতে শুরু করল। ফরাসের উপর রূপোর থালায় মিঠে পান সাজান রয়েছে। চারিদিকে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওরই মধ্যে যারা একটু বড় হয়েছে, নিমন্ত্রিতদের অভ্যর্থনার ভার তাদের উপর। চারিদিকে ফুলের মালা ও আতর-গোলাপের ছড়াছড়ি। আতরদান, গোলাপ পাশ হাতে ছোট ছোট মেয়েরা দাঁড়িয়ে থাকত সিঁড়ির নীচে। গাড়ী বা পাল্কী থেকে অভ্যাগতেরা নামলেই আতরের তুলো, কবিতার কাগজ গোলাপ ফুলের মালা হাতে দিয়ে খাতির করে সঙ্গে করে নিয়ে যেত আসরে। গরীব বড়লোক বিচার ছিল না, সকলের সঙ্গে সমান ব্যবহারের ত্রুটি হত না। বাইরে দাসীরা সাজগোজ করে জল পানের থালা নিয়ে বসে থাকত। ভিতরে মেয়েরা সেই থালা নিয়ে নিমন্ত্রিতদের জল এবং পান বিতরণ করত। আসরে ওস্তাদরা এসে গানবাজনা করতেন। ঝাড়লণ্ঠনের আলো, গান, আদবকায়দা মিলে মনে করিয়ে দিত মুসলমানী দরবারের কথা। দোতলার হলে পুরুষদের ব্যবস্থা বাবা কাকারা দাঁড়িয়ে থেকে করতেন। কত রাজা মহারাজা ও সাধারণ লোকের যাওয়া-আসা দেখা যেত। তিনতলার হলে মেয়েদের বসবার স্থান ছিল। সেখানে খেমটাওলীরাই নাচ গান করত। মেয়েরা সেজেগুজে পাঞ্জাবী আস্তিন বা রুমাল আস্তিনের জ্যাকেট পরে ছোট ছোট শালের হাত-পাখা নেড়ে আসর জমাতেন। নগনী কুসমীর ও নাচওয়ালীদের কথায় সেখানে পরীর হাট বসে যেত।

একতলার হলে দান সাজান হত। সোনারূপোর জিনিস, খাট-আলমারী, কৌচ-কেদারা, ড্রেসিং টেবিল, কার্পেট, থালা-বাসন সব দ্বিগুণ দ্বিগুণ সাজান

রয়েছে। পুরনো বেয়ারা, দরোয়ান দাঁড়িয়ে আছে পাছে কেউ হাত দেয়। বাবার পুরনো বেয়ারা মন্নু খুব বিশ্বাসী ছিল, ইশারায় বুঝে নিত বাবু কি বলছেন। তার হাতে সব কাপড়ের আলমারীর চাবি থাকত। সেইখানেই মেয়ে সম্প্রদান হত। বাবা যখন সম্প্রদান করতে যাচ্ছেন, দিদির জ্যাঠাশ্বশুর অমরেন্দ্রবাবু (অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়) এসে বললেন, "সেলাই করা কাপড় পরে ত' মেয়ে সম্প্রদান হয় না।" বাবা বললেন, "দেখুন, মেয়ের গায়ে কোন সেলাই করা কাপড় নেই।" এমনভাবে কাপড় পরানো হয়েছিল যে মেয়ের গায়ে জামা নেই বুঝতে পারা যায়নি। সম্প্রদান হয়ে গেলে তখন খাওয়া দাওয়ার পালা চলত। বিলিয়ার্ড ঘরের নীচে খাবারের পাতা পড়ত চার লাইন। দক্ষিণের বারান্দায় দু-লাইন। রাত একটার মধ্যে খাওয়া চুকে যেত। বাড়ির ভিতরেও সব ঘর বারান্দা পাতায় ভরে যেত, এত লোক আসত। কিন্তু এত বড় বাড়ি ছিল যে আটচালা বাঁধতে হত না। বাগানে আটচালা বাঁধা হত থিয়েটারের দিন। খাওয়াদাওয়া শেষ হলে বাড়ি ফেরার তাড়া শুরু হত। আমাদের ছোট ছেলেমেয়েদের উপরই ভার ছিল নিমন্ত্রিতদের সঙ্গে করে গাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসার। প্রত্যেক গাড়িতে এক হাঁড়ি আনন্দ নাড়ু, এবং গাড়ির কোচম্যান সহিসদের জন্য এক হাঁড়ি খাবার দেওয়া হত। যাঁরা ভাড়াগাড়িতে আসতেন, তাঁদের ভাড়া দিয়ে দেওয়া হত।

সভা ভাঙলে ভগীরথ ফরাস আসত। একটা শিকের মাথায় কানি দিয়ে থোকনা করা' তাই দিয়ে ঝাড়লণ্ঠনের আলো নিভিয়ে দিত। অত আলোতে অত বড় বাড়ি গরম হয়ে উঠত, টেকা যেত না। দিদিমার কাছে দুজন পুরনো দাসী ছিল, ভব আর মোক্ষদা। তখন তারা এসে দিদিমার খাওয়ার বন্দোবস্ত করত। বামুন খাবার দিয়ে যেত, বিধবা মাসী-পিসী যাঁরা থাকতেন, তাঁরাও বসতেন। তিনতলার হলের দুধারে পাঁচ-ছ ধাপ সিঁড়ি নেমে এসে দুদিকেই লম্বা বারান্দা। হলে দু ধারে বড় বড় পাঁচ জোড়া থামের মাথায় ছাদ। থামের পাশে পাশে রেলিং দেওয়া। চারদিকে সিঁড়ি দিয়ে বারান্দায় নেমে আসতে হত। তার থেকে নীচে নেমে আর একটা বারান্দা। সেইখানে দিদিমা দিনে ও রাতে বারমাস খেতেন। জালের আলমারীতে সাজা পান, হজমী বড়ি থাকত। মোক্ষদা দাসী জোয়ান মৃতো ও পাতিলেবুর রস দিয়ে বেটে শুকোতে দিত। আমরা তুলে তুলে খেতুম, বেশ লাগত।

মেয়েদের বিয়েতে বাঈনাচ দেখার সুবিধা হত না। বিয়ের পরদিন মেয়ে

যাবার পালা চলত। তার পরদিন ফুলশয্যার ব্যাপার। সকাল থেকে তত্ত্ব সাজান হত। যশোর থেকে আসত স্পেশ্যাল অর্ডার দেওয়া নারকোলের চিঁড়ে, জিরে নারকোলের ফুল—মেয়েরা সব হাতে তৈরী করে চিনিতে পাক করে পাঠাত! এক এক থালা-ভরা একটা বাতাসা, বড় ঝুড়িতে একটা কদমা, বড় থালায় একটা কুমড়ো, তাছাড়া সচরাচর যা পাওয়া যায় তাও থাকত; শীতকালেও বড় কাঁঠাল, তরমুজ; তেল, ঘি, ময়দা, আর কলকাতার সব রকম বিখ্যাত খাবার এক এক থালা-ভরা; বাড়িতে তৈরী ভিয়েনের খাবার সব রকম থাকত—এক এক থালায় একটা করে খাজা। তারপর কাপড় জামার তুলনা ছিল না, তখনকার দিনে যা পাওয়া যেত, কিছুই বাদ যেত না। এইরকম করে একশো দেড়শো লোক যেত। পুরণো চাকর-দাসীরা নতুন কাপড় পরে সব বাগানে জড় হত। ভাজা খাবার সব বামুনরা নিয়ে যেত।

উপরের বারান্দা থেকে আমরা দাঁড়িয়ে দেখতুম। থালায় নম্বর দিয়ে টিকিট দেওয়া হত এক একজনের হাতে। বাগানে সবাই সারি সারি দিয়ে দাঁড়াত। পুরুত ঠাকুর আশীর্বাদী নিয়ে যেত আগে আগে। পিছনে থাকত নাপিত, ঢুলী, বাজনদার, দরোয়ান। কতরকম ঠাট্টার জিনিস, ফলের গহনা যেত। হেফাজত করবার জন্য একজন সরকার থাকত সঙ্গে।

পিছনের ফটক খুলে দিলেই সহজে যাওয়া যেত, কিন্তু তা হত না, প্রোসেশন যেত চিৎপুর ঘুরে। দেখবার জন্য বাড়িতে বাড়িতে লোক দাঁড়িয়ে যেত। এক এক করে গুণে গুণে ছাড়া হত। ছেলেদের বিয়ের গায়ে-হলুদেও অনুরূপ অনুষ্ঠান হত। তফাত শুধু গায়ে-হলুদের তত্ত্ব যেত সকালে, ফুলশয্যা যেত বিকেলবেলা।

বাসী বিয়ের দিন দিদি চলে যেতে দিদির চেয়ে আমিই বেশী কান্নাকাটি করেছিলুম। দিদি প্রথমটা অত বোঝে নি, ভেবেছিল বিয়েটা ছেলেখেলা হচ্ছে। ওর শ্বশুরবাড়ি আমাদের বাড়ির কাছেই ছিল। যখন দেখল, আমরা বাগানে খেলা করে বেড়াচ্ছি সে আসতে পারছে না, তখন বনের পাখি খাঁচায় বন্ধ করলে যা হয়, ওর অবস্থা তাই হয়েছিল। একবার বাড়িতে এলে আর কিছুতেই শ্বশুরবাড়ি যেতে চাইত না, খুব কাঁদত। সেও যাবে না, মাও মারধোর করে পাঠিয়েছেন। একবছর ধরে তার সঙ্গে লড়াই করতে হয়। বাবা মারধোর দেখতে পারতেন না, কত বুঝিয়েছেন। কাকারাও কত

খেলনা দিতেন, লোভ দেখাতেন। খেলনা পেয়ে তখনকার মত রাজী হত, তারপরে আবার কাঁদতে থাকত। দিদির শ্বশুর বলতেন, "বড় হলে বুঝবে, তখন নিজেই যাবে। তোমরা শুধু শুধু মারধোর করছ কেন?" কিন্তু দিদি না গেলে বা কান্নাকাটি করলে দিদির শাশুড়ী বিরক্ত হতেন, তাই এখান থেকে জোর করে পাঠাতেন। কত গণৎকার এসেছে, ঝাড়ফুঁক মাদুলী দেওয়া হয়েছে। তাই বাবা বলেছিলেন, "আর কখনও ন-বছরে মেয়ের বিয়ে দেব না।"

দিদির বিয়ের সময় একটা মজা হয়। দিদির শাশুড়ীর মুখে শুনেছি। দিদির ফুলশয্যাব দিন বাবা, দিদিমা ও মা দিদিকে এক সেট হীরের গয়না যৌতুক দেন। তাই নিয়ে নিমন্ত্রিতদের মধ্যে মেয়ে মহলে দুই দলের তর্ক হয়। একদল বললেন, "ও হীরে নয়, পোখরাজ।" আরেক দল বলেন, "না, ও হীরেই।" যাঁরা আমাদের বাড়ির সঙ্গে যাওয়াআসা রেখেছিলেন তাঁরা বলেন হীরে, আর যাঁরা যাতায়াত বন্ধ করেছিলেন তাঁরা বলেন পোখরাজ। পুরুষদের মধ্যে অবশ্য আসাযাওয়া ছিল। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করায় আমাদের বাড়িতেও মেয়েরা আসতেন না।

তর্কের মীমাংসার জন্য মেয়েরা দু-চারদিন বাদে পুরনো সরকার পাঠিয়ে দিদির শাশুড়ীর কাছ থেকে সেই গয়না নিয়ে যান। বাক্সের উপর কুক্-কেলভির নাম লেখা দেখে ঐ সরকারকে দিয়ে তাদের দোকানে গয়না যাচাই করতে পাঠিয়ে দেন। তারা সেই গয়না দেখে চোরাই মাল ভেবে আটক করে। তখন সরকার কর্তার নাম করতে বাধ্য হয়। তখন টেলিফোন ছিল না। সাহেব গাড়ি চড়ে নিজে গিয়ে কর্তাকে বলেন, "সম্প্রতি আমি গগন ঠাকুরের বাড়ির বিয়েতে এই গয়না তৈরী করে দিয়েছি, এ গয়না আপনি কোথায় পেলেন?" কর্তা তখন অবাক হয়ে যান, সাহেবকে বলেন, "দাঁড়ান, খোঁজ করে দেখি কি ব্যাপার!" খোঁজ নিয়ে জানলেন বাজি ফেলা হয়েছে, যে হারবে একশো টাকা দেবে। তখন সাহেবকে রসিদ দিয়ে সেই গয়না রেখে দেন। পরে দিদির শাশুড়ীর কাছে গয়না পোঁছে দিয়ে মেয়েদের খুব বকেন, "এ রকম অসভ্যতা করতে তোমাদের লজ্জা করে না? তার মেয়েকে সে হীরে দিল বা পোখরাজ দিল তা নিয়ে তোমাদের মাথাব্যথা কেন? বিয়েবাড়িতে গেছ, খাবে, দেখবে, চলে আসবে। এ রকম ছোটলোকমি কোর না।" তারপর একশো টাকার খাবার তত্ত্ব পাঠান হয়েছিল। তর্কের মীমাংসা করতে গিয়ে মেয়েদের খুব শিক্ষা হল, অতটা হবে তারা ভাবতে পারেনি।

(৯)

দিদির ফুলশয্যার দিনই আমার সম্বন্ধ এসে গেল। কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের মেয়েরা নিমন্ত্রণ খেতে গিয়েছিলেন। আমাকে দেখেই পছন্দ করেন। তখন দেবেন্দ্রনাথের পরিবার ব্রাহ্ম হয়ে যাওয়ায় আমাদের বাড়ির সঙ্গেও পাথুরেঘাটার বাড়ির (দর্পনারায়ণ ঠাকুরের বংশ) যাওয়া-আসা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের ছোট মেয়ে (কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের ছোট মেয়ে প্রভাবতী দেবী) মাকে ধরে বসলেন, "তোমার ছোট মেয়েটিকে আমাদের দিতে হবে, মেজদিদির (কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের মেয়ে এবং বিমলচরণ চট্টোপাধ্যায়ের স্ত্রী সরোজিনী দেবী) ছোট ছেলে নিশানাথের জন্য।"

মা বলেন, "এই সবে এক মেয়ের বিয়ে দিয়েছি। আর ওর সবে সাত বছর বয়স। এখুনি কি করে কথা দেব?" তিনি বললেন, "এখনই ত' বিয়ে দিচ্ছ না, পাকা কথা দাও, দেবে।"

মা তখন বললেন, "আমার মাথার উপর শাশুড়ী আছেন। তাঁকে গিয়ে বলি, তিনি যা ভাল হয় করবেন।"

মা বাড়িতে এসে বাবাকে, দিদিমাকে সব কথা বলায় বাবা বলেন, "ওখানে আমাদের যাওয়া-আসা নেই, কি রকম ছেলে জানিনা। খোঁজ-খবর নিয়ে দেখি, তারপর কথা হবে। এখন চেপে যাও। ছেলে অবশ্য খুব সুন্দর দেখেছি।"

দিদির বড় ভাশুর পাঁচুবাবু (খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়) পাথুরেঘাটার বাড়ির জামাই হয়েছিলেন। তাঁর কাছে খোঁজ করে জানা গেল ছেলের স্বভাবচরিত্র ভালই। তখন বাবা বললেন, দিদিমাও বললেন, "যখন ছেলের তরফ থেকে কথা তুলেছে এবং ধরাধরি করছে তখন কথা ঠিক করে ফেল। কিন্তু বার বছরের আগে মেয়ের বিয়ে দেব না বলে দিও। যদি রাজী থাকে তবেই হবে।" সেইমতই ঠিক হল।

সেই থেকেই পাথুরেঘাটায় যাওয়া-আসা আবার শুরু হল। আমার শাশুড়ী একদিন বলে পাঠালেন, "একদিন মেয়েকে এখানে আনব, বাবামশায় (কালীকৃষ্ণ ঠাকুর) দেখতে চান। তাঁকে দেখিয়ে রাত্রে খাইয়ে দাইয়ে পাঠিয়ে দেব।"

দিদিমা বললেন, "ওর কাপড়-চোপড় বদলে দাও। নিচুর মা গাড়ি করে নিয়ে যাক। ও আদব-কায়দা, কথাবার্তায় পটু আছে, ওকেই সঙ্গে দাও, কথা কইতে পারবে।"

সেই কথা শুনেই আমি ত' কাঁদতে আরম্ভ করলুম, "আমি যাব না, কিছুতেই কাপড় ছাড়ব না।" আমি ভাবলুম দিদি যেমন শ্বশুরবাড়ি গেছে, আমাকেও বোধহয় সেইরকম করে ধরে রাখবে। দিদিমা কত বোঝাতে লাগলেন. "না রে, আজই চলে আসবি। ভয় নেই। যা দেখ, কত খেলনা দেবে, খেতে দেবে!" আমি কিছুতেই শুনব না। তখন দিদিমা বললেন, "অন্নজাকে সঙ্গে নিয়ে যা তা হলে তো বিশ্বাস হবে?" তখন রাজী হয়েছিলুম। অন্নজাদিদি ছোটপিসির ছোট মেয়ে।

সেখানে খেয়েদেয়ে রাত্রে ফিরে এলুম অনেক খেলনা নিয়ে—বড় পুতুল দুটো, ছবির অ্যালবাম। আর আমার শ্বশুরের পশু-পাখীর শখ ছিল, একটা হরিণের বাচ্চা দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, "দেখো, যত্ন করে রাখবে।" আমাকে মানুষ করেছিল শ্যামাদাসী। তার উপরই দেখাশোনার ভার ছিল। আমারও খুব পোষ মেনেছিল। বাগানে লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়াত, কচি ঘাস খাওয়াতুম। কিন্তু এক বছরের বাচ্চা, তাকে বেশী যত্ন করে দুধ রুটি খাওয়াতে মরে গেল। সেটা মরে যেতেও কেঁদে ভাসিয়েছিলুম।

আমি ফিরে এলে দিদিমা বললেন, "দেখলি তো, কত কি নিয়ে এলি।"

সেই থেকে মাঝে মাঝে নিয়ে যেতেন। অনেকটা সাহস হয়েছিল। বিয়ের একবছর আগে থেকে আর যেতুম না। দিদিমা বললেন, "এখন আর যাবে না। একেবারে শুভদৃষ্টির দিন দেখতে হয়। তার আগে দেখতে নেই। এখন মেয়ে বড় হয়েছে।" বার বছর বয়সে আমার বিয়ে হয়, তাতেই বলতেন, কত বড় হয়েছে।

(১০)

দিদির বিয়ের বছরই ফাল্গুন মাসে নেলীদিদিরও বিয়ে হয়। দিদির বিয়ের অনুকরণেই সব হয়েছিল। দ্বারকানাথ ঠাকুরের ভাগ্নে নবীনবাবুর পরিবারে বিয়ে হয়। মদনবাবু আর নবীনবাবুর পাশাপাশি বাড়ি। দুইবোনের শ্বশুরবাড়িও পাশাপাশি হল। আমাদের বাড়ি থেকেই দেখা যেত, রাস্তার এপার আর ওপার, মাঝে কেবল সিঙ্গি বাগানের গলি। মদনবাবু, নবীনবাবুর

বাড়ির সঙ্গে যাওয়া আসা ঘনিষ্ঠতা আগে থেকেই ছিল বলেই দিদিদের বিয়ের সম্বন্ধ হয়। দিদিদের বিয়ে হওয়ায় ঘনিষ্ঠতা আরও বেড়েছিল। দিদির পিসীশাশুড়ি আঁতুড়ে মেয়ে দেখতে এসে ভাইপোর সঙ্গে দিদির বিয়ের ঠিক করে যান। ওঁদের সঙ্গে আমাদের এইরকম সম্পর্ক ছিল। মদনমোহন চট্টোপাধ্যায় ও নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দুজনেই দ্বারকানাথ ঠাকুরের ভাগ্নে ছিলেন বলে আমাদের বাড়ির ধারে দুই-ভাগ্নের পাশাপাশি বাড়ি ছিল। দক্ষিণের বারান্দায় দাঁড়ালে ওঁদের বাড়ি দেখা যেত। ওঁদের বারান্দায় বা ছাদে দাঁড়ালেও আমাদের বাগান দেখা যেত। বাগান থেকে কথা বলা যেত। মাঝে পাঁচি ধোপানীর গলি ছিল। আমাদের বাগানের দরজা খুলে দিলে হেঁটে আসা যেত।

দিদির জ্যাঠাশ্বশুর অমরেন্দ্রবাবু, তাঁর ছোটভাই বিপ্রেন্দ্রবাবু (বিপ্রেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়), দিদির শ্বশুর প্রিয়নাথবাবু, নেলীদিদির শ্বশুর নলিনবাবু সকলেই আমাদের বাড়ি আসতেন। সম্পর্কে আমাদের কেউ জ্যাঠামশায়, কেউ কাকা হতেন। তাঁদের ছেলেমেয়েদের সব দাদা, দিদি বলেই জানতুম। তাই যারা ভগ্নীপতি হয়েছিল তাদের বরাবর দাদা বলেই ডাকতুম।

অমরেন্দ্রবাবু এক একদিন সকালবেলা এসে হাজির হতেন। বাবা-কাকারা বারান্দায় বসে আছেন এমন সময় গায়ে জোব্বা, মাথায় গোল লম্বা টুপি, হাতে লাঠি, বাঁ হাতে আঙুলের ফাঁকে সিগার ধরে "এই যে গগনবাবু কি হচ্ছে" বলে সামনে এসে বসতেন। বাবা তাঁর চেয়ে বয়সে ছোট ছিলেন, তবু বাবু বলে সম্বোধন করতেন। তাঁর ঐরকম কথা বলার ধরন ছিল। খুব লম্বা চওড়া মানুষ ছিলেন। তা বলে মোটা বলা যায় না। রং শ্যামলা ছিল। আমরা তাঁকে জ্যাঠামশায় বলতুম। কিন্তু তাঁর সামনে পড়ে গেলেই আমাদের ভয় লাগত। দেখতে পেলেই বলতেন, "ওহে শোন, শোন এদিকে এস। আমার প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যাও।" বড় বড় ইংরিজি কথার মানে বলতে না হয় বাংলা কথার ইংরিজি করতে বলতেন। না বলতে পারলে বলতেন, "কি পড়া করছ ?" নিজেই আবার বলে দিতেন। না হয় বলতেন, "ডিক্শনারী দেখে নিয়ে আমায় বলবে।" তখন ভয় হোত বটে, কিন্তু এখন ভাবি বই পড়ার চেয়ে মুখে মুখে শেখা সহজ হয় বলে পাকড়াও করতেন। এটা তাঁর শখ ছিল। আমাদেরই তাতে উপকার হোত। নিজে বিদ্বান ছিলেন, বেশী বাজে কথা আলোচনা করতেন না।

আমাদের বাড়ির নিয়ম ছিল, মেয়ে জোড় ভাঙতে এলে সেদিন থিয়েটার দিতেন। আর যাদের সামাজিক কারণে নিমন্ত্রণ করতে আপত্তি হত সেদিন সব ঢালা নিমন্ত্রণ হত। খাওয়াদাওয়া ছিল না, হাতে হাতে জলখাবার, চা, লেমোনেড, সব কিছু পানীয় সেদিন থাকত। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়ি থেকেও সবাই সেদিন আসতেন। কারণ হিন্দুমতে বিয়ে হত বলে ওঁরা বিয়ের সময় আসতেন না। থিয়েটারের দিনই সবাই আসত। দিদির বিয়ের সময় কি থিয়েটার হয় আমার ভাল মনে নেই। কি সব বন্দুক ছোঁড়ার শব্দ শুনে ভয়ে পালিয়ে গিয়ে বাবার কোলে মুখ লুকিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। বাবার সে সময় কোমরে বাতের ব্যথা হয়েছিল। ইন্‌ভ্যালিড চেয়ারে করে তেতলা থেকে নামিয়ে একতলায় দক্ষিণের বারান্দায় বসিয়ে দেওয়া হয়েছিল, থিয়েটার দেখছিলেন। নেলীদিদির বিয়েতেও রাত জাগতে পারিনি বলে থিয়েটারের কথা ঠিক মনে পড়ে না।

দিদি ও নেলীদিদির বিয়ের সময় বাবা দু-একটা অয়েল-পেন্টিং করছিলেন। তারপর সব ছেড়েছুড়ে খালি স্কেচ করতে লাগলেন। যা দেখেন, যাকে দেখেন তাই আঁকেন। বারান্দার নীচে দিয়ে লোক যায়, আর উপরে বসে ছবি আঁকেন। দক্ষিণের বারান্দায় বসতেন তিন ভাই। সামনে মতিবাবু, হরিশবাবু, কালাচাঁদ সাহা থাকতেন, সকলের ছবি এঁকেছিলেন। সে সব ছবির বই যে কোথায় গেল বলতে পারি না। তিনি যা আঁকতেন যত্ন করে রাখবার চেষ্টা করতেন না, ভাল না লাগলে ফেলে দিতেন। যে তার মর্ম বুঝত কুড়িয়ে নিয়ে যেত। এইরকম ফেলে দেওয়া অনেক ছবি আমার বড়ছেলে নীতি (নীতিনাথ চট্টোপাধ্যায়) কুড়িয়ে নিয়ে আসে।

(১১)

মাঝে মাঝে রবিদাদার মামা জগদীশবাবু আসতেন। বাবা কাকারা তাঁকে জগদীশদাদা বলতেন, তাঁকে নিয়ে খুব মজা করতেন। তিনি হুঁকো হাতে বসে ঝিমোচ্ছেন, বাবা তার স্কেচ করেছিলেন। আমরা যখন তাঁকে দেখেছিলুম, মুখে একটিও দাঁত ছিল না। বয়স সত্তর কি আশী হবে। কিন্তু বেশ শক্ত ছিলেন। তিনতলায় সিঁড়ি ভেঙে উঠতে মোটেই কষ্টবোধ করতেন না। তাঁর গায়ের রং খুব ফর্সা ছিল, মাথা জোড়া টাক। মাথার মাঝখানে একটি কিসমিসের মত আঁচিল ছিল, আমরা ধরে টানতুম, বলতুম 'কিসমিস্

খাবো'। তিনি অমনি তাঁর পকেট থেকে কিস্‌মিস্ ও মিছরির টুকরো বের করে আমাদের হাতে দিতেন। তিনি বলতেন, "আমি জলখাবার খাই না। একেবারে এগারোটার সময় ভাত খাই। চাল ভিজিয়ে জল, কিস্‌মিস্ ও মিছরি, এই আমার জলখাবার। দেখ আমার কোনও অসুখ নেই, ওষুধও খেতে হয় না। ভাত খাবার পর জল খাই না, একঘণ্টা বাদে খাই।" তাঁর খাওয়ার পরিমাণও বেশ ভাল ছিল। দিদিমা সেইজন্য সামনে বসিয়ে খাওয়াতে ভালবাসতেন। দুবেলাই আমাদের বাড়িতে খেতেন। তাঁর কাছে গোলাপী বলে এক ঝি ছিল। সে বলত, রাত্রে ও বাড়ির (রবিদাদার বাড়ি) এবাড়ির খাবারও বন্ধ করতেন না। আমাদের এখানে রাত আটটার সময় খেয়ে যেতেন। আবার রাত্রে গিয়ে ও বাড়ির দুধ রুটি ঢাকা থাকত, খেয়ে শুতে যেতেন। যখন তিনি খেতেন, বাবা-কাকারা দাঁড়িয়ে দেখে অবাক হতেন, বলতেন, "দেখ, এত বয়সেও কি রকম স্বাস্থ্য রেখেছেন।" দিদিমা তাঁকে জগদীশমামা বলে ডাকতেন।

শুনেছি, একবার নাতিরা মিলে তাঁকে বলেন, "জগদীশদাদা ভাল কাশীর চিনি খাওয়াতে পার?" তিনি সোৎসাহে বললেন, "নিশ্চয়ই পাবি। টাকা দাও।" দশটাকা নিয়ে চলে গেলেন। বেশ কদিন আর তাঁর খোঁজ নেই। সবাই ভাবছে, কি হল, চিনি আনতে কোথায় গেলেন? বুড়ো মানুষ রাস্তায় বিপদে পড়লেন নাকি? অনেক চেষ্টা করেও কোন খবর পাওয়া গেল না। দিন দশেক বাদে চিনি হাতে এসে হাজির। সকলে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "ব্যাপার কি জগদীশদাদা, এতদিন ছিলে কোথায়?" তিনি গম্ভীরমুখে উত্তর দিলেন, "কেন, কাশী থেকে চিনি নিয়ে এলুম!"

বিলিয়ার্ড খেলা হত যখন বড়বাড়ির নিতুকাকা (১), অরুজ্যাঠা (২), কৃতীকাকা (৩), সুধীকাকা (৪), সত্যজ্যাঠা (৫) সকলেই খেলতে আসতেন। একবার সকালের দিকে খেলা জমত, আবার বিকেলের দিকেও খেলা হত! মার্কার আসত, দাদাদের দলবলও সব আসত। পর পর সব হাত বদল করে খেলত। বড় বাগানে টেনিস খেলা হত। বাবা-কাকাদেরও খেলতে দেখেছি, পরে দাদারাই খেলত। সন্ধ্যের সময় বিলিয়ার্ড চলত আটটা অবধি। তখন কত লোক আসত যেত। সারাদিন লোক আসার বিরাম যেত না। যেমন তীর্থযাত্রীরা আসে দেবদর্শনে। ভালমন্দ কত লোক আমরা দেখতুম, চেনা, অচেনা, দক্ষিণের বারান্দায় তিন ভাই পাশাপাশি বসে। দুজন ছবি আঁকছেন,

আর মেজকাকা, সমরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বইমুখে বসে আছেন। তখন ভরপুর সংসার, চারদিকে বোলবোলাও লক্ষ্মীশ্রী বিরাজ করছে। সে দৃশ্য না দেখলে কেউ বুঝতে পারবে না। চারদিকের আবহাওয়ায় আনন্দ মাখানো। তখন কলকাতায় পয়সাওয়ালা বড়মানুষ অনেক দেখা যেত। কিন্তু মনে বড়মানুষ খুব কম দেখা যেত। তিন ভাইয়ের সদ্‌ভাব ও মাতৃভক্তি ওঁদের অটুট রেখেছিল। দিদিমাও সব সময় বলতেন তিনটি গুরু রেখে যেতে পারলে হয়। তিনি তিন ছেলে ও দুই মেয়েকে রেখে গেছেন, যেমন অল্প বয়সে পাঁচটিকে নিয়ে বিধবা হয়েছিলেন—

১—(দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সেজ ছেলে নীতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

২—(দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মেজ ছেলে অরুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর)

৩—(দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোট ছেলে কৃতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

৪—(দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ন ছেলে সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

৫—(দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দৌহিত্র সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়)

দিদিমা নানারকম কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। তারই ভিতর কে কি খাবে তার ব্যবস্থা মাকে বলে দিতেন। তিনি চলাফেরা করতে পারতেন না। একখানা তক্তার উপর সককাঠির মাদুর পাতা থাকত। বড় তাকিয়ায় হেলান দিয়ে আধশোয়া অবস্থায় বসে থাকতেন। সামনে পানের বাক্স ও পিকদানী থাকত। একখানা রুমাল ও ল্যাভেণ্ডারের বড় শিশিতে ওডিকোলন মেশান থাকত, মাঝে মাঝে মাথায় থাবড়ে দিতেন, বলতেন 'মাথা গরম হয়।' পানও খুব খেতেন, কিন্তু ছিবড়ে ফেলে দিতেন। দোক্তা খেতেন না। নানা মশলা, বড় এলাচ দিয়ে কড়ুই পান খেতেন—খুব ভাল লাগত খেতে, অনেকেই ভালবাসত। যে তাঁর কাছে আসত, তাকেই পান দিয়ে খাতির করতেন, যে না খেত সেও হাত পেতে নিত, বলতেন, "দেখ খেয়ে, ভাল পান।" আমার শ্বশুর সেই পান খুব ভালবাসতেন। বলতেন, "যখন আসবে, দিদির কাছ থেকে পান চেয়ে আনতে ভুললে কিন্তু বকুনি খাবে।" আমার স্বামী আগে পান খেতেন না, বিয়ের পরে এমন পান খেতে শুরু করেছিলেন যে সামলান দায় হয়েছিল। আমার শাশুড়ী বলতেন, "দিদি শাশুড়ী আদর করে পান খেতে শিখিয়ে গেছেন, এখন আমি অস্থির হয়ে গেলুম।"

দিদিমার পান সাজার জন্য একজন গোলাপী নামে দাসী ছিল। তাছাড়া মায়েরাও হাত লাগাতেন। বৌঠান বিয়ে হয়ে আসার পর সেও সাজাত।

যেন একটা বিয়েবাড়ির পান সাজা হত। ভোরবেলা দিদিমা পুজো সেরে এলে আমরা পুজোর মাখন মিছরি খেতুম। তিলকমাটি দিয়ে গায়ে বিষ্ণুর পদচিহ্নের ছাপ দিতেন। বাবা সেই ছাপ ছবিতে দিতেন, বাকী কতকগুলো আমাকে দিয়েছিলেন, বললেন, "তুই ত পুজো করিস, নিয়ে যা।" সেগুলো এখনও আমার কাছে আছে। বাবা আমাকে যা হাতে করে দিয়েছেন, দরকার হোক না হোক যত্ন করে রেখে দিতুম, তাই তাঁর দেওয়া অনেক জিনিস রয়ে গেছে। আদরের দান বলে ফেলতে ইচ্ছে হত না।

একদিন দিদিমা পুজো সেরে এসে পূজারী বামুনকে ডেকে পাঠালেন। তার নাম ছিল মাণিক, বললেন, "মাণিককে ডাক তো।" সে এলে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কি ঠাকুরকে তেল দিয়ে চান করাও না?" সে বললে, "কেন মা এ কথা বলছেন, জানতে পারি কি?"

"না, তুমি ঠাকুরকে রুখু চান করাও। আমি কাল স্বপ্ন দেখেছি, ঠাকুর বলছেন, 'তুই দেখিস না, আমার তেল নেই, রুখু চান করছি।"

বামুন তখন বললে, "মাফ করবেন, দু'দিন হল ফুলেল তেল ফুরিয়ে গেছে। আনতে ভুলে গেছি।" "এক্ষুণি যাও, রামলালবাবুকে আমার নাম করে বল, এখনই আনিয়ে দেবেন।"

আমরা মনে করতুম খুব বকবেন। কিন্তু দোষ স্বীকার করলে আর কিছু বলতেন না। এমন রাশভারী লোক ছিলেন, দেখলেই ভয় হত। আমরা ভাবতুম অত ওডিকোলন মাথায় দেন বলে মাথা গরম হয়, রাগা লোক। কিন্তু মোটে সে রকম লোক ছিলেন না। আমাদের কখনও মারেননি, ধমক দিলেই আর সে কাজ করতুম না। তবে বেচাল হবার জো ছিল না। বাড়ির ছেলেমেয়ে বৌদের ও সকল কর্মচারীদের শাসন তাঁরই ব্যবস্থামত হত।

দিদিমার হাতের চরকার সুতো কাটা এত সরু হত যে স্বদেশীর সময় সেই সুতো দিয়ে বাড়িতে তাঁতে বোনা কাপড় দেশী কাপড়ের মত পাতলা হয়েছিল। প্রথম বোনা কাপড় বাড়ির ঠাকুর নারায়ণের জন্য দিয়েছিলেন। তখন নাতনী যারা বড় হয়েছিল সকলকে একটা করে চরকা দিয়েছিলেন। শুধু সাজানোর জন্য নয়, সকলকে সুতো কেটে জমা দিতে হত। শুধু তাই নয়, হরিশবাবুকে দিয়ে আঁকিয়ে আমাদের কাঁথা সেলাই করতে দিতেন। মাঝে মাঝে আমাদের পালা করে এক ভাগ রাঁধবার ব্যবস্থা হত। বলতেন, "চাকর-দাসীকে দিয়ে কিছু করাবি না, নিজেরা সব জোগাড় কর্। দাসীরা উনুন ধরিয়ে দিয়ে যাবে,

বাটনা বেটে দেবে, কি রান্না করবি, তাতে কি কি মশলা, তরকারি কাটা," তেল-নুন কত কি লাগবে সব জোগাড় করে নিয়ে আয়। ছোট কলসী করে জল নিয়ে আয়।" তারপর বলতেন, "আমার কাছে আয়।" কি করে গাছকোমর বাঁধতে হবে দেখিয়ে দিতেন। পাছে কাপড়ের আঁচল খুলে আগুনে পড়ে তাই বেশ আঁটসাঁট করে বেঁধে দিতেন। তারপর বলতেন, "কড়া চাপা, এই রকম করে নাড়। তেল দে। তরকারী ছাড়্। তেল ছিটিয়ে গায়ে না পড়ে।" তাঁর কাজের পদ্ধতি দেখলে অবাক হতে হয়।

বিকেলে সব নাতিদের চুলবাঁধার পালা চলত। বেশ চ্যাটাবিনুনী করে চুল বাঁধা হত। চুলবাঁধা পর্ব সারা হলে জলখাবার খেয়ে কাপড় বদলে বাগানে বেড়াতে যাওয়া হত। গরমের সময় বিকেলবেলায় দিদিমা ছাদে বসতেন সেইখানেই সব লোক আসত, গল্প করতেন। রোদ পড়ে গেলে দিদিমার ভবদাসী, মোক্ষদা দাসী এসে ছাদে জল দিয়ে তক্তা ধুয়ে যেত। দুটো বড় বড় তক্তা জোড়া ছিল, অনেক লোক বসতে পারত। তার উপর সরু কাঠির মাদুর পেতে দিয়ে যেত, তাতেই বসতেন।

(১৩)

রবিবারে রবিবারে বড়পিসী আসতেন তাঁর ছেলেমেয়েদের সঙ্গে নিয়ে সেদিন সব সমবয়সীরা মিলে ছোট কাকার ঘরে বেডকভার টাঙিয়ে ড্রপসিন তৈরী করে থিয়েটার করা ছিল খেলা। বড়দের সঙ্গে মিশতে পারতুম না। বাগানে গিয়ে খেলা হত। সী-সতে লাফান আর সমস্বরে চীৎকার করে হুইসিল দিয়ে ট্রেন চালান হত। (১) প্রতিমাদিদি থাকত। মীরাপিসীও (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মেয়ে) আসত। (২) ও দিক বড়বাগানে বড়দের টেনিস খেলা হত। আমি করুণাদিদি (৩) (ছোটপিসীর মেয়েরা বাড়িতেই থাকত) দাশুদিদি, (৪) অম্বুজাদিদি, (৫) হ্লাদনদাদা, (৬) হরিদাস, (৭) আলোক, (৮) সকলেই থাকতুম। আমাদের মধ্যে রমা, (৯) সবার ছোট ছিল, মেজকাকার যমজ মেয়েদের (তাদের সকলে বড়পুটি, (১০) ছোটপুটি, (১১) ব ডাকত) বয়সী ছিল। অরুজ্যাঠার বড়মেয়ে ললিতাদিদিও আসত। যদিও আমাদের চেয়ে ললিতাদিদি বড় ছিল, কিন্তু তার সঙ্গী না থাকায় আমাদের দলেই যোগ দিত।

অলোক তখন খুব ছোট ছিল, আমাদের সঙ্গে যোগ দিত না, আলাদা বেড়াত, মাঝের বাগানে খেলা করত। আমি যখনকার কথা বলছি তখন

মাঝের বাগানে ফোয়ারা খুব গভীর ছিল। একদিন বিকেলে অলোক ফোয়ারার ধারে দাঁড়িয়ে দেখতে দেখতে হঠাৎ জলে পড়ে যায়, তাড়াতাড়ি চাকর তুলে নেয়। অলোক একবার পুকুরে ডুবে যায়। আমার ঠিক মনে নেই কোন জায়গায় গিয়েছিলুম। রামলালবাবু সঙ্গে ছিলেন, চাকরেরা ছিল। সব ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়ে পুকুরের ধার দিয়ে আসা হচ্ছিল। অলোক একটু দুষ্টু ছিল, কথা শুনত না, চাকরের হাত ছাড়িয়ে পানা দেখে ঘাস ভেবে পা দিয়ে জলে ডুবে যায়। সঙ্গের চাকর তাড়াতাড়ি তুলে নেয়। কাপড় সব জলে ভিজে যায়। আমার কাপড ওর গায়ে হবে না। হরিদাস তখন ছোট। হরিদাসের কতক কাপড় খুলে ওকে পরানো হল।

অলোক ডুবে যাবার পরে ফোয়ারা বুজিয়ে দেওয়া হয়, হাত বাড়ালে তলায় হাত পৌঁছত। পাথর দিয়ে তৈরী পদ্মফুলের মত ফোয়ারা ছিল। সেই সময় দু'পাশে দুটো জাপানী বাড়ি দেওয়া হল, খোলা জাপানী পুতুল ছিল, তোলা যেত। ছেলেদের দয়ায় প্রায়ই এক একটা পুতুলের পাত্তা পাওয়া যেত না। সে সময় মেজকাকা ভোরে বাগানে পায়চারি করতেন বলে টালি বসিয়ে বেড়াবার রাস্তা করা হয়। তারপর সামার হাউস তৈরী করা হয় বসে জিরোবার জন্য। আর একটা ফোয়ারা গাছ ঘরের ভিতরে ছিল, গাছে জল দেবার জন্য। কত রকম ভাল ভাল গাছ ছিল, ভাগবত মালী সব দেখত, গাছ লাগাত। সে ভাল গাছের কলম করতে পারত। বাবা মাঝে মাঝে গাছ ঘরের ভিতরে গিয়ে দেখতেন সব ঠিক আছে কিনা। আরও একটা ফোয়ারা বিলিয়ার্ড ঘরে রেখেছিলেন। সেটা অনেক পরে হয়। তারপরে ছোটকাকা খাঁচা তৈরী করে নানারকম পাখী ছাড়েন।

ঐ গোল বাগানে সকাল বিকেল পাড়ার সব বাড়ির লোকেরা আসতেন, বেঞ্চ পাতা ছিল। সকলে বসে গল্প করত, আড্ডা দিত। সন্ধ্যে হলে যে যার বাড়িতে চলে যেত। কেউ কেউ থেকেও যেত, গানটান হলে শুনত, বিলিয়াড খেলত। কোন কোনদিন খেয়েও যেত। বাবুর্চীখানার খাবারের সঙ্গে বাংলা খাবার থাকত। গমের আটার রুটি, লুচি, যশোরের নলেন গুড়, পাটালিও থাকত, যে যা চাও পাবে। সন্দেশ, রসগোল্লা, পোলাও, মেঠাইও বাদ যেত না। গরমের সময় নবীন বাবুর্চী আইসক্রিম ছাঁচে ঢেলে তৈরী করতো। হাঁস মুর্গী প্লেটে বসিয়ে দিত; কেমন শক্ত হয়ে থাকতো। সেই লোভে আমরাও খেতে যেতুম। কতরকমের মাংস থাকতো। বাবা কাকারা আমাদের মুখে

দিতেন। আর বলতেন, "কিসের মাংস খাচ্ছো জানো?" যদি বলতুম, "না" চালাকী করে বলতেন, "ব্যাঙের মাংস।" সেই শুনে নাক সিঁটকোতুম।

সেইসময় দিদিমার কাছে অনেক দুঃস্থ বিধবা মেয়েরা নানারকম রং-করা মাটির বেনে পুতুল, পুঁতির টেবিল' চেয়ার, শাঁখা, পৈতে আনত। তাদের সাহায্য করবেন বলে আমাদের কিনে দিতেন। এক একদিন বাগান থেকে ডেকে পাঠিয়ে সবাইকে দিতেন, তাদের ধামা শেষ হয়ে যেত। তখনকার হাতে তৈরী জিনিস কি সুন্দর ছিল। ঐ সব খেলনা বিক্রী করে তারা জীবিকা চালাত, বড়মানুষেরা কিনে সাহায্য করত। বেশ বড় পুতুল। দাম কি ছিল, দু'পয়সা, চার পয়সা। পোড়ামাটির উপর তেলের রঙ করা ঘাড়নাড়া বুড়ো হুঁকো খাচ্ছে। নাপতানী যখন আসত, বাড়িশুদ্ধ মেয়েদের আলতা পরাতে রাত হয়ে যেত।

বাগানে কত সারস ছিল। ময়ূর ছিল, সন্ধ্যা হলে ডাকত, পেখম ধরে নাচত। মালীরা এসে সারসগুলোকে খাঁচায় তুলে দিত। ময়ূরটা তখন খাঁচায় থাকতে চাইত না। বাগানে একটা আমগাছ ছিল। শেয়ালের ভয়ে সেই গাছের মগডালে বসে থাকত। তখন জোঁড়াসাঁকোয় শেয়াল আসত। বাড়ির ফ্লোরের নীচে ঘরের মত ছিল। সেখানে একবার একটা শেয়াল ঢুকেছিল, চাকরেরা ঠেঙিয়ে মারে। সেই থেকে সেগুলো লোহার জাফরি করে ঢেকে দিয়েছিলেন। ঠাকুর ঘরে শাঁখ বাজলে ভগীরথ ফরাস এসে আলো জ্বেলে দিয়ে যেত। দাসীরা আমাদের বাগান থেকে নিয়ে আসত, বলত, "ঐ, ময়ূর বলছে 'পালাও।" ময়ূরের ডাক শোনাত ঠিক 'পাল্লাও, পালাও। আমরা বাড়ির ভিতর চলে আসতুম, গোল বাগানে বাবুরা তখনও সব গল্প জমাতেন। (২)

(১) দোলনায় দোলা, লুকোচুরি ছাড়াও আর একটা খেলা ছিল গাছে গাছে প্রজাপতি ধরা। মস্ত বড় সাজানো বাগান ছিল। ফুলগাছের পাতায় পাতায় প্রজাপতির ডিম কেমন সোনালী রূপোলী নোলকের মতন ঝুলত। তাই নিয়ে এসে সাবানের বাক্সে পাতা দিয়ে রেখে দিলে দেখা যেত কখন প্রজাপতি হয়ে উড়ে গেছে। আবার কখনও কখনও মরে পড়ে থাকত। যদিও বাক্সে ফুটো করা থাকত হাওয়া ঢোকবার জন্য। মরে গেলে তখন তাকে নিয়ে সব ছেলেমেয়েরা মিলে শোভাযাত্রা করে বাগানে গিয়ে গোর দেওয়া হত। তখন যত ছোটবড় ছেলেমেয়ে যার কাছে যা

খেলার বাজনা বাঁশি পেত নিয়ে এসে আমাদের সঙ্গে যোগ দিত। বাগানে একটা ঝাউগাছের তলায় অনেক পাথরকুচো ঢালা ছিল। সেই পাথর সরিয়ে প্রজাপতিটাকে রেখে চাপা দেওয়া হত। আমাদের খেলা দেখে দাদারা এসে আমাদের মাথায় চাঁটি মেরে বলত,"এসব তোমাদের কি হচ্ছে ?" তারা তখন বড় হয়ে গেছে বলে দাদাগিরি ফলাতে যেত, কিন্তু তাদের কাছ থেকেই যে আমাদের শিক্ষা সে কথা ভুলে যেত বাবা কাকাবা তিনভাই দোতলার বারান্দায় বসে আমাদের খেলা দেখে হাসতেন। দাদাদের বলতেন, "কেন ওদের মারছ ? দেখনা ওরা কি করছে।" তখন ওরা হাসতে হাসতে চলে যেত। বাবা কখনও অন্যায় কাজ না দেখলে ছেলেদের খেলায় নিরুৎসাহ করতেন না।

(২) রবিদাদার ছোট মেয়ে মীরা আমাদেরই সমবয়সী। আমার চেয়ে এক বছরের বড় ছিল। সমবয়সী বলে তাকে আমরা পিসী বলতে পারতুম না, নাম ধরে ডাকতুম। প্রতিমাদিদি আবার জোড়াসাঁকোতে ফিরে এলে আমাদের পিসী বলা অভ্যাস করাল। সে বলত, "এক বয়সী হলেই বা, পিসীকে পিসীই বলা উচিত।"

প্রতিমাদিদির সঙ্গে মঞ্জরী নামে একজন ঝি আসত, তাকে নিয়ে খুব মজা করা হত। আমরা তাকে ধরে নাচাতুম। সে মাথায় হাত দিয়ে নাচত, আর গান গাইত। আমরা তাই দেখে খুব হাসতুম, সে কিন্তু ঠাট্টা টের পেত না।

(৩)—(অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মেজমেয়ে)

(৪)—(সুনয়নী দেবীর মেজমেয়ে প্রভাতী)

(৫)—(সুনয়নী দেবীর ছোটমেয়ে)

(৬)—(সমরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মেজছেলে সুবীন্দ্রনাথ)

(৭)—(সুনয়নী দেবীর বড়ছেলে রতনমোহন চট্টোপাধ্যায়)

(৮)—(অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বড়ছেলে অলোকেন্দ্রনাথ)

(৯)—(দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ন ছেলে সুধীন্দ্রনাথের বড় মেয়ে)

(১০)—(সমরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মেয়ে মাধবিকা)

(১১)—(সমরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মেয়ে মালবিকা)

(১২) আমাদের বাড়ির বাগানে একটা লটকান গাছ ছিল। আমরা তার ফল কুড়িয়ে এনে শুকিয়ে রাখতুম। সরস্বতী পুজোর সময় কাপড় রং-করা হত।

শিউলিফুলের বোঁটা শুকিয়েও সুন্দর বাসন্তী রং হত। এই সব ছিল আমাদের কাপড় রং করার ব্যবস্থা। দিদিমাই হুকুম দিতেন, "যা এইবেলা সব তৈরী করে রাখ্। সরস্বতীপুজোর সময় দরকার হবে।" শিউলিফুলের পাপড়ি চটকে রস করে তার থেকে টিপ হত, তাই সকলে কপালে পরতুম। বকুল গাছ ছিল। গরমের সময় বকুল ফুল পড়ত, কুড়িয়ে এনে বিকেলবেলায় মালা গাঁথা হত। এই ছিল তখনকার খেলা।

তখন ভিতর বাড়িতে ইলেকট্রিক হয়নি। সিঁড়িতে ছাদ থেকে মোটা শিকল দিয়ে বড় লণ্ঠন ঝোলান ছিল। তাতে ডবল বাতি। তেলের গেলাস থাকত। আর দেয়ালের গায়ে দেয়ালগিরি জ্বলত। টানা বারান্দার মাঝে মাঝে বেল-লণ্ঠন ঝুলত—গোল হাঁড়ির মত, ভিতরে তেলের গেলাস থাকত। অত বড় বাড়ি, যেন অন্ধকার অন্ধকার মনে হত, অলিগলিতে যেতে ভয় করত। উপর থেকে নেমে এসে বৈঠকখানায় যেতে দরজার সামনে একটা কাঠের পার্টিশন দেওয়া ছিল, ভিতরবাড়িকে আড়াল করবার জন্য। সন্ধ্যের সময় তিনতলার হলে দিদিমা বসতেন। সেই খানেই লোক আসাযাওয়া হত। আমাদের থিয়েটারের সময় ছোটপিসী আমাদের গান শেখাতেন ও রিহার্সাল দেওয়াতেন। বাবা—কাকারাও থাকতেন, দেখিয়ে দিতেন। আমার অল্প মনে পড়ে মা, কাকীমা ও পিসীমারা মিলে একবার রত্নাবলী থিয়েটার করেন। ঐ হলেই হয়েছিল। বড়পিসী রাজা সাজেন। মা রত্নাবলী। কাকীমারা ও ছোটপিসী কি সেজেছিলেন ঠিক মনে নেই। বাবা আমাদের ঘরে দাঁড়িয়ে সাজিয়ে দেন। জানলার ধারে একটা আয়না ছিল। সেইখানে দাঁড়িয়ে বাবা বিদূষক ও বড়পিসীর গোঁফ আঁকছিলেন। বিদূষক কে সেজেছিল ঠিক মনে পড়ছে না। সাজটা মনে আছে, লোকটা কে মনে নেই, বোধহয় সিমলের দিদি। তিনি খুব নকুলে ছিলেন।

(১৩) ······গল্প জমাতেন।

বৈশাখ মাসে ঠাকুরঘরে বিকেলবেলায় শীতল দেওয়া হত। যত রকম নতুন ফল উঠত সমস্ত ফল, দই, বাবড়ি, ছানা, মাখন, মিছরী সবই দেওয়া থাকত। একদিন করে প্রত্যেক আত্মীয়ের বাড়ি পাঠান হত। আবার তাদের বাড়ি থেকেও ঐ রকম প্রসাদ আসত। আমাদের বাগান থেকে ডেকে এনে প্রসাদ খেতে দিতেন।

শুনেছি যখন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রাহ্ম হয়ে যান, তখন তাঁর অনুপস্থিতিতে

তাঁর সেজছেলে হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর শালগ্রাম শিলা পুকুরে ফেলে দিয়েছিলেন। নবীনবাবুর ভাই ঈশ্বরবাবু সেই শালগ্রাম শিলা জল থেকে উঠিয়ে নিয়ে নিজের বাড়িতে রাখেন। কিন্তু নিয়ে যাওয়ার পর তাঁর পা ভেঙে যায়। তাছাড়া কি সব স্বপ্ন দেখে তিনি সেই শালগ্রাম আমাদের বাড়িতে দিয়ে যান। সেই থেকে আমাদের বাড়িতেই পুজো হত, আর ঠাকুরের ভোগ নবীনবাবুর বাড়ির গিন্নীদের জন্য পাঠান হত। বরাবর বংশ পরম্পরায় ওঁদের বাড়িতে যেত। আমরা দেখছি বারমাস একজন ভিখারী আসত। বারটার সময় ঠাকুরের ভোগ দেওয়া হয়ে গেলে যে উঠোনে বসে খেত। তারপর দিদিমা মাণিক ঠাকুরকে বলতেন, "আমার জন্য অল্প প্রসাদ রেখে যাও নবীনবাবুর বাড়িতে দিয়ে এস। আমাকে দেখিয়ে নিয়ে যাও।" রোজকার কাজের সময়েও ভুল হত না। সন্ধ্যে সকাল দুবেলাই ভোগ যেত।

……আলতা পরাতে রাত হয়ে যেত।

দিদিমার কাছে মোহিনী নামে তাঁতিনী আসত কাপড় বিক্রী করতে। এগার হাতের তাঁতের শাড়ি। কতরকম পাড়ের নাম বলত। কস্তা পাড়, কোকিল পাড়, সিঁথের সিঁদুর—কতরকম বুলি আওড়াতে শুনতুম। তাও কেনা হত সব মেয়েদের জন্য। আর একজন কৈলাসী বলে তাঁতিনী আসত। তার কাপড় নাকি পছন্দসই হত না, কাচ পড়লে গুটিয়ে যেত। মোহিনীর পুরো এগার হাতেরও বেশী থাকত। এইরকম সব মন্তব্য শুনতে পেতুম। কৈলাসী ঠিক তাঁতিনী ছিল না। আগে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বড়বাড়িতে ঝি ছিল। কাজ চলে গেলে কাপড় বিক্রী করত।

১৪

মাঝে মাঝে কাশীর দাদামশায়, কাশীর দিদিমা ও ছোটমাসী আমাদের বাড়ি আসতেন। ছোটমাসী দাদামশায়ের কাছেই থাকতেন। তাঁদের আসার কথা শুনতে পেলে আমরা ছোট ছেলেমেয়েরা, আর পক্ষে রাখতুম না। সকলে মিলে দোলনায় চড়ে বাড়ি ফাটিয়ে চীৎকার করা হত, "কাশীর দাদা, কাশীর দিদি, কুচুন মাসী আসবে।" যার মাসী নয় সেও বলত মাসী।

কাশীর দিদি কলকাতায় এলে, তাঁর চোরবাগানে বাড়ি ছিল, সেখানে থাকতেন। বাবা তাঁর হাতের বাংলা পাঁঠা খেতে ভালবাসতেন

বলে বেঁধে খাওয়াতেন। তাঁর হাতের রান্না খুব ভাল ছিল। মাও তাঁর কাছ থেকে রান্না শিখেছিলেন, খুব রাঁধতে পারতেন। বাবার মামীমার কাছে মা চুঁই দিয়ে যশোরের কই মাছের ঝোল বাঁধতে শিখেছিলেন। মাংসের রান্নাও খুব ভাল হত। ওদের ডালনা আমি খেতে ভালবাসতাম বলে যেদিন রান্না করতেন বিয়ের পরেও আমাকে গাড়ি পাঠিয়ে শ্বশুর-বাড়ি থেকে নিয়ে আসতেন। মাংসের কাবাব, কুচো চিংড়ির অম্বল আর কারও হাতে অমন হত না। একবার খেতে চাইলেই হত। না খাইয়ে আর থাকতে পারতেন না। বয়স হলে ঘোরাঘুরি করতে পারতেন না। তখনও জোগাড় করে দিলে চেয়ারে বসে বসেই রাঁধতেন, কাউকে হাত দিতে দিতেন না। মায়ের অসম্ভব ধৈর্য ছিল। খাটতেও পারতেন। অতবড় পরিবারে আঁতুড়ের ভার নেওয়া অসুখ-বিসুখে দেখাশোনা মা ছাড়া আর কেউ পারত না। দিদিমাও তাই সব কাজেই মাকে ডাকতেন, 'ও বৌ মা, দেখ, এদিকে এস।" কে পড়ে মাথা ফাটিয়েছে মা বেঁধে দেবেন, আর কেউ সাহস করে যাবে না। বাবা ত' রক্ত-র দিকেই যাবেন না। ছোট পিসীও ভীতু ছিলেন, ছোটকাকীরও সাহস (সুহাসিনী দেবী) ছিল না। ওঁদের মধ্যে মেজকাকী (নিশিবালা) আর ছোটকাকার একটু সাহস ছিল। তাও সব সময় বৌঠান না থাকলে চলত না। মোহনলাল যখন জন্মায়, ছোটকাকী মাকে ডাকেন, "দিদি তুমি এসে দাঁড়াও, আমার ভয় করে।" তবু দিদিমা তখন বেঁচে ছিলেন। তার পরে বছর দুই বাদে দিদিমা মারা যান। মা বলেন, 'সুলতানা পুরনো দাই রয়েছেন, ভয় কি?"

"তা হবে না, তোমাকে থাকতে হবে। করুণা বড় মা কোথায় ডাক, বলছে।"

ছোটকাকার ছেলেমেয়েরাও মায়ের কাছঘেঁষা ছিল। অলোক আর করুণাদিদি বেশী ভালবাসত। এলাহাবাদে যখন নবু হয়, অলোকের তিন বছর বয়স। প্রিমল সিরাপ খেত। ছোটকাকী সেদিন ভোরবেলা বললেন, "যা বড়মার কাছে সিরাপ আছে, খেয়ে আয়।" ও এসে দেখে মা শুয়ে আছেন, কিন্তু পাশে ছেলে দেখে পালিয়ে যায়। ছোটকাকী জিজ্ঞেস করলেন, "কি হল, সিরাপ খেলি না?"

সে বলে, "বড়মার কাছে কে একটা ছেলে শুয়ে আছে কেন?"

ছোটকাকী বললেন, "বড়মার কাল রাত্তিরে ছেলে হয়েছে, যা দেখে আয়।"

ও বলে, "না, ওকে ফেলে দিতে বল তবে যাব।"

ছোটকাকী বোঝালেন, "ও কথা বলতে নেই, যাও দেখে এস, আব ওষুধটা চেয়ে আন।"

সেই থেকে ওষুধ চাইতে আসত, কিন্তু মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত, (নবুব দিকে) দেখত না।

বাড়িতে বিয়ে-থার সময় মা সমস্ত নিজেব হাতে করতে ভালবাসতেন। সারাদিন জলখাবার খেয়েই কাটিয়ে দিতেন। দিদিমা বলতেন, "বৌমা খেয়ে নাও।"

মা বলতেন, "না মা, এখন খেলে আর খাটতে পারব না। সব হয়ে গেলে খাব।" তখন আমাদের বাড়িতে বিয়ে ত' লেগেই ছিল। একটির পর একটি চলতই। তা ছাড়াও বারো মাস এত লোক আসা-যাওয়া করত, এখন বিয়ে বাড়িতেও অত লোক দেখা যায় না। সব কাজ সেরে রাত্রিবেলায় সকলেব খাওয়া হয়ে গেলে যখন আলো নিভে যেত তখন বাতি জ্বেলে মা বঙ্কিমবাবুর বই, আরব্য উপন্যাস ইত্যাদি থেকে গল্প পড়ে আমাদের শোনাতেন। তাঁব চারিদিকে দিদি, নেলীদিদি, করুণা দিদি, আমি সকলে ঘিরে বসে শুনতুম।

(১৫)

রান্নাবাড়ি একটা আলাদা মহলই ছিল। নীচে দপ্তরখানা ছিল, উপরে বড় লম্বা ঘর ছিল। তার সামনে তিনটে জানালা, দু-পাশে দুটো জানলা ছিল। এখন সে রকম ঘব পেলে একটা পরিবার ছেলেমেয়ে নিয়ে অনায়াসে থাকতে পারে। একদিকে পান সাজার মাদুর পড়ত, আব একদিকে তিন চারজন দাসী, সঙ্গে মাও থাকতেন। তরকারী কাটা হত। দিদিমা পুজো সেরে নীচে নেমে এসে বসতেন। তিনি মাটিতে বসতে পারতেন না বলে চেয়ারে বসে সামনে একটা টুলের উপব বঁটি রেখে তরকাবী কুটতেন। নীচে বসে দাসীরা ছাড়িয়ে দিত তাঁব কাছে। তিনি যেরকম লাগবে ভাগ করে দিতেন। মাকে বলতেন, "বৌমা দেখত, বামুনদের ডেকে দাও।" মেজকাকী ওদিকে চালডাল মেপে দিতেন। এত ধামা ধামা দফায় দফায় চাল মাপতে হত, একলা পারতেন না। অম্বিকা দাসী সঙ্গে থাকত। সে আবাব বাটনাও বাটত। কি তাল তাল বাটনা হত। সেই শুধু বাটনা বাটত! একজন চাকর ছিল। শ্রীনাথ নামে। সে শুধু রুটি লুচি করত। সকালে বাজারে

যেত, আর মাছ কাটত। রুক্মিণী নামে ঝি ছিল, সে দুবেলা দুধ জ্বাল দিত আর রুটি লুচি তৈরীর সময় শ্রীনাথের সঙ্গে থেকে জোগান দিত। বাড়িতে অত লোক, শ্রীনাথ একা সব রুটি লুচি বেলে উঠতে পারত না। দেউড়িতে দারোয়ানেরা থাকত। আগে হেড দারোয়ান ছিল ছেদী। সে মারা গেলে অছিলাল ছিল। ঠাকুরঘরে ছিল মাণিক ঠাকুর এবং শ্রীধর নামে চাকর। দপ্তরখানায় সারদা চাকর ছিল, সরকারদের কাজ করত। দু-তিনজন সরকার ছিলেন। পুরনো সরকার রামলালবাবু খাতা লিখতেন। তিনি দাদামশায় গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আমলের লোক বলে আমরা ছোট ছেলেমেয়েরা তাঁকে দাদামশায় বলতুম। বাড়ির চাকর-দাসী, দারোয়ানেরাও তাঁকে দাদামশায় বলে ডাকত। দপ্তরখানায় লম্বা তক্তার উপর সতরঞ্চি, তার উপর সাদা চাদর পাতা থাকত। সামনে কাঠের হাতবাক্স থেরো বাঁধান খাতা রেখে রামলালবাবু হিসেব লিখতেন। বেশ নাদুসনুদুস চেহারার মানুষ। মাথার চুল, গোঁফ পাকায় কাঁচায় মেশান। মাথায় অল্প টাক ছিল, রং ময়লা ছিল। আমরা পয়সা চাইতে গেলে বলতেন, "আমার পাকা চুল তুলে দে, তবে পয়সা দেব।" আমরা পাকা চুল তুলে দিয়ে পয়সা এনে ক্ষীরের গুঁজিয়া, লজেন্স কিনে খেতুম। সারদা চাকর রামলালবাবুর কাজ করত। তামাক সাজা, কাপড় কাচা, বাসন মাজা তাঁর দেখাশোনার ভার তার উপরই ছিল।

রামলালবাবু ছাড়া আরও চারজন সরকার ছিল, তারা যশোরের আত্মীয়। নাম ছিল জ্যোতি, গুপী, পচা ও পুঁটে, চার ভাই। আমরা কাকা বলে ডাকতুম। জ্যোতিকাকা বাজার করত, গুপীকাকা দুধ দোয়া পচাকাকা ও পুঁটেকাকা ফাই-ফরমাস খাটত ছেলেদের সঙ্গে খোসগল্প করত। তাদের বৌ-য়েরাও মাঝে মাঝে এসে থাকত। আবার দেশে চলে যেত। পচাকাকা একটু পাগলাটে গোছের ছিল, অন্য কিছু করত না, পুঁটেকাকা অল্প বয়সেই মারা যায়। কিছুদিন বাদে তার বৌও মারা যায়। পচাকাকা একটু বেশী বয়সে বিয়ে করে। খাওয়াবার অবস্থা নেই দেখে বৌকে এখানেই এনে রেখেছিল। মায়ের কাছে থেকে ফরমাস খাটত। গুপীকাকার বৌও আস্তাবল বাড়িতে থাকিত। গোবিন্দ গোয়ালার গরুর খাটাল আস্তাবল বাড়িতেই ছিল। এ বাড়ি ও বাড়ির সবাই সেখান থেকেই দুধ নিত। তখন টাকায় ছ-সের করে দুধ, সামনে দুয়ে দিত। আগে অন্য গোয়ালা ছিল, তার নাম মনে নেই। আমাদের বিয়ে-থার পর গোবিন্দই দুধ দিত।

বাবা কাকাদের খাওয়ার বাসন মাজা, জায়গা করা, হাতে জল দেওয়ার জন্য দুজন চাকর ছিল। নাম অবিনাশ ও নীলু। আর নিচু আর নারাণ বড়দাদা—কনকদাদার কাছে কাজ করত। মেজকাকীর ঘরে তিনজন পুরনো ঝি ছিল বরদা, বামা, সিন্ধু, ছোটকাকীর ঘরে ছিল গুপী, হরিদাসী আর গোলাপী।

এ গেল ভিতরের ব্যাপার। বাইরে বাবুর্চীখানা ছিল। নবীন নামে বাবুর্চী খুব ভাল রাঁধত। মুসলমান নয়, জাতে মগ। তার একজন সহকারী চাকর ছিল। বাবা কাকারা রাতে ডিনার খেতেন। বাইরের ঘরে ঝাড়াপোঁছা করার একজন বেয়ারা ছিল। একতলার ঘর বারান্দা সব জমাদারেরা ঝাঁট দিত। তারা বৌদের আস্তাবল বাড়িতে সংসার পেতেছিল। বারমাস বাড়িতেই থাকত। আস্তাবলবাড়ির উপরের ঘরে সরকার আমলাদের বাড়তি লোকেরা থাকত। ফটকের উপরে একটা ঘর ছিল। সেখানে বুড়ো দর্জি থাকত, চশমা চোখে, ঠিক আলিবাবার দর্জির মত দেখতে ছিল। একটু আধটু সেলাই, বোতাম লাগানো, পর্দা সেলাই তাকে দিয়েই হত।

আস্তাবলে চারটে গাড়ি ছিল, ল্যাণ্ডো, ব্রুহাম, ছোটপিসেমশায়কে অফিসে নিয়ে যেত পাল্কীগাড়ি, আর ফিটন ছিল। তিন জোড়া ঘোড়া ছিল, একটা সাদা জুড়ি, একটা কাল জুড়ি আর লাল জুড়ি। সাদা জুড়ির একটা মরে গেলে কম্পাস হলে হাল্কা ফিটন গাড়ি টানত। বড় বড় সব ওয়েলার ঘোড়া ছিল। আর একজোড়া ঘোড়া নতুন রকম গোলাপী রঙ দেখে কেনা হয়।

বাগানে এনে দিদিমাকে দেখান হল মনে আছে। গাড়িতে জুতে রমজান কোচম্যান যখন বাগানের ভিতর দিয়ে চালিয়ে নিয়ে যায় দাঁড়িয়ে দেখে বললেন, "চমৎকার, কিনে ফেল্।" এই ঘোড়া বড়দাদার বিয়ের আগেই কেনা হয়েছিল। বাবার খুব ঘোড়ার শখ ছিল। যখন নতুন ঘোড়া কেনা হত, বাগানে এনে ব্রেক করান হত, দিদিমাকেও দেখাতেন। গাড়ীতে জুতে যখন যেত ঘোড়ার পায়ের গপ্ গপ্ আওয়াজ চিৎপুর রোড থেকেও কানে আসত। পুরনো কোচম্যান বাখরের পরে রমজান কোচম্যান এসেছিল। দুজন সহিস ছিল আবদুল আর খোদাবক্স।

একতলায় দক্ষিণের বারান্দায় কাঠের পার্টিশন দেওয়া ছিল। তার পিছনে বিশ্বম্ভর বেয়ারা তামাক সাজাত। তার পিছনে বরাবর কাছারীঘর ছিল একেবারে কলতলা অবধি। কলতলার উল্টোদিকে দপ্তরখানা, তার পাশে

উঠোন। তোষাখানার বারান্দায় পাথর দিয়ে বাঁধান ঢেঁকি ছিল। সেখানে দাসীরা গিয়ে চালটাল কুটত। তার পিছন দিকে সরকারদের শোবার ঘর ছিল। তোষাখানার পাশে ফটক ছিল, কল চৌবাচ্চা ছিল, সরকার চাকরেরা সেখানে চান কর্ত্ত। দপ্তরখানার সামনে বড় একটা আমগাছ ছিল। তারই তলায় ঘোড়াদের খাওয়ান হত, তরকারির ঘরের জানলা থেকে দিদিমা দেখতেন। আর ঐ আমগাছ তলায় পাগলা চম্পটি ভাত খেত। ইচ্ছে না হলে আমপাতা খেয়ে পালিয়ে যেত। তাকে আমাদের ছেলেরাও দেখেছে। আগে তাকে সবাই ভয় করে চলত। শুনেছি সে পিশাচসিদ্ধ ছিল, রেগে গিয়ে যাকে যা বলত তাই হত। তাই কেউ তাকে রাগাতে চাইত না।

কাছারীঘরের পিছনদিকে মোটা গরাদে দেওয়া ক্যাশঘর ছিল। ফণীবাবু আর কিশোরীবাবু জমিদারীর আয় ব্যয় দেখতেন। একজন দফ্তরী ছিল, নাম মনে নেই, আমরা প্রায়ই তার কাছে খাতা বই বাঁধাতে যেতুম। সে কালো, রোগা, বেশ লম্বা ছিল। মাথায় অল্প ঢেউ খেলানো কালো চুল ছিল। বয়স বেশী না হলেও একটু কুঁজো হয়ে চলত। খেঁকুড়ে গোছের চেহারা ছিল। ফণীবাবুর (ফণীভূষণ মুখোপাধ্যায়) রং খুব ফর্সা ছিল। মুখে অল্প দাড়ি। বেশ লম্বা চওড়া, আধাবয়সী, ভদ্র চেহারা। কিশোরীবাবুকেও দেখতে বেশ ফর্সা ছিল। মাথায় কাল চুল। বয়স খুব বেশী নয়। ভদ্র চেহারা ছিল। একজন ম্যানেজার ছিলেন তাঁর নামও কিশোরী। কিন্তু তিনি দেখতে কালো, মোটা ছিলেন। তাঁর পদবী মনে নেই।

বাবা আগে সকালবেলায় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়ির নীচের ঘরে কাছারীতে গিয়ে বসতেন দেখেছি। তখন এ বাড়িতে কাছারীঘর ছিল না। পরে একতলার ক্যাশঘরের সামনে দক্ষিণের বারান্দা ঘিরে ঘর তৈরী হলে সেইখানে কাছারী উঠে আসে। সেই থেকে মেজকাকা ও ছোট পিসেমশায় দেখাশোনা করতেন। বোধহয় বড়দাদা মারা যাবার পরে বাবা আর কাছারীতে বসতেন না।

তরকারি ঘরে দাঁড়ালে বাগান, আমগাছের তলা দে.. যেত। আমগাছের তলা দিয়ে বরাবর রাস্তা ছিল, বাবুর্চীখানা অবধি। তার পাশে একটা বড় কাঁঠালগাছ ও শিউলি গাছ ছিল। ঐখানে একটা ফটক ছিল। দিদির শ্বশুরবাড়ির সিঙ্গীবাগানের দিকে। চাকরদাসীরা ঐ ফটক থেকে যাওয়া আসা করত। দপ্তরখানায় ওঠার জন্য দুই টাপ সিঁড়ি, দুপাশে ছুটো খড়খড়ি পাল্লার

জানালা। একপাশে গরাদ দেওয়া বন্ধ জানালা। দপ্তরখানার ডানদিকে ছিল চাতাল। বেলে পাথর দিয়ে বাঁধান চাতালের পরে চাকরদের ঘর। চাতালের পিছনে দপ্তরখানার পাশে একটা ছোট ঘর ছিল। সেইখানে রামলালবাবু সরকার শুতেন। সেখানেও তক্তা পাতা চাদরঢাকা বিছানা ছিল। সেই ঘরের ভিতর দরজা ছিল। সেখান দিয়ে পশ্চিমে রান্নাবাড়ির উঠোনে যাওয়া যেত। রান্নাবাড়িটা একটা আলাদা চক-মেলান বাড়ি। একতলায় দাসীদের পায়খানা, কল ছিল। দোতলায় তিনদিকে ঘর, সেইসব ঘরে রান্না হত। একদিকে আঁশ রান্না, একটায় নিরামিষ রান্না, একটায় লুচিভাজা দুধ জ্বাল দেওয়া হত।

পুবদিকে ঠাকুরঘরের মেটে সিঁড়ি উঠে গেছে। ছাদে ঠাকুরঘর, তার পাশে ঠাকুরের রান্নার ঘর আর একটা ছোট ঘর ছিল, সেখানেই শ্রাদ্ধশান্তি হত। আমরা সেখানে ইতুর ঘট পেতে পূজো করতুম। ঠাকুরঘরের পুবে একফালি ছাদ ছিল, জাল দিয়ে ঘেরা। তার দরজা ছিল, চাবি দেওয়া যেত। সেখানে বাড়ি, আমসত্ত, তেঁতুল, আচার শুকোতে দেওয়া হলে চাবি বন্ধ করে রাখা হত। কাজ করা পাথরের থালায় আমসত্ত রোদে দেওয়া হত। শুকিয়ে গেলে যখন তুলে রাখতেন, পাশে চেঁছে মালার মত বেরোত তাই আমাদের খেতে দিতেন। "এখন আর পাবে না," দিদিমা বলতেন, "আম ফুরোলে তখন আমসত্ত পাবে। এখনই এই খাও।" সারা বছরের তেঁতুল কেটে শুকিয়ে রাখতেন। কাসুন্দির সময় কাসুন্দি হত।

শীতকালে নতুন চাল উঠলে নবান্ন হত। থোরা থোরা নবান্ন বাড়ি বাড়ি প্রসাদ পাঠান হত। বর্ষার সময় ধামা ধামা চিঁড়ে ভাজা, ভুট্টা এসব হত।

একবার শৈলীদিদির শ্বশুর নলিনবাবু এসে বললেন চাইনিজ গ্রাস দিয়ে বরফি তৈরী করবেন। তখন চাইনিজ গ্রাসের বরফি কি রকম জানতুম না। চাইনিজ গ্রাস এল। দুধ, চিনি এল। দিদিমার বারান্দায় উনুন ধরিয়ে তৈরী করে থালায় ঢেলে দিলেন। ঠাণ্ডা হতেই জমে গেল; কেটে কেটে সবাইকে খেতে দিলেন। সে এক নতুন খাবার তৈরী হল।

কাছারীঘরের উপরে ছোটপিসীর ঘর ছিল। দপ্তরখানা আর উত্তরদিকে কাছারীঘরের মাঝে দুপাশে দুটো কল ছিল। ঝিয়েরা সেখানে বাসন মাজা, কাপড় কাচা করত। ভারী জল তুলত। মাঝখানে একটা দরজা ছিল উঠানে যাবার। সেই উঠানে পাল্কী নামান হত। ঐ উঠানের বাঁদিকে রান্নাবাড়িতে যাবার ঘর, সিঁড়ি। ডানদিকে পর পর আমাদের চানের ঘর, কাপড় ছাড়ার

ঘর ছিল। দিদিমা ও মায়েরা সেইখানেই চান করতেন। আমরাও সেখানে চান করতুম, কারণ তখন দোতলা তিনতলায় ভারী জল তুলত। চানঘরের পাশ দিয়ে সিঁড়ি দোতলায় উঠে গেছে যেখানে বারান্দায় দিদিমা বসতেন। সেখান থেকে ব্রিজ ছিল রান্নাবাড়ির সঙ্গে যোগ রাখার জন্য। সেইখান থেকে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গিয়ে বাঁ-ধারে তরকারির ঘর। ডাইনে রান্নাবাড়ির মহলে যাবার রাস্তা। সামনে লম্বা ভাঁড়ার ঘর ছিল। দাসীরা রান্নাবাড়ির ঘরেই থাকত। নীচে ঐ চান ঘরের সামনের বারান্দায় একটা মস্ত বড় যাঁতা ছিল, গম পিসে আটা-ময়দা তৈরী হত। একজন হিন্দুস্থানী মেয়ে এসে গম ভাঙত। সেই আটার রুটি লুচি খাওয়া হত। বড় ভূমিকম্পের সময় ঐ সব ঘরে থাকা হয়েছিল।

যখন ভোরবেলা গুপীকাকা দুধ দোয়াতে যেত, দেখতুম সব ঘরের একজন করে দাসী আর দিদিমার একজন দাসী কেঁড়ে হাতে দাঁড়িয়ে আছে। যার যেমন দরকার সেইখান থেকে মেপে আনত। এসে যার যত দুধ মেপে দিত, শ্রীনাথ চাকর মস্ত বড় কড়ায় দুধ জ্বাল দিত। জ্বাল দেওয়া হলে তার আধসেরী মস্ত হাতায় করে দুধ মেপে দিত, দাসীরা যার যার ঘরে নিয়ে যেত। সেই দুধ খেয়ে আমরা বাগানে বেড়াতে যেতুম। বাবুর্চীখানায় গিয়ে টোস্ট-মাখন, না হয়ত জ্যাম বা ওমলেট দিয়ে রুটি খেতুম। গরমের সময় আম উঠলে দিশী আম হাতে করে একটু রগড়ে নিয়ে রস চুষে খেতুম। ভাতের সঙ্গে ছিল ঘন আমরস দুধ। আবার বিকেলে যে যত আম খেতেপারে—বোম্বাই, ল্যাংড়া, হিমসাগর। ভিয়েনের খাবারও থাকত, বাড়িতেই ভিয়েন স্নান হত। বাজারের খাবার খেতে দিতেন না, পাছে অসুখ হয়। বাবা কাকাদের জন্য দিদিমা আমরস করে দিতেন। দুধ ঘন করা থাকত। লাল রসগোল্লা আসত, ভাতের সঙ্গে দিদিমা খেতে ভালবাসতেন। আমিও দুধের সর দিয়ে লাল রসগোল্লা ভালবাসতুম বলে দিদিমা ঘনদুধের মচমচে সর আর রসগোল্লা নিয়ে তাঁর মোক্ষদা দাসীকে বলতেন, "যা, বুড়িকে দিয়ে আয়।" আমাকে বুড়ি বলে ডাকতেন। দিদিমা মারা যাবার পরেও মা আমার জন্য বাগবাজারের রসগোল্লা আনিয়ে রাখতেন। আমি শ্বশুরবাড়ি থেকে এলেই দিতেন।

দিদির শ্বশুরবাড়ি কাছে ছিল বলে দিদিমা খেতে বসে যা তরকারি দিদি খেতে ভালবাসত তুলে নিচুর মাকে বলতেন, "সুনীকে শ্বশুরবাড়ি গিয়ে খাইয়ে আয়।"

• দেউড়িতে একজন বৈরাগী আসত, খঞ্জনী বাজিয়ে গান করত। দরোয়ানদের কাছে চালডাল থাকত মুষ্টিভিক্ষা দেবার জন্য। কত লোক আসত ভিক্ষে নিতে, কিন্তু ঐ বৈরাগীর গান আমার ভাল লাগত বলে এখনও দু-লাইন মনে আছে :—

"ভেবে মবি কি সম্বন্ধ আজি তোমার সনে
তত্ত্ব তোমার না পাই বেদ পুরাণে।"

একজন কণ্ঠীগলায় পিওন আসত। সে আমাদেব এক এক কবে কোলে তুলে নাচত আর বলত, "বোল হরিবোল"। তাব হবিবোল বলা যেন কাজই ছিল। সে নিচুর মার দেশ বোলপুরের লোক ছিল। নিচুর মার সঙ্গে কত গল্প করত। শেষে চিঠি বিলি করে চলে যেত।

(১৬)

দিদিমার মুখে শোনা, আমাব বডদাদা গেহেন্দ্রনাথ ঠাকুর বাডিব প্রথম ছেলে, যখন জন্মায় মায়ের বযস তখন মাত্র এগাব বছব। প্রসবের সময সকলে খুব ভয় পেয়ে যান। বাবার বড়পিসী বাঙালী দাইয়ের উপব নির্ভর কবতে রাজী হলেন না। তখন একজন মেমকে নিযে আসা হয়। তার নাম স্থলতানা। তার হাতেই বাডিব সব ছেলেমেযেই জন্মেছে। এমন কি আমাদের ছেলেমেয়েরাও তার হাতে হয়েছিল। বয়স হয়ে গেলে সে আর তিনতলায় সিঁডি বেয়ে উঠতে পারত না, ইন্‌ভ্যালিড্‌ চেয়ারে করে তোলা হত। সে এসে তখন বসে থাকত, বাঙালী নার্স সৌদামিনী কাজ কবত। তার উপর এত বিশ্বাস ছিল। তার মৃত্যুর পর থেকে বাঙালী দাই-ই কাজ করেছে।

মহেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীও তেমনি পারিবারিক চিকিৎসক ছিলেন। তাঁকে ছাডা বাড়ির সকলে অন্য কাউকে বিশ্বাস কবতে পারতেন না। তিনি যা বলতেন তাই হত। তিনি মারা যাবার পরে সুশীল চ্যাটার্জী আসেন। বডদাদার জন্মের সময় পুরনো ডাক্তার ছিলেন নীলমাধববাবু। দিদিমা হোমিওপ্যাথি ওষুধে বিশ্বাস করতেন বলে ডি, এন, রায় ডাক্তার আসতেন। তাঁর পরে এসেছিলেন ডাক্তার ডি, এন, চ্যাটার্জী (হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জামাই)।

দিদিমার কিষণ বেয়ারা দুপুরে ও সন্ধ্যের সময় পাখা টানত। তখন

ইলেকৃট্রিক ফ্যান ছিল না। রাত্রে আর একজন ঠিকে বেয়ারা আসত, একতলার সিঁড়ির নীচে বসে পাখা টানত। সিঁড়ি ছেঁদা করে দড়ি তিনতলা থেকে একতলায় নামান ছিল। দোতলায় উঠতে সিঁড়ির মাঝে একটা রেলিং দেওয়া ফটক ছিল। রাত্রে সেখানে তালা লাগিয়ে দেওয়া হত। নীচে দরোয়ান থাকত। দিদিমার ঘরে ঐভাবে রাত্রে পাখা টানা হত।

বাবার ঘরেও ঐভাবে দক্ষিণের বারান্দায় লোক বসে পাখা টানত। বাবার শোবার ঘর ছিল তিনতলায়, হলের পুবদিকে ইদানীং সেখানে কনকদাদা থাকত। পশ্চিমদিকে সিঁড়ি দিয়ে উঠে দু-পাশে দুটো পাথরের ঘর ছিল। উত্তরদিকের ঘরে দিদিমা শুতেন। দক্ষিণদিকের ঘর খালি থাকত। যখন বড়পিসী আসতেন, ঐ ঘরেই থাকতেন। ইদানীং নেলীদিদি ও করুণাদিদি ঐ ঘরে শুত। ঐ ঘরের নীচের বারান্দা থেকে তিন ধাপ কাঠের মইসিঁড়ি ছিল। সেই সিঁড়ি বেয়ে উঠে সরু গলির ডানদিকে একটা বাথরুম ছিল। বাঁ দিক দিয়ে গিয়ে ছোটকাকার দুখানা ঘর। তার পিছনে দু-খানা ঘরে মেজকাকা থাকতেন। ঘরের দক্ষিণ দিকে সার্সিপাল্লার বারান্দা ছিল। তারপরে আর একটা ছোট ঘর ছিল, সেখানে মেজকাকার ছেলেমেয়েরা কাপড় বদলাত। সেখান থেকে চিৎপুর রোড দেখা যেত। আমরা সেই জানলায় দাঁড়িয়ে পরেশনাথ ঠাকুরের প্রোসেশন দেখতুম। সেদিন ঘোড়ার ট্রাম উঠে গিয়ে প্রথম ইলেকৃট্রিক ট্রাম চালু হল. বিনা টিকিটে চড়াবে বলে বাড়ির লোকজন সবাই চড়তে গেল। কিন্তু ছোট বলে আমাদের যাবার উপায় ছিল না, ঐ জানলা দিয়েই আমরা ট্রাম দেখেছি। উত্তরদিকে একটা রেলিং দেওয়া সরু বারান্দা ছিল। পড়ে যাবার ভয়ে তার চারদিকে জাল দিয়ে ঘেরা ছিল। কালীপুজোর সময় সেখান থেকে দেখতুম গিরীশ রায়ের বাড়ি থেকে নানারকম আলোর মালা দিয়ে মস্ত বড় ফানুস ওড়াত। মই বেয়ে ছাদে উঠে তবে ধরা দিত। সেই তখন আমাদের পাড়ায় নাম-করা ফানুস, অনেকেই তাই দেখতে আসত। ঐ ফানুস ছাড়তে ছাড়তে রাত দশটা বেজে যেত। তাই দেখবার জন্য আমরা জেগে দাঁড়িয়ে থাকতুম। চারিদিকে আকাশ-প্রদীপ জ্বলত, বাজি পুড়ত, দেখতে কি ভাল লাগত। আমাদের বাগানেও বাজি পোড়ান হত। সারা বাড়িতে আলো দেওয়া হত। দিদির ননদের মেয়ে সুষমা সদুদাসীর হাত ধরে আমাদের বাড়িতে বাজি দেখতে আসত। তিন বছরের ফুটফুটে সুন্দর মেয়ে। তার সঙ্গে মেজদাদা কনকেন্দ্রনাথের বিয়ের ঠিক হয়েছিল।

আগে বাজারের খবরও জানতুম না। দিদিমা একটা ক্যাশবাক্স নিয়ে বসতেন। তার ভিতর পুঁতির গেঁজেতে কত পয়সা ভাঙান থাকত। বোধহয় ছোটপিসী গেঁজেটা হাতে বুনে তাঁকে দিয়েছিলেন। ছোটপিসীকে পুঁতিবোনার কাজ করতে দেখেছি।

মাসের প্রথমে জ্যোতিকাকা এসে অনেক টাকা পয়সা ভাঙিয়ে দিয়ে যেত। দিদিমা মাছ-তরকারির জন্য গুণে গুণে পয়সা দিতেন। আমরা মনে করতুম, "না জানি কত টাকাই দেন। বাড়িতে অত লোক, বাজার আসে বড় ধামায়, তিরিশ চল্লিশ টাকা হবে বোধ হয়!" পরে মায়ের কাছে শুনি যে, তা নয়, মাত্র পাঁচ টাকার বাজার আসে। দিদিমা হিসেব রাখতে পারতেন না বলে ভাগে ভাগে গুণে দিতেন। গুপীকাকা ও জ্যোতিকাকা বাজার এনে ফর্দ করে দপ্তরখানায় দিত। মাত্র পাঁচ টাকায় অত বাজার আমরা এখন ধারণাও করতে পারি না। তখন পয়সার অভাব কি জানতুম না। এমনি করেই দিন কেটেছে। তার মাঝে মাঝে আবার শোকের ছায়া পড়েছে।

ছোটপিসী যখন জোড়াসাঁকোয় ছিলেন, ছোটপিসেমশায় দশটার সময় খেয়েদেয়ে অফিসে বেরিয়ে গেলে তাঁর ঘরে আমাদের ছোটদের আড্ডা বসত। বড়দিদি বীণাপাণি সবার বড় ছিল। তাই আমাদের সঙ্গে ঠিক মিশত না। চব্বিশ ঘণ্টা বেড়াল- কাঁধে আর মুখে বই দিয়ে বসে থাকত। হরিদাসকে পালন করেছিল এক হিন্দুস্থানী দাই, মুখে বসন্তের দাগ, খুব গল্প করতে পারত। তার কাছে আমরা গল্প শুনতে বসতুম। তার একটা বাড়ি ছিল সিঙ্গীবাগানে। সে মাঝে মাঝে চলে যেত, আবার আসত। অনুজাদিদির কাছে আর একজন জানকী নামে হিন্দুস্থানী দাসী ছিল। সেও এসে গল্পে যোগ দিত। অনুজাদিদির পায়ে এগ্‌জিমা ছিল, ভুলিয়ে-ভালিয়ে ওষুধ দিত। ছোটপিসীর একজন 'কেষ্ট' বলে দাসী ছিল। তার কাল দশাসই চেহারা ছিল। সে মাঝে মাঝে এসে তাগাদা দিত, "এবার ওঠ, চান করবে, খাবে চল। গল্প বন্ধ কর।"

এগারটার সময় ছোটদের খাওয়া হত। খাওয়া শেষ হলে তাদের (চাকরদাসীদের) ছুটি হবে।

(১৭)

ছোটপিসীর বড়মেয়ে বীণাপাণি (বড়দিদি) ডিপ্‌থিরিয়া হয়ে মারা যায়। বাবা তাকে একটা কাবুলী বেড়াল এনে দিয়েছিলেন। বড়দিদি দিনরাত

তাকে কাঁধে করে করে নিয়ে বেড়াত। ডাক্তারে বলে ওই বেড়ালের লোম থেকেই ডিপথিরিয়া হয়েছে। অনেক চেষ্টা করেও বাঁচান গেল না। বড়দিদি মারা যেতে বেড়ালটা কেঁদে কেঁদে বেড়াত। কিন্তু বেড়ালটা অনেকদিন বেঁচেছিল।

কিছুদিন পরে কলকাতায় খুব প্লেগের হুড়ো চলে। সকলেই ভয়ে ভয়ে থাকত। যার হত সে আর বাঁচত না। সিঙ্গীবাগানের বস্তি থেকে অনবরত মড়া যাচ্ছে। তখন বড় বড় ইঁদুর দেখলেই জমাদারেরা মারছে। ব্লিচিং পাউডার ছড়ান হচ্ছে চারিদিকে। প্লেগের তখনও কোনও ওষুধ বের হয়নি। সেইসময় একদিন ছোটকাকার ছোট মেয়ে তপসীর হঠাৎ জ্বর হয়ে পা ফুলে ওঠে। সে আমারই বয়সী ছিল। ডাক্তারবাবু তাকে দেখে বলে গেলেন, "এ ঘরে কেউ যেন না আসে। ছোট ছেলেমেয়েদের অন্য কোথাও সরিয়ে দিন।"

তখন তাড়াতাড়ি কোথায় সরাবেন, রবিদাদার লালবাড়িতে আমাদের সকলকে পাঠিয়ে দিলেন। আমাদের খাবারদাবার সেখানেই দিয়ে আসত। মায়েরা চান করে তবে আমাদের কাছে যেতেন। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তপসী মারা যায়। মারা যাবার পর আমাদের সব ছোট ছেলেমেয়েদের, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বাগানবাড়ী 'তটিনী কুটীর' পাঠিয়ে দিলেন। তাঁরই একটা ঘোড়ায় টানা মস্ত বড় বাস ছিল। তিনি সেটা পাঠিয়ে দিলেন। তার মধ্যে আমাদের ছেলেমেয়েদের, পুরে দাসী, চাকর, দরোয়ানেরা সঙ্গে চলে গেল। মা-কাকীমা. বাবা-কাকারা, দিদিমা পরে গেলেন।

নতুন জায়গায় এসে আমাদের ভালই লাগছে, হুটোপুটি বে.ড় গেছে। কিন্তু মনের মধ্যে কি রকম একটা অস্বস্তি হচ্ছিল। কারণ তপসীর কি হল সে খবর আমাদের জানতে দেননি। সব দাসী চাকরেরাই আমাদের দেখাশোনা করছিল।

দুটো বাড়ি ছিল পাশাপাশি। একটা বাড়িতে ধরবে না বলে দুটোতেই ভাগাভাগি করে থাকা হত। পাশাপাশি বাগান—মহারাজার ও তাঁর জামাইয়ের (পুণ্ডরীকাক্ষ মুখোপাধ্যায়); বেশ সুন্দরভাবে সাজান ছিল। একদিন ছেলেমেয়েদের মধ্যে কার হাত লেগে একটা পোর্সিলেনের পুতুল পড়ে ভেঙে যায়। দিদিমা পুণ্ডরীক বাবুকে ডেকে বললেন, "ছেলেরা একটা পুতুল ভেঙে ফেলেছে। তুমি কিছু মনে কোর না, আমি আনিয়ে দেব।" তখন তিনি বললেন, "সে কি কথা! একটা পুতুল ভেঙে গেছে বলে

আপনি আনিয়ে দিলে আমি দুঃখিত হব। যদি আমার ছেলেরা ভাঙত কি করতুম ?”

সেখানে কতদিন থাকা হয় ঠিক মনে নেই। চৌরঙ্গীর দিকে এক বুড়ী মেমের বাড়ি ভাড়া করে সবাই মিলে সেখানে উঠে যাওয়া হল। এক কম্পাউণ্ডের মধ্যে দুটো বাড়ি, তারের বেড়া দিয়ে আলাদা করা। ছোট বাড়িটাতে সে নিজে থাকত, বড়টা আমাদের ভাড়া দিয়েছিল। বুড়ী আসত দিদিমার কাছে, ভাঙা ভাঙা বাংলায় কথা বলত। দিদিমা তাকে খাবার পাঠাতেন, সে খুব খুশী হত।

চৌরঙ্গীতে থাকতেই বড়দাদা, কনকদাদা ও ন্যাডাদাদার পৈতে হয়। বাড়িতে এসে পৈতে দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। বাড়িতে বিপদ্ হয়েছিল বলে পৈতের সময় ধুমধাম কিছু হয়নি। সেইসময় বাড়ি মেরামত হতে থাকে। একদিন বাবা বাড়ি দেখতে আসেন। বিকেল বেলায় আমায় বললেন, “বেড়াতে যাবি আয়।” আমিও সঙ্গে আসি। বাড়িতে যাবেন আগে বলেননি। গিয়ে দেখি চারিদিক ভাঙা। গাড়ি থেকে নেমে বাবা বললেন, যাও, উপরে উঠে যাও।” আমি উঠতে গিয়ে দেখি দুপাশে সিঁড়ি, আছে, মাঝখানে নেই আমি বাবাকে বললুম, “কই, কোথা দিয়ে উঠব ?”

বাবা বললেন, “কেন, ঐ তো !”

দেখি দু-পাশ থেকে সিঁড়ি উঠে ল্যাণ্ডিং, আর উপর দিক খালি। তাই দেখে আমি পালিয়ে আসি, সে কথা খুব মনে আছে। বাবার ঐ রকম মজা করা অভ্যেস ছিল।

সেখান থেকে ফিরে গেলে দিদিমা বাবাকে জিজ্ঞেস করলেন, “বাড়ি মেরামত কতদূর হল ?” বাবা বললেন, “বুড়ীকে জিজ্ঞেস করুন।” আমি বললুম, “আধখানা হয়েছে, সব ভাঙা”। সেকথা শুনে দিদিমা বললেন, “তবে কি করে যাব ? পৈতে কোথায় হবে ?” বাবা জানালেন, “ভিতরের সিঁড়ি আছে, ঠাকুর ঘরের দিকে যেতে পারবেন। পৈতে হলেই চলে আসবেন। আর যা করবার এখানেই হবে।” সেবার পুরনো সিঁড়ি বদলে নতুন সিঁড়ি হল। উপরে থামের মাথায় বাটাস্সির কাজ করা পুতুল, হাতে আলো ধরে আছে। সেইবারেই বাইরের সিঁড়িতে বিলিয়ার্ড ঘর ও লাইব্রেরী ঘরে ইলেকট্রিক আলো হয়।

সেই থেকে প্লেগের সময় হলেই চৌরঙ্গীর দিকে বাড়ি ভাড়া করে চলে যাওয়া হত। তার পরের বছর লাউডান ষ্ট্রীটের একটা বাড়ি ভাড়া নেওয়া হয়। বাড়িটা ছিল তিনতলা। সেই বছর (১৩০৯ সাল) আমার ছোট বোন হাসি (সুজাতা) জন্মায়। আমার তখন আটবছর বয়স। ভাদ্রমাসের ভোরে শুনলুম বোন হয়েছে। সুরাজ বলে দাসী ছিল, নবুকে মানুষ করেছিল, সেই পরে হাসিকেও মানুষ করে। নবুর কাছে তখন কালিপদ নামে একজন চাকর আসে। আমি তখন বেশ বড় হয়েছি, হাসিকে নিয়ে থাকতুম। সুরাজ কাজে যেত। ও বোতলে দুধ খেত, বড় হয়েও বোতল ছাড়েনি। আড়াই বছরের মেয়ে, তখনও বোতলে দুধ খাচ্ছে। বোতল হাতে ধরিয়ে দিলে নিজেই ধরে খেত। খুব শান্ত ছিল। বোতল ছাড়া ওর আর কোন উৎপাত ছিল না। নবু একটু দুষ্টু ছিল বলে তাকে মারতে হত। তাছাড়া আর কোন ছোট ভাইবোনদের সঙ্গে ঝগড়া মারামারি হয়েছে বলে আমার মনে পড়ে না। দাদারা আমার চেয়ে আট-ন বছরের বড় ছিল, আর নবু হাসি তেমনি আট-ন বছরের ছোট ছিল। দিদিতে আমাতে দু বছরের ছোটবড় ছিলুম। দিদিকে ছেড়ে থাকতে পারতুম না। দিদির বিয়ে হয়ে যেতে একলা হয়ে পড়েছিলুম। দুজনে এক খাটে শুতুম বলে শোবার সময় বিছানা খালি মনে হত। বড়দাদা মারা যাবার পর বৌঠান আমার কাছে শুত। লাউডান ষ্ট্রীটে গিয়ে ফাল্গুন মাসে ছোটপিসীর মেজছেলে মনোমোহন চট্টোপাধ্যায় জন্মায়।

সেখানে লেমনেড সোডা বাঁকে করে এসে সেই ঝুড়িসমেত ভাঁড়ারে থাকত। বাড়িতে সে সব দপ্তরখানায় বাক্সের ভিতর থাকত। গরমের সময় বিকেলে বাগানে বেড়াতে দপ্তরখানায় লেমনেড, বরফ খেতুম। বড় বরফের চাঁই কাপড়ের খুঁটে পুরে পিটিয়ে ভাঙতুম, কাপড় যেত ছিঁড়ে। মা বকতেন, বলতেন, "সুনীকে যেমন সাজিয়ে দিই তেমনি থাকে, আর এ মেয়ে নতুন কাপড়-চোপড় ছিঁড়ে, গয়না দিলে ভেঙে আনবে।" আমি শাড়ি পরতে চাইতুম না, বলতুম, "খেলতে পারি না, ছিঁড়ে যায়, কি করব!" মা দিদিমা বলতেন, "দু-দিন বাদে বিয়ে হবে, ন-বছর বয়স হল, শাড়ি পরতে চাইবে না?" শেমিজ, জ্যাকেট তৈরী হল, শাড়ি এল। ভিতরে থাকতুম যখন পরতুম, কিন্তু বাগানে খেলতে যাবার সময় কিছুতেই পরতে চাইতুম না, কাঁদতে বসতুম,

.কারণ শাড়ি পরে খেলতে অসুবিধে হয়, ছুটোছুটি করতে পারি না। বাবা বলতেন, "কেন ওকে শাড়ি দাও? পরতে পারে না, বাঁধে।" বাধ্য হয়ে ফ্রক দিতে হত। বাগানে গিয়ে সি-স-তে লাফান হত।

লাউডান স্ট্রীটের বাড়িতে একদিন বিকেলে মেজকাকী ভাঁড়ার দিচ্ছিলেন। আমরা গিয়ে তাঁর কাছে লেমনেড খেতে চাই। তিনি তাই শুনে বললেন, "দাঁড়াও একটু, দিচ্ছি।" কিন্তু বড়পুটি তাড়াতাড়ি করে যেই লেমনেডের শিশি ঝুড়ি থেকে টেনে নিতে গেছে, টানাটানিতে একটা বোতল আর একটার উপর পড়ে গিয়ে ফেটে যায়। তখনকার দিনে লেমনেডের বোতলের মুখ কাঁচের গুলি দিয়ে বন্ধ করা থাকত। বোতল ফেটে সেই গুলি ছুটে এসে বড়পুটির হাতের ভিতর ঢুকে যায়। তখন ডাক্তার এম, এন, ব্যানার্জীর ডাক পড়ল। তিনি এসে অপারেশন করে সেই গুলি বের করে হাতে ব্যাণ্ডেজ করে দিয়ে গেলেন। বলে গেলেন যে, "খুব বেঁচে গেছে।" সেই হাত নিয়ে অনেক ভুগেছিল। সেই থেকে আমাদের লেমনেড সোডায় হাত দেওয়া বন্ধ হয়ে যায়। আমাদেরও ভয় হয়ে গিয়েছিল। আমাদের জন্য বাবা-মায়েদেরও অনেক উৎপাত সহ্য করতে হত।

একদিন বিকেলে মেজকাকার মেয়ে ছোটপুটি দিদিমার ছাদে তক্তা থেকে লাফাতে গিয়ে পড়ে যায়। তক্তার পাশে একটা স্ক্রু বেরিয়ে ছিল, তার উপুর পড়ে যেতে ভ্রূ-র ভিতর সেটা ঢুকে কেটে যায়। ঝরঝর করে রক্ত পড়তে লাগল। রক্ত বন্ধ হয় না দেখে ডাক্তার মহেন্দ্রবাবুকে খবর দেওয়া হল। তিনি এসে সেলাই করে দিলেন। এইরকম উৎপাত মাঝে মাঝে লেগেই থাকত। বাড়িতে অত ছেলেমেয়ে, কত সামলাবেন! ছোটপিসীর ছেলে হরিদাস কি রকম পা বেঁকিয়ে চলত। প্রায়ই পড়ে গিয়ে মাথা ফাটত। বাইরের সিঁড়ি যখন বদলান হয়নি, পুরনো সিঁড়ি ছিল, সিঁড়ির ল্যাণ্ডিং-এর দুধারে দুটো বড় পোর্সিলেনের সারস ছিল, একটার ঠোঁটে সাপ জড়ান, আর একটা ব্যাঙ গিলছে। তার উপরে পড়ে একদিন হরিদাসের মাথায় কেটে গেল। তখন সবাই মিলে লুকোচুরি খেলা হচ্ছিল। খুব বেশী কাটেনি, বরফ দিতেই রক্ত বন্ধ হয়ে যায়। এক একটা ঘটনা মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির আগেকার চেহারাও মনে পড়ে যায়। ইদানীং অনেক বদল হয়ে গিয়েছিল।

হাসি তখন তিন-চার বছরের হবে। বাবা রাত্রে যখন খেতে বসতেন, আমারও তাঁর সঙ্গে খেতে যেতুম। বাবুর্চিখানার ভালমন্দ বিলিতি খাবার

যা থাকত আমাদেরও একটু আধটু দিতেন। হাসিও সেদিন আমার সঙ্গে বসে আছে। তখনও বাবার খাবার দেওয়া হয়নি, বাবা কি বই দেখছিলেন। এমন সময় ও আমাকে বলছে, "দেখ মেজদিদি, আমার নাকে বোতাম ঢুকে গেছে।" আমি তাকে ধমক দিয়ে বলছি "যাঃ, বাজে কথা বলছিস্। চুপ করে বোস্।" ও ততই বলছে, "না, তুমি দেখ, নাকের ভিতর আছে।" আমি ওর মুখ তুলে ধরে দেখি সত্যিই নাকের মধ্যে একটা বোতাম আছে। তখন বাবাকে বললুম, "বাবা দেখ, হাসি নাকের ভিতরে বোতাম পুরে দিয়েছে।" বাবা ত ব্যস্ত হয়ে পড়লেন, "আঃ, জ্বালালে দেখছি। এদিকে আয়, দেখি।" নাকে কাঠি দিয়ে হাঁচিয়ে দিতেই বেরিয়ে গেল। বাবা বললেন, "আর দিবি ?" তখন ও ভয় পেয়ে গেছে। ভাল মানুষ ছিল। আস্তে আস্তে বললে, "না আর দেব না।"

(১৯)

দিদিমার কাছে নানা লোকের আসাযাওয়া চলত। মাঝে মাঝে বেনেপুকুরের দাদা যজ্ঞেশপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় আসতেন। আমার এক মাসীর সঙ্গে যজ্ঞেশপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়ের পৌত্র যামিনী দাদার (যামিনী প্রকাশ) বিয়ে হয়েছিল। তিনিও আসতেন মায়ের সঙ্গে দেখা করতে। বেনেপুকুরের দাদার সঙ্গে দিদিমার কথা থাকলে বাবা-কাকারা তিন ভাইও সেখানে থাকতেন— আমাদের বলতেন, "তোরা এখন খেলা করগে।" আমরা অন্য ঘরে চলে যেতুম।

বাবার বড়পিসীর দুই ছেলে বড় জ্যাঠা জ্যোতিঃ প্রকাশ, সেজজ্যাঠা ইন্দু প্রকাশও আসতেন। বাবার ছোটপিসীর ছেলে মেজজ্যাঠা নীরদ মুখোপাধ্যায় খুব কম আসতেন। তিনি একটু সন্ন্যাসী গোছের ছিলেন।

মাঝে মাঝে জোড়াসাঁকোর কর্তামা (ত্রিপুরাসুন্দরী দেবী) আসতেন। তিনি ছিলেন দ্বারকনাথ ঠাকুরের ছোট ছেলে নগেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী। তাঁর কোনও ছেলেমেয়ে হয়নি। তাঁর গল্প শুনতে খুব ভাল লাগত। তিনি বলতেন, "জানিস্, নগেন্দ্রনাথ ঠাকুর বিলেতে গিয়ে মেম রেখেছিলেন। দেশে আসতে চাইতেন না। তখন শাশুড়ী বেঁচে ছিলেন না। তাই আমার বড় জা (দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী সারদা দেবী) ঠিক করলেন, দেওর বখে যাচ্ছে, তার বিয়ে দেওয়া দরকার। তাই যশোরের একটি মেয়ে, মানে আমাকে, বউ ঠিক

করলেন। আমার তখন সাত বছর বয়স। সে কি সুন্দর সুপুরুষ ছিল! সাহেবের মত চেহারা। সে কিনা আমাকে পছন্দ করবে। জাত সোহাগ করে বিয়ে দিলেন। সে কিন্তু আমার দিকে চেয়েও দেখত না। আমি ত দেখতে ভাল ছিলুম না।"

আমাদেরই তাঁকে দেখে ভয় করত। রঙ ময়লা, চাকা পানা মুখ, এই বড় বড় চোখ, যেন ঠেলে বেরিয়ে আসছে, তেমনি গলার আওয়াজ। দিদিমা তাঁকে 'ছোঠকাকীমা' বলে ডাকতেন। বাবা কাকারা 'ছোড়দিদিমা' বলতেন। তাঁর মুখের কোন আটক ছিল না। ছেলে বৌ মানতেন না, সকলের সামনে সব কথা বলতেন।

আমার সেজভাই নবু ওঁকে দেখলেই ভয় পেত, পালিয়ে আসত। একদিন, দিদির তখন বিয়ে হয়ে গেছে, মায়ের কাছে রাত্রে শুতে গিয়ে—আমিও সেখানে ছিলুম—ও মাকে বলছে, "মা যাঁকে কর্তামা বলি উনি কে? ওঁকে দেখলে আমার বিলেতের কথা মনে পড়ে।"

মা ও শুনে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি আবার বিলেত গেলে কবে?"

তখন ও বলতে থাকে, "আমার একটা ছোট বাড়ি ছিল। সামনের দরজায় নীল পর্দা ঝুলত। আমার সুন্দর এক মেম ছিল।"

আরও কত কি বলেছিল মনে নেই। সেই কথা শুনে কর্তারা বলতেন, ও নিশ্চয় নগেন্দ্রনাথ ঠাকুর ফিরে এসেছেন, মায়া ছাড়তে পারেন নি। তাঁর অভ্যেস ছিল 'ওলো' বলে কথা বলা। বাবাকে ডেকে বললেন, "ওলো ও গগন, তোর ঐ ছেলে হয়ে ঠিক নগেন্দ্রনাথ এসেছে।"

বাবা বললেন, "তিনি কতদিন হল মারা গেছেন। এতদিন বাদে কি করে আসবেন?"

তখন বললেন "তা না-হলে ও কি করে ঐ সব কথা জানবে?

তখন ওর বয়স তিন বছর হবে। তিনি যতদিন বেঁচেছিলেন নবুকে 'নগেন্দ্রনাথ' বলে ডাকতেন। নবু একটু বড় হতে সব ভুলে গিয়েছিল। জিজ্ঞেস করলে বলে, "কৈ, আমি ত কিছু বলিনি।" দিদিমা বললেন, "তবে তুই ওঁকে দেখে পালিয়ে যাস্ কেন?" ও বলে, "ওঁর চোখ দেখলে ভয় করত।"

কর্তামার একটু সন্দেহ বাতিক ছিল। অল্প বয়সে বিধবা হয়েছিলেন বলে তাঁর কোন বাছবিচার ছিল না। কোন বাধা মানতেন না, নিন্দের ধার

ধারতেন না। খুব সরল প্রকৃতির লোক ছিলেন, ঠিক ছেলে মানুষের মত। যেখানেই যেতেন সকলকার সঙ্গে এক পংক্তিতে বসে খেতেন। কিন্তু পাশে একজনকে নিয়ে তবে খেতে বসতেন। সে চেখে দিলে তবে খেতেন, পাছে কেউ খাবারে বিষ মিশিয়ে মেরে ফেলে! দ্বারকানাথ ঠাকুরের বিষয়ের অংশীদার বলে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়ির উপরেই সন্দেহ ছিল বেশী। ওখানে ত যেতেনই না। আমাদের বাড়িও পাশেই বলে সেখানে আসতেন, কিন্তু খেতে চাইতেন না। বাবাও ছাড়বার পাত্র ছিলেন না। বাবা বলতেন, "আপনার জন্য এত আয়োজন হয়েছে, আর ,আপনিই খাবেন না, তা কি হতে পারে? আপনাকে খেতেই হবে। না হলে আমরা আপনার বাড়িতে যাব না, আর গেলেও খাব না।"

· বাবাকে একটু বিশ্বাস করতেন. ভালও বাসতেন, তাই বাবার কথা ঠেলতে পারতেন না। তাঁর অভ্যাস ছিল 'ওলো' বলে কথা বলা। মাকে ডেকে বলতেন. "ওলো ও নাত-বৌ শোন্ গগন কি বলছে। আমার বাড়িতে নাকি আর যাবে না।"

মা বলতেন, "ঠিক কথাই ত বলেছেন। আপনি এখানে না খেলে, আমরাই বা আপনার বাড় গিয়ে খাই কি করে বলুন।"

তখন তিনি বলতেন, "ওলো ও গগন, তা বেশ তুই যখন বলছিস্ তখন খাব। কিন্তু একজন চেখে দিলে তবে খাব।"

বাবা মাকে বলতেন, "যাও ওর পাশে বসে চেখে দাও।" কিন্তু আড়ালে শিখিয়ে দিতেন টাকা চাইতে। তিনি একটু কৃপণ ছিলেন টাকা সহজে বের করতে চাইতেন না।

, মা বলতেন, "ছোড় দিদিমা, আগে টাকা না দিলে কি করে চাখব? আমারও ত প্রাণের ভয় আছে। আমি যদি মরে যাই, তখন কি হবে? আপনি ত টাকা দেব বলে আর দেন না।

দিদিমা জিজ্ঞেস করতেন, "ও কাকীমা, বৌমা কি বলছে?"

তিনি বলতেন, "ও আমাদের গোপন কথা। তুমি শুনে কি করবে? ও নাত-বৌ চল্ যাই খেতে।"

খেতে গিয়ে মাকে বলতেন, "কত টাক চাস্ বল্, দেব। আমার কি টাকার অভাব আছে?"

বাবা মাকে ইশারায় বলে দিতেন, "একশ টাকা চাও।"

মা বলতেন, "একশ টাকা না দিলে কি চাখা যায়?" তিনি শুনে বলতেন, "না ভাই, অত টাকা আমার হাতে নেই। এই আক্রাগণ্ডার বাজার। দশ টাকার বেশী দিতে পারব না।"

ছোটকাকা পাশ থেকে বলতেন, "বৌঠান একশ টাকার কমে রাজী হবে না। আমাকে পঞ্চাশ টাকা দিন, চেখে দেব।"

মা বলতেন, "আপনি দ্বারকনাথ ঠাকুরের পুত্রবধূ, আপনার হাতে টাকা নেই কে বিশ্বাস করবে? আচ্ছা পঞ্চাশ টাকাই দিন আমাকে।"

তাই শুনে খুব খুশী হযে বলতেন, "আমার কি ভাই টাকার অভাব আছে? তবে কি জানিস্, তোর টাকা ব্যাঙ্কে থাকাও যা আমার কাছে থাকাও তাই।"

এমনি দর কষাকষির পর পঞ্চাশ টাকায় রফা হত।

দিদিমা তখন বলতেন, "কোলের কাছে খাবার পড়ে ঠাণ্ডা হযে গেল যে কাকীমা, খাবেন কখন?"

তখন বাড়িশুদ্ধ লোক হো হো করে হেসে উঠত। আমাদেরও বড়দের ছেলেমানুষী দেখতে বেশ মজা লাগত। সেই টাকা আর জীবনে আদায় হত না। বাবা-কাকারা, রবিদাদা সকলে মিলে পুজোর পরে বিজয়ার প্রণাম করতে গিযে ধরে পড়ে একশ টাকা করে 'পার্বণী' আদায় করে আনতেন। লোহার সিন্দুকে বড় বড় চাবি তাঁর আঁচলেই বাঁধা থাকত কারও হাতে দিয়ে বিশ্বাস হত না। কিন্তু এদিকে কত লোক এক টাকার জিনিষের দাম চার টাকা নিত। নিজে বাজার দর জানতেন না বলে মনে করতেন, "ও কি আমাকে ঠকাবে। এখন সে রকম সহজ সরল লোক চোখে পড়ে না।

তাঁর অভিভাবক কেউ ছিল না বলে পাছে কেউ তাঁর সম্পত্তি ঠকিযে নেয়, তাই সম্পত্তি ভাগ করার সময় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁকে জমিদারীর অংশ না দিয়ে দু-খানা বাড়ি দেন। তাছাড়া তিনি হাজার টাকা করে মাসহারা পেতেন। নিকৃদেপাড়ায় একটা বাড়ি ছিল, সেটা ভাড়া দিযেছিলেন। আর জোড়াগীর্জার কাছে সার্কুলার রোডের উপর একটা বাড়িতে তিনি নিজে থাকতেন। তাঁর অসুখ করলে ওষুধ পর্যন্ত চেখে দিতে হত। সে সব করবে কে? তাই তাঁর ভাইদের কাছে রেখেছিলেন, দেখাশুনা করত। ছোটভাই বিভূতি মজুমদারের স্ত্রী ছিলেন ওঁর খাবার এবং ওষুধ চেখে দেবার জন্য। বড়ভাই কেদারবাবুকে খুব ভালবাসতেন। সব কিছু তাঁরই ছেলেদের দিযে যান।

তখন ১১ই মাঘের সময় খুব ধুমধাম হত। আগের দিন থেকে বাড়ি সাজান হত। থামের গায়ে গোলাপ, গাঁদা ফুল, লতাপাতা দিয়ে জড়ান হত, দালানের ভিতরে, উঠানেও সাজান হত, খাটালে খাটালে বেললণ্ঠন, ঝাড় ঝুলত, দালানে বেদী সাজান হত। সেই বেদীতে বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রিয়নাথ শাস্ত্রী ইত্যাদি উপাসনা করতেন। উঠানে প্রতিভা পিসী হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বড় মেয়ে মনীষা পিসী, বিবি পিসী (সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মেয়ে ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী) নতুন দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবিদাদা ও অন্যান্য সকলেই উপস্থিত থাকতেন, গান হত। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে চৌকীতে করে নামিয়ে এনে নীচের বারান্দায় বসিয়ে দেওয়া হত, কারণ তিনি তখন চলাফেরা করতে পারতেন না। উঠানে সব নিমন্ত্রিতেরা বসত, কত লোকের আসা-যাওয়া! ভিয়েনের জলখাবার বাইরে লোকদের জন্য থাকত, চকোলেট, লজেন্স আরও কত কি, ফুটবলের মত বড় এক একটা মেঠাই হত। তার পরের দিন ঐ মেঠাই সব বাড়ি বাড়ি পাঠান হত। নিকট আত্মীয়েরা কিন্তু পাতা পেড়ে খেত। আমরাও বাদ যেতুম না। জ্যাঠাইমা হেমলতা দেবী, (দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বড় ছেলে দ্বীপেন্দ্র নাথের স্ত্রী) নদিদি (বীরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী প্রফুল্লময়ী দেবী) দাঁড়িয়ে থেকে সবাইকে খাওয়াতেন। আমরা সব বাগানের দিক দিয়ে যেতুম। মা-কাকীমারা, ছোটপিসী, বড়পিসী সবাই পাল্কী করে যেতেন। গলির মুখ থেকে দেউড়ী পর্যন্ত লাল শালু পাতা থাকত। রাত দশটা অবধি কত লোক আসত যেত। বাবা, দুই-কাকারা, তিনজনে সাদা ধুতি-চাদর-পরা, পায়ে কটকী না-হয় জাপানী চটি, এক সাজে এক সঙ্গে এ বাড়ি থেকে বের হতেন, বাবা আগে, কাকারা পিছনে পিছনে; দেখতে ভাল লাগত, যেতেন যখন অনেকেই লক্ষ্য করত।

১১ই মাঘের উৎসব থেকে ফিরে এসে দিদিমার কাছে সব গল্প বলতে হত; কে কি বলল, কি খাওয়া হল, কি গান হল, কে কে গাইল- সব কিছু খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করতেন। মাঘোৎসব হয়ে গেলে পরদিন সকালে আমাদের কাজ ছিল জ্যাঠামশায় সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছ থেকে ১১ই মাঘের কার্ড আদায় করা। তিনি বলতেন, "এত কার্ড নিয়ে তোরা কি করবি?" আমরা বলতুম, "কোন বছরে কি-রকম কার্ড হয়েছে তাই জমাব।" বেশী যা কার্ড থাকত

আমাদের দিয়ে দিতেন। আর চকলেট লজেন্স উপরে বারান্দা থেকে ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিতেন, বলতেন, "নীচে দাঁড়িয়ে লুফে নে।" থাম থেকে সব সাজান ফুল খুলে ফেলা হত। আমরা সেগুলো কুড়িয়ে নিয়ে আসতুম। বড় বড গাঁদা ফুল, গোলাপ। গোলাপফুল জলে ভিজিয়ে গোলাপ-জল তৈরী করতুম।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মারা যাবার পর থেকে ১১ই মাঘে আর সে-রকম ধুমধাম হত না, ক্রমশই কমে গেল।

১৩১১ সালের মাঘ মাস ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে কদিন ধরেই শোনা যেতে-লাগল যে কর্তার খুব শরীর খারাপ হয়েছে। প্রায় নব্বই বছর বয়স। বিশেষ কিছু উপসর্গ ত' হয়নি। এবার কি হয় বলা যায় না। তেতলার উপর ছাদের ঘরে তিনি থাকতেন। বাবা দেখে এসে দিদিমাকে বললেন, "কর্তার অবস্থা ভাল নয়। বড়পিসীমা (দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বড় মেয়ে সৌদামিনী দেবী) কাছে বসে খুব সেবা করছেন ও কাঁদছেন। প্রিয়নাথ শাস্ত্রী কাছে বসে আছে।" আর সব ছেলেমেয়ে যারা দূরে আছে সকলেই দেখতে আসছে। আমরা আমাদের বাড়ি থেকে দেখতে পাচ্ছি উপরের ঘরের সামনে লোক গিস্‌গিস্ করছে।

৬ তারিখ সকালে বাবা দেখে এসে বললেন, "বোধহয় আজ আর দিন কাটবে না। কখন কি হয় বলা যায় না।" দিদিমা শুনে মাকে এবং বামুনদের ডেকে বললেন যে, "কর্তার অবস্থা খুবই খারাপ শুনতে পাচ্ছি। তোমরা তৈরী হয়ে নাও। তাড়াতাড়ি রান্না সেরে ফেল। ছোট ছেলেদের আগে খাইয়ে দাও। তারপর বৌমাদের, বাবুদের খাওয়া হয়ে গেলে আমার খাবার দিয়ে দেবে।" পুরনো বামুনের নাম ছিল দীনু। তাকে বললেন, "তুমি ঝোল-ভাত ডাল কর। দেরী কোর না। তা না হলে সব নষ্ট হবে, কারও খাওয়া হবে না। তিনজন বামুন আছে, তাড়াতাড়ি নাও। হেড বামুন ছিল দীনু। দীনুর সহকারী ছিল দুর্গাদাস ও কেনারাম। দীনু মারা গেলে পরে মধুসূদন আসে।

আমাদের খাওয়াদাওয়া হয়ে গেলে ঘরের জানালায় দাঁড়িয়ে দেখতে ছুটলুম। তখন নীচের দোতলার বারান্দা ছিল না। বাবা কাকারা খেয়ে ওবাড়ি চলে গেলেন। দিদিমা সবে খাওয়া সেরে উঠেছেন এমন সময় খবর এল "মারা গেছেন।" তাঁর ছেলেমেয়েদেরই সকলের প্রায় পঞ্চাশ-ষাট বছর বয়স। সব মাথা সাদা, চোখে রুমাল দিয়ে কাঁদছেন। যখন তাঁকে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয় বাবা-কাকারা সঙ্গে গেলেন। দাদারাও বড় হয়েছিল, তারাও গেল।

দেবেন্দ্রনাথের (বুড়োবাবার) ছেলে জামাইদের মধ্যে যাঁরা বেঁচেছিলেন সকলেই সঙ্গে গেলেন। শুধু বড় জামাই সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় আর সেজছেলে হেমেন্দ্রনাথ জীবিত ছিলেন না। আর সকলেই উপস্থিত ছিলেন। তিনি সাদা ভালবাসতেন বলে সাদা খাট, সাদা জোড, সমস্ত সাদা ফুল দিয়ে সাজান হয়। সে এক চমৎকার দৃশ্য। তাঁর দাড়ি চুল সাদা, ছেলেদের মাথা সাদা। তার মধ্যে খালি প্রিয়নাথ শাস্ত্রী গেরুয়া পরা। সকলে খালিপায়ে, "ওঁ তৎসৎ ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলম্" বলতে বলতে চলেছেন। দাহকাজ শেষ করে সকলে যখন ফিরে এলেন তখন বাড়িতে আলো জ্বলেছে।

আগে দেখেছি বুড়োবাবা দেবেন্দ্রনাথ বেঁচে থাকতে তাঁকে সকাল সন্ধে ছাদে চাকরেরা চৌকী করে বসিয়ে দিত। কানে ভাল শুনতেন না, চোখেও ভাল দেখতেন না। কিন্তু সূর্যোদয়ের আগে ও সূর্যাস্তের সময় উপাসনা করতেন। প্রিয়নাথ শাস্ত্রী পাশে থেকে মন্ত্র পড়তেন। রবিদাদা ছাদে বসে এসরাজ বাজিয়ে গান করতেন। উপাসনার গান কি সুন্দর লাগত। আমাদের ছাদ থেকে দেখা যেত, গান শোনা যেত। শিশুগাছের পিছন থেকে সূর্যোদয়, পাখীর কাকলী সব মিলে কি এক সুন্দর আবহাওয়া সৃষ্টি করত। তখন আমাদের বয়স অল্প, অপরূপ লেগেছে। কিন্তু এখন সেই স্মৃতি আমাকে কোথায় নিয়ে যায় বোঝান যায় না। তাই বুঝি বাবাও ভোরবেলা সূর্যের দিকে চেয়ে বসে থাকতেন কেন। আমি একবার স্বপ্নে সেই দৃশ্য দেখেছিলুম। শিশুগাছের মাথা থেকে চাঁদের উদয়, তার নীচে সন্ধ্যাতারার মত জ্বলজ্বল করছে উজ্জ্বল আলো। দেখে এমন আনন্দ হল যে আমার মেজছেলে দিতিনাথকে ডেকে দেখাচ্ছি। দিতি যখন এল তখন মিলিয়ে গেছে। সে আনন্দের সঙ্গে এই জগতের কোন জিনিসের যেন তুলনা হয় না, এমনি মনে হয়েছিল। আমাদের অনেক পুণ্যের জোর যে ঐ রকম ভাগ্যবান পুরুষদের বংশে জন্ম নিয়েছি এবং তাঁদের সংস্পর্শে আসতে পেরেছি।

(২১)

যে বার বুড়োবাবা (দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর) মারা যান, তার আগের বছর বড়দাদার বিয়ে হয়।

বড়দাদার জন্ম হয় ৯ই চৈত্র ১২৯৪ সালে (২১শে মার্চ ১৮৮৮ খ্রীস্টাব্দ)। সতের বছর বয়সে মাঘ মাসে বড়দাদার বিয়ে হয়।

বিয়ের জন্য মেয়ে দেখা চলতে লাগল। কত মেয়ে এল, কাউকে পছন্দ হয় না, সবাই চলে যায়। একটি মেয়েকে পছন্দ হওয়ায় আশীর্বাদ করতে যাওয়ার ঠিক হল, এমন সময় কে এসে খবর দেয় ওই মেয়ের হাঁপানির অসুখ আছে। আর যাওয়া হল না। সেখানে সম্বন্ধ ভেঙে যাওয়ায় দিদিমার মন খুব খারাপ হয়ে গেল। তখন রামলালবাবু এসে দিদিমাকে, বললেন, "মা, আমাদের দেশের দুটি মেয়ে আছে, যদি দেখেন তা হলে আনাতে পারি। তবে তাদের বাবা বড় গরীব, কিছুই দিতে পারবে না। মেয়েদের বিয়ে দেবার ক্ষমতা তার নেই। যদি দয়া করেন গরীব বাপ বেঁচে যায়।"

দিদিমা বললেন, "আগে দেখি, তারপর সব হবে। যদি ছেলের পছন্দ হয়, আমাদেরও পছন্দ হয়, কিছুই আটকাবে না। তুমি যাও নিয়ে এস, যা খরচ হয় আমি দেব।"

তখন রামলালবাবু খবর দিয়ে মেয়ে দুটিকে সঙ্গে করে নিয়ে এলেন। তাদের সঙ্গে এলেন একজন লম্বা মত বিধবা মহিলা, বললেন, "আমি ওদের বাড়িতে থাকি, বামুনের মেয়ে।" তিনিই ওদের সব পরিচয় দেন। মেয়ে দুটি সাদাসিধে সাজেই এসেছিল। দিদিমার বারান্দায় আসন পেতে বসিয়ে শুদ্ধভাবে বামুনের মেয়েকে জলখাবার খেতে দেওয়া হল। পরে জানা গেল তিনিই ওদের বড়পিসী। মেয়েদের বাবা যখন এলেন, তখন দেখা গেল ভদ্রমহিলাকে ঠিক তাঁরই মত দেখতে।

দিদিমা, বাবা, মা সকলেই বড় মেয়েটিকেই পছন্দ করলেন। দিদিমা বললেন, "মুখ ত ভাল, কিন্তু রঙ একটু চাপা। ছোটটির রং ফর্সা, কিন্তু মুখ তেমন নয়। ছেলেকে দেখাও, যাকে পছন্দ করবে তার সঙ্গেই বিয়ে হবে।" বড়দাদাকে দেখান হল। দেখে বললে রঙ ময়লা হোক, বড়কেই পছন্দ। বড়র নাম মৃণালিনী, ছোটর নাম পঙ্কজিনী। ছোটর সঙ্গে পরে ছোট বাজার বাড়ির অবনী ঠাকুরের বিয়ে হয়েছিল।

সব খোঁজ খবর নেওয়া শুরু হল। জানা গেল মেয়ের বাবা ডাক্তার মহেন্দ্রবাবুর সম্বন্ধী। নবদ্বীপের বীরপুর গ্রামে বাড়ি। মেয়ে কলকাতাতেই থাকে, ইংরিজী জানেনা, মহাকালী পাঠশালায় পড়ে, হাতের লেখা ও অঙ্কে ভাল, বাংলাও পড়ে ভাল। পাঠশালায় তাদের শিবপূজো শেখান হয়, রান্না শেখান হয়। গরীবের মেয়ে বলে লজ্জা-শরম আছে।

বাবা মহেন্দ্রবাবুকে ডাকিয়ে মেয়ের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে খোঁজ খবর নিলেন।

তাঁর শালার মেয়ে যখন তিনি ভুল খবর দেবেন না। ভালই বললেন। তিনি ছেলেকেও জানতেন, ছোটবেলা থেকে দেখেছেন। তিনি মাঝে থেকে সব কথা পাকা করলেন। বৌঠানের বাবাও সঙ্গে এলেন। যখন সব ঠিক হয়ে গেল তখন বাবা মহেন্দ্রবাবুকে আড়ালে ডেকে বললের, "অত ঘন জোড়া ভুরু আমার পছন্দ নয়। কিছু ওষুধ দিয়ে উঠিয়ে দেওয়া যায় না?" মহেন্দ্রবাবু বললেন, "আগে বিয়েটা হয়ে যাক। এখানে এলে তুলে দেব। চুল তুললেই ঘা হবে। ওষুধ আছে দেব, প্লেন হয়ে যাবে। ওর জন্যে ভাববেন না।" মহেন্দ্রবাবু শুধু বাড়ির ডাক্তার ছিলেন না, বন্ধুও ছিলেন। অনেক সময় ভাল পরামর্শ দিতেন। মহেন্দ্রবাবু কথা রেখেছিলেন। বিয়েব পর বৌঠানের ভুরুর চুল তুলে দিলে আর বোঝা যেত না যে ভুরু জোড়া ছিল।

যখন ঐ মেয়ের সঙ্গে ঠিক হয়ে গেল তখন সকলেই খুশী। সবাই বলাবলি করতে লাগল, "ছেলের বয়স সতের, মেয়ের বার, মানাবে ভাল।" বাড়ির প্রথম ছেলে দিদিমার আদরের নাতির বিয়ে। চারিদিকে সারা পড়ে গেল। নিচুর মাকেও মেয়ে দেখান হল। সে বললে "বেশ মেয়ে, গুপুব সঙ্গে মানাবে ভাল।" দিদিমা বললেন "তোব পছন্দ হয়েছে ত?" সে বললে, "গুপুর পছন্দ হলেই আমার পছন্দ হবে। কলকাতার মেয়ের মত নয়। বেশ ধীর স্থির আছে। এখানে থাকলে ঘষা মাজা করলে আরও রং বেরোবে।

যখন বিয়ের কথা রটে গেল দ্বীপুজ্যাঠা (দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বড় ছেলে দ্বীপেন্দ্রনাথ) বাবাকে ও বাড়ির বারান্দা থেকে ডেকে বলেন, "কি হে জি, এন, টি, তোমার ছেলের বিয়ের ঠিক হয়ে গেল?" বাবা বলেন, "হ্যাঁ, হয়ে গেল।"

"কোথাকার মেয়ে, যশোরের?"

বাবা জানালেন, "না, মহেন্দ্রবাবুর শালার মেয়ে। মেয়েটি ভাল, সবার পছন্দ হয়ে গেল।"

"কবে বিয়ে?"

"মাঘ মাসে ঠিক হয়েছে।"

দ্বীপুজ্যাঠা বাবাকে নাম ধরে ডাকতেন না, বরাবর জি, এন, টি, বলে ডাকতেন। তেমনি হরিশ হালদারকে মজা করে সকলে হ, চ, হ বলে ডাকতেন। সত্য জ্যাঠামশায় (সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়) হরিশবাবুকে বাবার

কাছে দিয়ে গিয়েছিলেন। বলেছিলেন, "বড় গরীব, যদি কিছু কাজ দিয়ে সাহায্য কর ত ভাল হয়। থিয়েটারে সিন-টিন আঁকা কাজ করত! তোমারও ফাই ফরমাশ শুনবে, খাবে থাকবে। স্ত্রী, মেয়ে আছে। রাত্রে বাড়ি চলে যাবে।"

ঐ হরিশবাবু বিয়ের সময় পিঁড়ে এঁকে দিলে মেয়েরা চালের পিটুলি দিয়ে আল্‌পনা বুলিয়ে দিত। এখন রং-খড়ি দিয়ে আল্‌পনা দেয়। তখন তা হত না।

কাছাকাছি কোন আত্মীয়ের বাড়িতে শ্রী পিঁড়ে আঁকতে দেওয়া হত। সেবার দিদির শাশুড়ীর কাছে দেওয়া হয়। বিয়ের দিন সকালে এক থালা সন্দেশ, দই, মাছ, কাপড় দিয়ে বাজনা বাজিয়ে চন্দ্র নাপিত ও চাকরেরা গিয়ে নিয়ে এল। আমাদের দেখার বিরাম নেই। বাজনার আওয়াজ হলেই ছোটপিসীর ঘরের জানালা থেকে দাঁড়িয়ে দেখছি।

দিদিমার কাছে বাবা-কাকারা, ছোটপিসী, বড়পিসী, মা-কাকীমারা সকলে মিলে বসে পরামর্শ চলত কি রকম কোথায় কি হবে। তখন দিদিমা সকলকে বলেন, "তোমাদের যার যা ইচ্ছে আছে বল সেইমত বন্দোবস্ত হবে। বিনয়িনীর বিয়েতে ধুম করে পানপত্র দিয়েই তিনি (দাদামশায়) মারা গেলেন বলে ছেলেদের বিয়েতে আর কিছু করতে পারিনি।" ছেলেদের বললেন, "এখন তোদের যা ভাল হয় কর্। কিন্তু অন্যায় খরচ করিস্ না।" তিনি খুব বুদ্ধিমতী ছিলেন। জানতেন তাঁর ছেলেদের বড়মানুষী শখ কিছু নেই, যা কিছু করেন বাড়িতে বসে। বন্ধুবান্ধব ও ছেলেমেয়েদের নিয়ে গানবাজনা আমোদ আহ্লাদ গোপনীয় কিছু না থাকায় মায়ের কথামতই নিজেদের শখ মেটাবার ব্যবস্থা করলেন।

তখন দিদিমা বললেন, "আর যা করবি কর্, আমার আপত্তি নেই, কিন্তু সামাজিক করতে হবে। যত গরীব নিমন্ত্রিতেরা আসবে তারা তোমাদের ছেলে-বৌকে আশীর্বাদ করবে, আইবুড়োভাত দেবে, আর তোমরা তাদের কিছু দেবে না তা হতে পারে না। বড়লোক যারা তাদের ক্ষমতা আছে, দেবে। কিন্তু গরীবরা না দিতে পারলে মনে মনে দুঃখ করবে, তোমাদেরও নিন্দে হবে।" ঠিক হল যত লোক আসবে সকলের বাড়িতে সামাজিক যাবে। হাজার বাড়ি নেমন্তন্ন হলে হাজার সামাজিক যাবে। আর যারা দূর থেকে আসবে তাদের গাড়িভাড়া দেওয়া হবে। যাদের কাছাকাছি বাড়ি তাদের

গাড়ি-পাল্কী পাঠিয়ে আনা হবে। প্রত্যেক বাড়িতে একটা বড় পিতলের কলসী, তিনটে পিতলের থালা, দু-থালা ভরা সন্দেশ আর একটা থালায় রেলির বাড়ির থাল একটা বড়দার বিয়েতে এইরকম সামাজিক গিয়েছিল, আমরা দেখেছি।

তারপরে দিদিমার সামনে করে কি হবে তার ফর্দ হতে লাগল। দিদিমা বলে গেলেন কত নিমন্ত্রণ হবে। সরকার বসে সব লিখে নিতে লাগল।

গায়ে হলুদের তত্ত্ব মেয়েদের ফুলশয্যার ফর্দ মত হবে। খাবার সব গেলেও আলাদা তেল, ঘি, ময়দা, বড় মাছ একটা যাবে। এ ছাড়া থাকবে তবক দেওয়া দু-রকম পান, পানের মশলা, তেল-হলুদ মাখা-ঘষা, আশীর্বাদী থালা, তরকারী, গোটা পান, সুপারী, ফুল, ফুলের মালা। মেয়েদের বিয়ের সময় তেল হলুদটা বাদ যায়। তারপর সানাই, ঢোল, কাঁসি বাজনদার যারা যাবে তাদের রংকরা ধুতি চাদর, শীতের সময়কার গরম আলোয়ান দেওয়া হবে। চাকর, দাসী, বামুন, বেয়ারা, সহিস, কোচম্যান, এমন কি বাড়িতে মাইনে-করা মেথর, ভিস্তি—তখন ভিস্তি থাকত—দারোয়ান, মালী, গোয়ালা কেউ যেন বাদ না যায়। তখন মাইনে-করা দর্জি থাকত। তবে সমস্ত লোকদের তিন স্তরে ভাগ করা হয়। খুব পুরনো চাকর বামুনদের সোনার আংটি, গরদের কাপড, শাল দেওয়া হল, ছেলে মানুষ করা দাসীদের সোনার হার, অনন্ত, গরদের কাপড, শাল। তার পরের যারা তাদের নতুন কাপড, গরম আলোয়ান থাকবে। খুব নতুন যারা তত্ত্ব নিয়ে যাবে তারা খালি রং-করা কাপড চাদর পাবে। সহিস, কোচম্যান, দারোয়ান, বেয়ারাদের গরম উর্দি হবে। পাল্কী-বেয়ারাদেরও কাপড হবে। বামা জেলের আলাদা ব্যবস্থা গরদের উপর দামী কাশ্মীরী শাল একজোড়া, আর হীরের আংটি ছাড়া সে নেবে না। বাড়িতেই দেড়শো দুশো লোক। তারপর বাইরের লোক আছে, মেয়ের বাড়ির লোক আছে। সরকারদের জন্য হল শান্তিপুরের ধুতি, চাদর আর শাল, ভদ্রলোকের ছেলে সব। শ্বশুরের গরীব আত্মীয়দেরও কাপড দেওয়া হবে। গাঁঠরি গাঁঠরি কাপড এল। বাড়িতে রং করা হল। বাগানে শুকিয়ে দফতরখানার ঘরে তোলা হল। যে সব ঘরে পাতা পড়বে সেই সব ঘরের মাপে রোল করা আসন তৈরী করা হল। এক একটা আসনের মাপে ফিতে দিয়ে ভাগ করা হল। দর্জি বসে আগে থেকে সব সেলাই করবে। একটি

একটি করে আসন পেতে জায়গা করতে সময় যাবে। রোল খুলে টেনে দেবে সঙ্গে সঙ্গে পাতা ফেলে দেবে, তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে। লোক কমে কাজ হবে। ঐ সব বাবার মাথা থেকেই বের হত। অত আসন কিনতে গেলে খরচও বেশী পড়বে, আর হারিয়ে যাবারও ভয় ছিল। আমাদের পরিবারের কোথাও বিয়ে লাগলেই সবাই চেয়ে নিয়ে যেত। কটা রোল আছে গুণে দিলেই চলে যেত। সেই আসন বাড়ি যাবার পরেও ছিল। আর আসন কিনতে হয়নি।

তারপর নেমন্তন্নর চিঠি নতুন রকম হওয়া চাই। চন্দনকাঠের রোলারে ঠিকুজির মত লম্বা হলুদ রং-করা সাটিনের উপরে লাল কালি দিয়ে লেখা রাশি-চক্রের আকারে বার, তারিখ, নাম থাকবে। মাঝে বাদ দিয়ে দিয়ে থিয়েটার অবধি প্রায় পনের দিনের মত নেমন্তন্ন চলেছিল। বিয়ের ব্যাপার চুকতে চুকতে মাঘ মাসটাই কেটে গিয়েছিল। রেশমের ফিতে জরির টাসেল দিয়ে চিঠি বাঁধা হয়। সেই থেকে ঠিকুজির আকারে চিঠির ফ্যাসান হয়ে যায়।

এর মধ্যে একদিন বেনেপুকুরের দাদা এলেন। দিদিমার ছাদে তক্তা পাতা ছিল, সেইখানে বসে সব পরামর্শ হল। দিদিমা মাথার কাপড় তুলে দিলেন। বিশ্বম্ভর বেয়ারা আলবোলায় তামাক দিয়ে গেল। বাবা কাকারাও এলেন। অনেক কথার পরে সন্ধে হয়ে গেলে চলে গেলেন। কি কথা হল জানি না। সেখানে আমাদের যাবার হুকুম ছিল না। বোধহয় নেমন্তন্ন সম্বন্ধে কথা হয়। বাবার ইচ্ছে ছিল ঢালা নেমন্তন্ন করা। প্রথম ছেলের বিয়ে! কিন্তু সে সময় অনেক দলাদলি ছিল। তাই ঠিক হল সামাজিক ব্যাপার বাদ দিয়ে ঢালা নেমন্তন্ন করা হবে। প্রথম কাজ, গোলমালে কাজ নেই। থিয়েটারের দিন হাতে হাতে খাওয়া, সেইদিনই ঢালা নেমন্তন্নের ব্যবস্থা থাকবে। মেয়েদের বিয়েতেও ঐ ব্যবস্থা ছিল।

একদিন রামলালবাবুকে ডেকে বাবা বলেন, "কালী সিংহীর বাড়িটা ভাড়া করে মেয়ের বাবাকে ঐখানে এনে রাখার ব্যবস্থা করুন। ওখান থেকেই বিয়ে হবে। আপনার উপর ভার থাক, মেয়ের বাড়ির খরচ সব আমি দেব। আর এখান থেকে তত্ত্ব নিয়ে লোক গেলে তাদের বিদায় করা বা বরযাত্রীদের খাওয়ান, খাতির করায় যা কিছু খরচ সব আপনাকে দেব, কোন কিছু যেন মেয়ের বাপের ঘাড়ে না পড়ে দেখবেন। মেয়ের বাপ খালি যেমন তার ক্ষমতা

সেই অনুযায়ী দান দিয়ে মেয়ে সম্প্রদান করবে, কিন্তু বাইরের লোক যেন না জানতে পারে। বাপের মর্যাদা নষ্ট না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে ভুলবেন না। সেইজন্যই আপনার উপর ভার দেওয়া হল। দরকার হয় যদি আপনার বড় ছেলে ইন্দুভূষণকে আনিয়ে নিন! লোকে জানবে আপনি ঘটকালি করেছেন বলে ওখানে তদ্‌বির করছেন।" রামলালবাবুকেও শাল, হীরের আংটি ও নগদ পাঁচশো টাকা, আর তাঁর ছেলেকে শাল, কাপড় দেওয়া হয়। মেয়ের বাবা (প্রসন্ন) কালী সিংহের বাড়ি এলে নিচুর মা দাসী রোজ রূপটান-বেসন-সাবান নিয়ে গিয়ে মেয়েকে চান করিয়ে আসত। এইভাবে যাওয়া আসা চলতে লাগল। বাবা সকলের বিয়ের গয়নার ডিজাইন নিজেই করে দিতেন। বৌঠানের জন্যও কতরকম নতুন ডিজাইনের গয়না, রকমারী বেনারসী শাড়ি ও জামার ডিজাইনের নমুনা বাবা নিজেই করে স্যাকরা ও দরজিকে দেখিয়ে দিলেন।

সাজাবার ভার মতিবাবু নিলেন। থাসগেলাস নিয়ে ভাড়া করা লোক যাবে। বাঁধা রোশনাই হবে। অ্যাসেটিলিনে বাহার হবে না বলে থাসগেলাসের ঝাড় বাড়ির বাগানে বসে তৈরী করান হল। বাঁথারীর মাথায় দু-তিন থাক রং বেরঙের অভ্রর গেলাস, মাঝে মাঝে একটা করে বড় গাছের মত ঝাড়, তাতে বাতি দেওয়া হবে। বাহকদের কোমরে দড়ি দিয়ে বাঁধা থাকবে যাতে দলছাড়া হয়ে না যায়। একেই বলে বাঁধা রোশনাই। ল্যাণ্ডোগাড়ি বড় আছে, সেটা ফুল দিয়ে সাজান হবে গাড়ির চাকা থাকবে কাজ করা রূপোর পাত মোড়া। মতিবাবু বললেন, "ফুলের দোকান থেকে লোক এসে গাড়ি সাজিয়ে দেবে, আমাদের ভাবতে হবে না।" মহাপায় তৈরী হতে লাগল হাপডমুখো বাঁট রূপোর জলে রং করা, ভেলভেটের গদি বালিশ। পাতলা চুমকিদার পদা, জরির ঝালর থাকবে যাতে বৌ দেখা যায়। বৌ একলা যাবে, তা নইলে আড়াল হয়ে যাবে। চারজন বেহারা সেজে-গুজে বইবে। বরের গাড়িতে নিতবর ও আমি থাকব। ভিড় বসলে বরকে দেখা যাবে না। আর সকলে হেঁটে যাবে, বেশী দূর ত নয়। অলোক নিতবর হয়েছিল। বরের গাড়ি ফুল দিয়ে সাজান হবে। সকলের আগে ব্যাণ্ড যাবে। কিন্তু বরের গাড়ির সঙ্গে থাকবে আগে সানাই পিছনে ঢোল কাঁসি। দু পাশে বাঁধা রোশনাই যাবে। মেয়েরা গাড়িতে যাবে, বাবুরা ধুতিচাদর পরে হেঁটে গেলে ভাল দেখাবে। ঐ সব প্ল্যান আগে থাকতে ঠিক করা হবে।

বর পৌঁছে দিয়ে বাজনদার সব চলে আসবে। এখানে এসে খাবার বন্দোবস্ত থাকবে। শিশু গাছের নাচে কানাত দিয়ে ঘেরা, তাদের জন্য বর নিয়ে রওনা হবার আগে হোটেলের খাবার, কেক, চকোলেট, লজেন্স ও সোডা লেমোনেডের ব্যবস্থা থাকবে। সেদিন বোতলের ব্যবস্থাও থাকবে, কিন্তু কড়া পাহারা থাকবে। সাহেবরা চলে গেলে বর নিয়ে চলে যাবে। তখন মন্নুকে বলে দিলে চাবি দিয়ে দেবে। মন্নও সেইরকম বিশ্বাসী বেহারা ছিল। যেমন রামলালবাবুকে ওদিকে মন্নু এদিকে থাকবে, আর কিছু দেখতে হবে না।

বর বসার জায়গার সাজানোর ভারও মতিবাবুই নিলেন। বাইরে দোতলার হলে জালের দরজার দিকে তক্তার উপর সার্টিনের চাদর ঢাকা, তার উপরে সাদা জরির কাজ করা লাল ভেলভেটের মসলন্দে গের্দা বালিশ বরাবর যা পাতা হত তাই পাতা হবে। দেয়ালের দিকে থাকবে ফুল, ফুলের মালা ঝোলান, আশেপাশে ফুলদানিতে ফুলের তোড়া, ফুল। গুদোম থেকে কাউগ্লাসের ষ্ট্যাণ্ডে লাল ফানুস দেওয়া বাড়ির ঝাড় বের করা হল, তক্তার দু পাশে থাকবে। মাথার উপরের পাঁচটা ঝাড়ের গেলাস খুলে দেওয়া হল। সিঁড়ি, বিলিয়াড ঘর আর লাইব্রেরী ঘর ছাড়া আর কোথাও তখন ইলেকট্রিক লাইট হয়নি। বরের সামনে সাদা জাজিম, বড় বড় গের্দা দেওয়া ফরাস পাতা থাকবে। উর্দিপরা তকমা আঁটা ছজন বেয়ারা বড় বড় তালপাতার পাখা চালাবে। রুপোর সালবোটে (পায়াওলা থালা) পান, ফুলের মালা, গোলাপ-জল-ভরা গোলাপপাশ থাকবে। আতরদানে খশখশ আতর গোলাপি আতর থাকবে। সেই সব রুপোর জিনিস মন্নর জিম্মায় দেওয়া হত। রুপোর আলবোলায় তামাক দেওয়া হবে। সে সব হুঁকোবরদার বিশম্ভর বেয়ারার জিম্মায় থাকবে। সরকার তাদের নামে নামে গুণে লিষ্ট করে পরিষ্কার করতে দিল। ফটক থেকে দ্বারকানাথ ঠাকুরের গলি অবধি লাল শালু পাতা হবে। বিয়ের পরে আবার কাচিয়ে সরকার তুলে রাখবে।

সকলে বললে নতুন ঘোড়ায় গাড়িতে বর যাবে। বাবা বললেন না। তাতে কাজ নেই, নতুন ঘোড়া বাজনা শুনে ভিড় দেখে ভড়কে যেতে পারে। কালজুড়ি ঠাণ্ডা আছে তাদের দেওয়া হবে। অমন সুন্দর দেখতে, ল্যাণ্ডোগাড়িতে জুতলে আরও বাহার হয়। তাই ঠিক হল।

কালজুড়িকে সহিস যখন টহল দেওয়াত, দলাইমলাই করত তখন দেখেছি।

মনে হত যেন তেল মাখিয়ে পালিশ করেছে। কাল কুচকুচে রং। আর কি সুন্দর চুলের মত লম্বা ল্যাজ, পা অবধি ঝুলত। যখন গাড়ি টানত, রবারের টায়ার দেওয়া গাড়ির আওয়াজ পাওয়া যেত না, ঘোড়ার পায়ের আওয়াজ চিৎপুর রোড থেকে শোনা যেত। গপ্ গপ্ আওয়াজ শুনলেই বোঝা যেত গাড়ি আসছে। লাল জুড়ি ছিল, কিন্তু তাদের অমন বাহার ছিল না। কালজুড়ির কাছে নতুন জুড়ি দাঁড়াতে পারত না। রমজান কোচম্যান, আবদুল, আর করিম খাঁ সহিসের লাল উর্দি তৈরী হল, হলদে বর্ডার দেওয়া পাগড়ি। কোমরবন্ধে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার দেওয়া দ্বারকানাথ ঠাকুরের ক্রেস্ট—হাতীর পিঠে নিশান। গাড়ির দরজাতেও ক্রেস্ট আঁকা থাকত।

বড়দাদার যখন বিয়ে হয় ঐ একই দিনে কানাইকৃষ্ণ ঠাকুরের পৌত্র প্রফুল্লনাথ ঠাকুরের বিয়ে হয়। দিদিমা তাই আগে থাকতে পাথুরেঘাটার বেহারা পাণ্ডবকে ডাকিয়ে বললেন "গায়েহলুদের আগের দিন থেকে ছখানা পাল্কী ও তার বেহারা হামেহাল হাজির থাকতে হবে। বিয়ের দিনও ফুলশয্যার দিন চারখানা করে থাকবে। বাসি বিয়ের দিন সকালে দুই। বৌ-ভাতের দিনও সকালে দরকার। পাল্কী পিছু চার আনার বদলে আট আনা দেব। পারবে কিনা এই বেলা বল। পাথুরেঘাটায় বিয়ে হবে। তোমার সব পাল্কী তারা টেনে নিলে তখন বোল না যে সেখানে চলে গেছি। তাহলে এক পয়সাও ভাড়া পাবে না।"

চিৎপুর রোডে মল্লিকবাড়ির নীচে তার আড্ডা ছিল, জানলা দিয়ে দেখা যেত। সে বললে "কথা দিয়ে গেলুম মা পাল্কী ঠিক হাজির থাকবে। তবে কবে কবে দরকার সরকার মশাইকে বলুন লিখে দেন না।"

দিদিমা বুঝেছিলেন ওরা বড়মানুষ, বেশী দিয়ে পাল্কী আটকে ফেলবে। তাই আগে থেকে ব্যবস্থা করেছিলেন। তাঁর এইরকম দূরদৃষ্টি ছিল। আমার বিয়ের পর অনেককে বলতে শুনেছি "গগনের মা পাকা গিন্নী, আগে থাকতে কেমন বন্দোবস্ত করেছিলেন। কিন্তু পাল্কীর ভাড়া বাড়িয়ে দিলেন—চার আনার জায়গা। আট আনা হয়ে গেল।"

অনেক আত্মীয় যাঁরা জোড়াসাঁকোয় আসতেন, তাঁরা আমার শ্বশুরবাড়ি পাথুরেঘাটাতেও যেতেন। ক্ষ্যামাঠাকরুণ তাঁদের একজন। তিনি আমাদের দূরসম্পর্কের জ্ঞাতি। দিদিমা তাঁকে ঠাকুরঝি বলতেন, বাবা কাকারা ক্ষ্যামাপিসীমা বলতেন। তিনি স্পষ্ট কথার মানুষ ছিলেন, দোষ ত্রুটি দেখলে

সামনাসামনি বলতেন। তাই সবাই তাঁকে ভয় করে চলত। আমরা তাঁকে ক্ষ্যামাদিদিমা বলতুম। বিয়ের পর আমার ননদকে মাসীমা বলতে শুনে আমিও মাসী বলে ডেকেছিলুম। তাতে আমাকে বললেন, "কি, তোর বাপ আমাকে পিসী বলে আর তুই আমাকে মাসী বল্‌বি? এর পরে আরও কত কি বলে ডাক্‌বি?

আমি সেই থেকে আর মাসী বলতুম না। তাঁর কাছ থেকে সব বাড়ির নিন্দে সুখ্যাতির খবর পাওয়া যেত। তিনি বলতেন, "গগনের মায়ের মত অমন পাকা গিন্নী বড় দেখা যায় না। যেমন লোকজনের খাতির করে, তেমন দানধ্যান, সবাইকে সমানভাবে দেখে। তেমনি ছেলে তিনটিরও ভায়ে ভায়ে যেমন সদ্‌ভাব, তেমন সহজে আর কোথাও দেখা যায় না। তিন ভায়ের সংসার দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়—কি অমায়িক ব্যবহার, রূপে গুণে যেন লক্ষ্মী-সরস্বতীর সমন্বয় ঘটেছে। ওদের দৃষ্টান্ত সকলের নেওয়া উচিত। অমন মা না হলে অমন ছেলে হয়! সকল দিকে চোখ রেখে কাজ করে, একটু বে-চাল হবার জো নেই।"

এদিকে যখন সব ঠিকঠাক তখন কাশীতে খবর গেল। দাদামশায়, কাশীর দিদিমা আসবেন। মাসীদের বলা হবে। বড় মাসী ভূপেন্দ্রবালার বিয়ে হয়েছিল গাজিপুরে, বাইরের পরিবারে। বড়মেশোমশায় তখন বেঁচেছিলেন, কিন্তু কলকাতায় বড় একটা আসতেন না। কাশীতে যেতেন। গাজিপুরে থাকতেন। তাঁদের ছেলেমেয়ে হয়নি। বড়মাসী একটি মেয়েকে দত্তক নেন। সে ও তার ছেলে আসত। বড়মাসীকে আসতে লেখা হয়। আগে থেকে এসে থাকবেন। বড় বাদে আর সব মাসীদের ঠাকুর বাড়িতে বিয়ে হয়েছিল। দিদিমা বললেন, "নরেনবালা বৌমা (মেজমাসী নরেন্দ্রবালা) পাশেই আছে। পরে নিমন্ত্রণ হবে।" ন মাসী ধৃতিকুমারী আর নতুনমাসী সুনীলাও কাছাকাছি ছিলেন। মায়ের দূরসম্পর্কের বোন কিরণমাসী কাশীর দাদার চোরবাগানের বাড়িতে থাকতেন। প্রায়ই তিনি আমাদের বাড়ি এসে থাকতেন। কিরণমাসী আগে থেকে এসেছিলেন। ছোটমাসী দাদামশায়ের সঙ্গে আসেন।

যশোর থেকে বাবার মামীমা এলেন। আরও সব যশোরের পিসীমা, যশোরের কাকীমারা, তাঁদের মেয়েরা এলেন। সারি সারি বসে সবাই মিলে তেঁতুল কাটা, বড়ি দেওয়া হল। ভাজা বড়ি, কুমড়োর বড়ি, আরও কতরকম

বড়ি হল। দিদিমার হাতের কাজ কত ভাল ছিল। বড়ি সব পরিষ্কার হত, আর কেমন দাঁড়িয়ে থাকত। আমরা বড়ি দিতে গেলে বলতেন, "তোদের বড়ি থ্যাবড়া হয় কেন? যার হাতের বড়ির নাক ভাল উঠবে, তার হাতের শ্রী-র নাকও উঠবে, আল্‌পনাও ভাল হবে। বিয়েতে শ্রীর নাক না ওঠা অলক্ষণ। এখন তোরা সব শিখে রাখ।"

আমার মায়ের হাতের বড়ি, চুলবাঁধাও খুব পরিষ্কার হত। মায়ের হাতের চুলবাঁধা না হলে আমার পছন্দ হত না।

বড়দাদার বিয়ের সময় আমগাছের তলা থেকে বাবুর্চিখানা অবধি আধখানা বাগান, ফটক ঘিরে আটচালা বাঁধা হয়। ঢেঁকির পাশের চাতালও ঘিরে বাজনদারদের খাবারের বন্দোবস্ত হয়েছিল। রামলালবাবুর ঘরের ভিতর দিয়ে রান্নাবাড়িতে যাতায়াত করা হয়। চাতালেও ভিয়েন বসে, মাছ ভাজা লুচি ভাজা হয়। আমগাছতলায় রামা জেলে ও তার লোকজনেরা মাছ কাটতে বসে যায়। সেই দেখে বাবা সেদিক থেকে পালিয়ে গেলেন, পাছে রক্ত দেখতে হয়। আমগাছতলার বাগানে টেবিল চেয়ার দিয়ে বাজনদারদের বসা, বাজান, খাওয়ার বন্দোবস্ত হয়েছিল। বামুনের বদলে চাকরেরাই তাদের পরিবেশন করে। রামলালবাবুর উপরেই সব ভার থাকে। রামলালবাবুকে কোন কাজের ভার দিলে আর কিছু দেখতে হত না। মুখের কথায় সব ঠিক ঠিক ব্যবস্থা করে দিতেন।

গায়েহলুদের আগের দিন থেকে সব সাজান হতে লাগল। চাকরদাসীদের কাপড় বিলি হয়ে গেল। তারপর বিলিয়ার্ড ঘরে শুরু হল সবাইকার নামে নামে টিকিট দিয়ে সামাজিক সাজান। যখন এলাহাবাদে যাওয়া হয় তখনই সেখানে দিদিমা বাসনওয়ালার সঙ্গে কথা কয়ে ঠিক করে রাখেন। জয়পুরের কাজ করা থালা একসঙ্গে অনেক নিলে সস্তা হবে। কলকাতায় দাম বেশী পড়বে। তখন তাকে জিগেস করেন বিয়ের সময় খবর দিলে সে পাঠিয়ে দিতে পারবে কিনা। সে বলে, "আমার দোকানের ঠিকানা রাখুন, খবর দিলেই পাঠিয়ে দেব।" বড়দার বিয়ের ঠিক হলে সামাজিক পাঠানোর জন্য সেই জয়পুরের থালা আনানো হয়। ওদিকে দাসীরা ঢেঁকিতে চাল কুটতে লেগেছে, বিয়ের দিন আনন্দ নাড়ু হবে। পাতা খুরি গেলাস ধোয়া হতে লাগল উঠানে। ছোটপিসীর বারান্দায় দিদিমার সামনে মাদুর পেতে পান সাজা, তরকারী কাটা শুরু হয়ে গেছে। এদিকে

বাগানে আটচালা বাঁধা, বাড়ির চারিদিকে ঝাড় খাটান হচ্ছে। চাকরদাসীরা ব্যস্ত হয়ে ছুটোছুটি করছে। পিসী, মাসী, মামীরা মিলে দল বেঁধে গায়ে-হলুদের তত্ত্ব সাজাতে লেগেছেন। তার ভিতরে কতরকম কারুকার্য। রান্নাবাড়িতে বড় শিল পেতে তাল তাল বাটনা বাটছে। তারই মধ্যে নাপ্‌তানী এসে সব মেয়েদের ডেকে আলতা পরাতে লাগল। উঠানে 'হুম্' শব্দে পাল্কী নামালেই বোঝা যায় কেউ এলেন। "দেখত কে" বলতে বলতে উপরে উঠে এসে তরকারী কাটা, না হয়ত পান সাজায় বসে গেলেন।

আসাযাওয়ার বিরাম নেই। আমাদেরও দেখার বিরাম নেই। একবার ছুটে বৈঠকখানার দিকে যাচ্ছি, আবার ভিতর বাড়িতে এসে দেখতে বসছি। তার মধ্যে আবার ফাইফরমাশ খাটার আনন্দ। লোক দিয়ে সব সামাজিক বাড়ি বাড়ি পাঠান হল। কিছু ফিরত আনতে হবে না। নামিয়ে দিয়ে চলে আসবে।

গায়েহলুদের দিন ছোট পিসীর বারান্দায় কলকাতায় পিঁড়ে পেতে মেয়েরা শাঁখ বাজিয়ে উলু দিয়ে বরের কপালে হলুদ ছুঁইয়ে দিল। তারপর তত্ত্ব যাবে। বাইরে দক্ষিণের বারান্দায়, ছোট পিসীর ঘরের জানালায় লোক দাঁড়াবার জায়গা নেই, সবাই ঠেলাঠেলি করে দেখছে। বাগানে সব সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে, ছেদি হেড দরোয়ান আগে, তারপরে বাজনদার, তারপর মানিকঠাকুর পুরোহিত আশীর্বাদী নিয়ে, তার পিছনে হলুদ। মাছ, দই তার পিছনে। এক এক করে গুনে গুনে সব ছাড়া হতে লাগল। একজন সরকার সবার পিছনে গেল ফর্দ হাতে। বাবা উপর থেকে বলে দিলেন, "দেখো যেন লাইন না ভাঙে।" আশপাশের চিৎপুরের বাড়ি বারান্দায় সব জায়গা খালি লোকের মাথা দেখা যাচ্ছে। রাস্তায় দু-ধারে লোকে দাঁড়িয়ে দেখছে।

তারপরে হুকুম হল নিমন্ত্রিতদের আসা আরম্ভ হয়ে গেলে সেজেগুজে দাঁড়িয়ে খাতির করে নিয়ে আসতে হবে। একজন সরকার দাঁড়িয়ে আছে টাকার থলি হাতে, যারা ভাড়া গাড়িতে আসছে তাদের ভাড়া কত হল দেখছে, যাবার সময় সেই ভাড়া দিতে হবে। মেয়েদের একেবারে তিনতলার হলে নিয়ে যেতে হবে। একতলা থেকে একজন দোতলায় পৌঁছে দিলে, দোতলায় একজন আছে, সে পাঠাল তিনতলার হলে। সেখানে যে আছে সে খাতির করে নিয়ে গেল বসাতে গানের মজলিসে, কারও কারও সঙ্গে একজন করে ঝি আছে সে পাখা জুতো সামলে রাখবে। জুতো হারানোর রেওয়াজ যেমন এখন আছে তখনও

ছিল। তবে তখন বেশির ভাগই বদল হয়ে যেত। অনেক সময় ফেরত পাওয়া যেত। এখন যে যায় সে আর সহজে আসেনা। কিন্তু সবকিছু বদল হলেও মূল নিয়মের বদল হয়নি।

নেমন্তন্নবাড়ির খাওয়াদাওয়া চুকলে দিদিমা মাকে বলে চলে আসতেন, তিনতলায় এসে খেতেন। দাসীদের বলতেন, "দেখিস্, বেড়ালটা যেন খেতে পায়। মাছ আছে অনেক, চারটি ভাত মেখে দে। 'ম্যাও ম্যাও' করে পায়ে পায়ে ঘুরছে, বোধহয় খিদে পেয়েছে।" তাঁর সবদিকে নজর থাকত। বড়দিদির বেড়াল ছিল। অত কাজের মধ্যেও তার কথা ভুলতেন না। মা তো কাজের সময় ভাত খেতেন না, জলখাবার খেয়ে থাকতেন, বাড়ির লোক, বাইরের লোক, মেথর—সকলের খাওয়া হয়ে গেলে তখন চান করে খেতে যেতেন।

গায়েহলুদের দু'দিন বাদে বিয়ের দিন ছিল। ঐ দু'দিন নিকট আত্মীয়দের বাড়িতে বাড়িতে আইবুড়োভাত খাওয়ার নিমন্ত্রণের পালা। আবার যারা নিমন্ত্রণ করবে না তারা সব কাপড়, মিষ্টি পাঠাচ্ছে। সরকার বসে বাড়ির নাম লিখে নিয়ে থালা পিছু আটআনা বিদায় দিতে লেগে গেছে। সারাদিন বিরাম নেই।

বিয়ের দিন সকাল থেকে সবাই ব্যস্ত। বরের আসন সাজান হল। গাড়ি বারান্দার নীচে ল্যাণ্ডোগাড়ি ফুল দিয়ে সাজান হতে লাগল। কোচবাক্স অবধি ফুলে ভরা, চাকাতেও ফুল, মনে হতে লাগল যেন ফুলের গাড়ি। মহাপায়া সাজান হয়ে বাগান থেকে ঘরে এল। ঐ সব হতে হতে শীতের বেলা শেষ হয়ে এল। সকালের খাওয়াদাওয়া চুকে গেলে তখন বর সাজান হবে।

ওদিকে ভিতর বাড়িতে শাঁখ বেজে উঠল। আমরাও সব সেইদিকে ছুটে গেলুম। দেখি বড়দাদাকে বসিয়ে যত মেয়েরা ঠাট্টাতামাসা করছে আর খুব হাসছে। মাথার উপর থেকে কাপড় ধরে আনন্দনাড়ুর 'বীত্' হচ্ছে, আর নাড়ু পাকান হচ্ছে। তারপরে বর নাওয়ান হবে গেলে বড়দাদাকে সাজাতে নিয়ে গেল। এদিকে চারটে বাজতেই আমবাগানে গোরোর ব্যাণ্ড বেজে উঠল। নাড়ু হচ্ছে বলে উঠোনে ঢোল কাঁসি বাজছে, নহবৎ খানায় নহবৎ বাজছে। শাঁখ উলু ত আছেই। অত বড় বাড়িতেও কাজের জায়গায় কথা শোনা যাচ্ছে না। ব্যাণ্ডে বাংলা গান বাজান হয় দিদিমাকে শোনাবার জন্য। দিদিমা বললেন, "এখানে ব্যাণ্ড বাজালে কিছু কাজ হবে না, কানে কিছু শুনতে পাচ্ছি না। এ বাগান থেকে বড় বাগানে নিয়ে যেতে বল্।" তখন তাদের

সামার হাউসের ভিতর বসান হল। তখন ব্যাণ্ডে যে কি গৎ বাজান হচ্ছে তা শোনার বা বোঝার বয়স আমাদের হয়নি। আর শোনবার ধৈর্যও আমাদের ছিল না বলে সে দিকের খবর বলতে পারব না। আমাদের নজর ছিল কেক, চকোলেট ও লেমনেডের উপর, তাই খেতেই তখন আমরা ব্যস্ত। বর গিয়ে বসলে সব লোক আসা শুরু হয়ে গেল। চারিদিকে ঝাড় জ্বলে উঠল। ওদিকে ব্যাণ্ড বেজে চলেছে, এদিকে বরের সামনে ওস্তাদের গান চলছে।

সব যখন তৈরী, লগ্ন দেখে বর যাত্রা করবে। তখন খাসগেলাস জ্বালা হবে। গাড়ি বারান্দার নীচে রমজান সেজেগুজে গাড়ি নিয়ে হাজির। বাগানে খাসগেলাস বাহকেরা লাইন করে দাঁড়িয়ে আছে। ছোটপিসীর বারান্দায় মা বরণ করছেন। কলাতলায় বর দাঁড়িয়ে আছে, বেনারসী জোড়, পাঞ্জাবী পরা কপালে চন্দন, গলায় ফুলের গোড়ে মালা, মাথায় টোপর, গলায় হীরের কণ্ঠা, হাতে হীরের আংটি। সামনে দিদিমা তক্তায় বসে মাকে বলছেন, "দেখো যেন হাত না কাঁপে, সাবধানে বরণ কর।" নারায়ণ ঠাকুর নিয়ে মাণিকঠাকুর দাঁড়িয়ে। পুরুতঠাকুর মন্ত্র বললেন। যাত্রা করান হয়ে গেলে মা কনক অঞ্জলি নিয়ে চলে গেলেন। দিদিমা বললেন, "তোমাকে আর দেখতে নেই। তুমি উপরে চলে যাও।"

বাগানে তখন খাসগেলাস জ্বালা হয়ে গেছে। বর গাড়িতে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাণ্ড বেজে উঠল। গাড়িবারান্দার ছাদ থেকে মেয়েরা ফুল ছড়াতে লাগল। গাড়ির দু'পাশে দড়িবাঁটা খাসগেলাসের আলো। সবার পিছনে ঢোল, কাঁসি। যখন চিৎপুর রোড দিয়ে গাড়ি যাচ্ছে বাড়িতে বাড়িতে ছাদের মাথায়, বারান্দায় লোকে দাঁড়িয়ে দেখছে। তখন বাবার কী আনন্দ! যত বরযাত্রী সকলে ধুতিচাদর পরা হেঁটে চলেছেন। বর পৌঁছে গেলে কালীসিংহের বাড়িতে ব্যাণ্ডের বাজনা ফোয়ারার চারপাশে ঘুরে চলে আসে। সব বাহনদার এখানে চলে এলে খাওয়ান হয়েছিল। ঘাসগেলাসের ঝাড় সব রাস্তার ছেলেরা সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে নিয়ে পালিয়ে গেল। বরযাত্রীদের খাওয়াদাওয়া সেইখানেই হয়েছিল। তখন বিয়ের দিন মাছ মাংস খাওয়া নিয়ম ছিল না। ফুলশয্যা ও বৌভাতের দিন মাছ মাংস খাওয়া হত।

আনন্দনাড়ু ভাজা হলে প্রত্যেক বাড়িতে এক এক হাঁড়ি নাড়ু ও সন্দেশ বিলি করা হবে। হাঁড়ির গায়ে টিকিট দিয়ে রাখা হল। যখন সবাই বাড়ি যাবে গাড়িতে তুলে দেওয়া হবে। আর সহিস, কোচম্যানদের খাবারে সরাও

সেই সঙ্গে দেবে। একজন সরকারের উপর ভার দেওয়া হল। অত বিরাট ব্যাপারেও যে কিরকম সুষ্ঠুভাবে কাজ হত না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। ঠিক যেন কলে কাজ হয়ে যাচ্ছে! অনর্থক হাঁকডাক বা চেঁচামেচি কিছু হত না, এত ভাল বন্দোবস্ত আগে থেকে করা থাকত।

তার পরের দিন সকালে বড়পিসী বৌ আনতে যাবেন। বড়পিসীর কাছে দিদিমা গয়নার বাক্স, কাপড় সব বুঝিয়ে দিলেন। দিদিমার সব আগেকার গয়না, মুক্তোর সাতনহর, মাথার সিঁথি—আজকালকার মত টিকলি নয় যে দেখা যাবে না,—হীরের কণ্ঠা, কঙ্কণ, বাউটি, কানবালা, হীরের কান। আদুরে নাতি, তার বৌ। নিজের সেকেলে গয়না সব বের করে দিলেন। বললেন, "তোমাদের নতুন গয়না যৌতুক কর। ভারী গয়না না হলে কি বৌ মানায়?" সেদিনও সকালে খাওয়াদাওয়া হবে। বৰকনে উপরের হলে বসবে। সেইখানে সব সাজান হল।

ল্যাণ্ডোগাড়ির পিছনে মহাপায়াতে বৌ এল। রাস্তা বদল করে আসতে হয় বলে কালীসিংহীর বাড়ির পিছনের রাস্তা দিয়ে ঘুরে চিৎপুর রোডে এল। আমাদের বংশের লোক ছাড়া বন্ধুবান্ধব কেউ বাদ ছিল না। নাটোরের মহারাজা ও আরও অনেকে গাড়ির সঙ্গে এলেন। বাবা বৌয়ের পাশে পাশে এলেন। বাবার তখন কী আনন্দ! গাড়ি বারান্দার ধারে রেখে ছবি তোলা হল। তারপর বরণ, বৌ পরিচয় সব কিছুর ছবি তোলা হয়।

তারপর তিনতলার হলে বর কনেকে বসান হলে সেইখানে সবাই আশীর্বাদ করতে এলেন। যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর, কালীকৃষ্ণ ঠাকুর বৌ দেখে বৌকে আশীর্বাদ করে গেলেন। তাঁরা তখন বেশ বুড়ো হয়ে গিয়েছিলেন বলে রাত্রে উপস্থিত থাকতে পারেননি, তাই সকালে বৌ দেখতে এলেন। আর আসতে পারবেন না বলে জানিয়ে গেলেন। আমার তখন বিয়ের ঠিক হয়ে গিয়েছিল বলে দিদিমা আমাকে ডেকে বললেন, "দাদাশ্বশুরকে (কালীকৃষ্ণ ঠাকুর) প্রণাম কর।" আমি সকলকেই চিনতুম, প্রণাম করলুম। তারপর নাচগান খাওয়াদাওয়া চুকতে চুকতেই বেলা কেটে গেল।

তার পরদিন ফুলশয্যার আসর। মেয়েমহলে খেমটা নাচ, গান সন্ধ্যা থেকেই শুরু হল। পুরুষ মহলের আগে খাওয়া হয়ে গেলে রাত আটটা থেকে বাঈনাচ শুরু হয়। দুজন বাঈজি আসে, শ্রীজান ও গহরজান, কলকাতার নাম করা বাঈজি। রাত দুটো অবধি নাচগান চলে। বড় বড় ওস্তাদ, রাজা,

মহারাজা, তখনকার দিনের বড় বড় সমঝদার সব বসে। রুপোর আলবোলা, গড়্গড়া সব পাশে পাশে সাজান। হাসেহাল তক্‌মাধারী বেয়ারা হাজির। মাঝে মাঝে গোলাপজল ছিটিয়ে দিতে দেখা যাচ্ছে। আর বড় পাখা চালাচ্ছে। কেউ কেউ পান জল সরবরাহ করছে, তামাক বদলে দিচ্ছে।

তখন রাজা-মহারাজা আসতেন বটে, কিন্তু কখনও মদের হুল্লোড় ছিল না। বাবা-কাকারা নিজেরা মদ খেতেন না বলে কাউকে দিতেনও না। যদি সে রকম কেউ আসত, বাবার মন্নু বেয়ারার কাছে তোলা থাকত। বাবা বললে তবেই বের হত। কিন্তু মন্নুকে ইশারা করে দিতেন। কেউ যেন বেসামাল না হয়। মন্নুও সেইরকম বুঝে চলত।

মেয়েমহলে তখন নাচগান বন্ধ হয়ে গেছে, মেয়েদের খাওয়ান শুরু হয়েছে। "লুচি নেই, আনো," "মাংস, তরকারী পাঠাও," "দই দাও," "মিষ্টি দাও," "জলের জাগ আনো এদিকে," এমনি করে খাওয়া হয়ে গেলে তোয়ালে, পানের থালা হাতে ঝিয়েরা দাঁড়িয়ে আছে।

গহরজান বৈঠকখানার গান হয়ে গেলে দিদিমাকে গান শোনাতে যায়। দিদিমা বললেন, "গ্রামোফোনের রেকডে শুনেছি তুমি গান বেঁধেছ, শোনাও।" গহরজান তাঁকে 'হরিনাম মহামন্ত্র হৃদয়ে জপ রসনা' গানটা গেয়ে শুনিয়েছিল। দিদিমা খুব খুশী হয়েছিলেন। কিষণ বেয়ারার তৈরী বাগানবাড়ি টেবিলের উপর সাজান ছিল। গহরজান যাবার সময় সেটা দেখে তারিফ করায় দিদিমা জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি ওটা নেবে।" সে উত্তর দিল, "আপনি যদি মেহেরবানি করে দেন ত নেব না কেন?". দিদিমা তাকে সেটা দিয়ে দিলেন। তাই দেখে আমার ভীষণ রাগ হয়। যদিও সে আমাকে কোলে বসিয়ে আদর করেছিল, তবুও তার উপর বিরক্ত হয়েছিলুম। কিষণও ক্ষুণ্ণ হয়, বলে, "মাকে দিলুম আর ও নিয়ে চলে গেল।" শেষকালে কিষণই সেটা ধরে তার গাড়িতে তুলে দিয়ে আসে।

এর দুদিন বাদে বৌ-ভাত হয়। সেদিন বরের আসর বসে তিনতলার হলে। খেমটা নাচের জন্য দুজন খেমটাওয়ালী আসে। বরের সামনে রুপোর থালায় ধানদূর্বা দেওয়া আছে। যার যেমন ক্ষমতা দিয়ে আশীর্বাদ করে যাচ্ছে। কেউ কেউ টাকা, গিনি, গয়না দিয়েও দেখে গেল। সেদিনও ধূমধাম করে খাওয়া-দাওয়া সমাধা হয়ে গেল।

বিয়ের অনুষ্ঠান সব চুকে গেলে একদিন থিয়েটার হয়। সেদিন হাতে হাতে

মাটির প্লেটে ভিয়েনের খাবার। রাধা বল্লভী, কচুরি, সিঙাড়া, সন্দেশ, লেডিকেনি, অমৃতের জিলিপী—সবরকম খাবার থাকত। "মেবার পাহাড়" ও "উভয় সঙ্কট" নাটক হয়েছিল। উৎসব শেষ হতে মাঘ মাসটা কেটে গেল।

(২২)

যখন ভোর চারটের সময় ঠাকুরঘরে মঙ্গলারতি হত, বৌঠান ও আমি সেই আরতির ঘণ্টা শুনতে পেয়ে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়তুম। হিন্দুপাড়া বলে দেখতে দেখতে চারদিক থেকে অন্যান্য বাড়িতেও ঘণ্টা বেজে উঠতে শোনা যেত। কী চমৎকার লাগত! শীতের সময় অন্ধকার থাকত, কিন্তু গরমকালে আলো হয়ে যেত। বৌঠান পুজো জানত বলে মায়ের সঙ্গে মাটির শিব গড়ে পুজো করত। বাগান থেকে ফুল কুড়িয়ে এনে মায়ের পুজোর জোগাড় করে দিয়ে বৌঠান পুজো করতে বসত। আমিও দুর্গানাম লিখতে বসতুম মায়ের কাছে। অগ্রহায়ণ মাসে ইতুপুজো করতুম। রবিবার হলে মা বলতেন, "দেখো যেন বাগানে গিয়ে বাবুর্চিখানা থেকে ডিম-টিম খেয়ে এস না।" বৌঠানও আমাদের সঙ্গে ইতুপুজো করত। ইতুর কথা শুনে তবে জল খেতুম। আমি দুর্গানাম লেখা সেরে আমার টাস্ক করতে বসতুম। পড়া শেষ হলে বাগানে খেলতে নেমে যেতুম। সবাই ততক্ষণে উঠে পড়ত। খেলার পর দাসীরা ধরে নিয়ে আসত। বলত চান করবার সময় হল, আর খেলতে হবে না।"

দোলের দিন আমাদের সকাল থেকেই তোড়জোড় চলত। পিচকারী রং আসছে। আগের দিন ঠাকুরের পুজোর চাচর হত। খড়ের মানুষ করে বাগানে রেখে আগুন দেওয়া হত। আমরা বাইরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখতুম। তার পরদিন বারোটা অবধি আবির খেলা হত। বাগান, বাড়ি লাল হয়ে যেত। বোতল বোতল গোলাপ জল ঢেলে রং গোলা হত। আমাদের খেলার পরে মেয়েদের, বাবা-কাকাদের খেলা শুরু হত। খেলা শেষ করে খেতে তিনটে চারটে বেজে যেত। পাড়ার এবাড়ি ওবাড়ির অনেকেই আসতেন। বড়দাদার বিয়ের বছর খুব ধুম করে খেলা হয়েছিল। খেলার পর খাওয়াদাওয়া চলত। তারপর সন্ধ্যের সময় বসে গানবাজনা হত। সকলে বাড়ি ফিরতে রাত এগারটা বেজে যেত। বড়দাদা মারা যাবার পরে আর সেরকম আনন্দ হত না। আমাদের সময় মেয়েজামাইরা আনন্দ করছে দেখেই মা-বাবারা আনন্দ পেতেন। আমরা যা আবদার ধরেছি তাই দিয়েছেন। দোলের পরের

দিন আবার দরোয়ানদের দোল দেখার নিমন্ত্রণ হত। সেদিনও যেতুম। গাড়িবারান্দার নীচে দরোয়ানেরা বসে। তাদের যত বন্ধুবান্ধব আসছে। আবির দিচ্ছে, এক লোটা সিদ্ধি দিয়ে খাতির করছে। সারাদিন গান গাইত, আর ঝনাৎ ঝনাৎ বাজনা বাজাত। বাবা তাদের আনন্দ দেখতে ভালবাসতেন। ঝবার কাছ থেকে দশ টাকা নিত, তাই দিয়ে দুজন নাচওয়ালীকে আনত। রাত দশটা অবধি নাচ চলত। তারপরে আমরা খাওয়াদাওয়া করে বাড়ি যেতুম।

বড়পিসীর বড় মেয়ে ক্ষুদিদিদির (অমিয়বালা) বিয়ে হয় নিত্যরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের ছেলে নিখিলরঞ্জনের সঙ্গে। বড়পিসীর মেজ মেয়ে প্রতিমাদিদির প্রথম বিয়ে হয় বাবার ছোট-পিসীর ছেলে নীরদনাথ মুখোপাধ্যায়ের ছোটছেলে নীলানাথের সঙ্গে। বিয়ের সময় প্রতিমাদিদির বয়স ছিল মাত্র এগার বছর।

আমার ঠিক মনে নেই, বোধহয় বাংলা ১৩১০ সালের ফাল্গুন মাসের মাঝামাঝি প্রতিমাদিদির ফুলশয্যার নিমন্ত্রণ ছিল। সেইদিনই দিদির প্রথম মেয়ে সুমনা জন্মায়। মা দিদিকে রেখে যেতে পারলেন না। আমি গিয়েছিলুম। বেনেপুকুরে ওর শ্বশুরবাড়ি ছিল।

ফাল্গুন মাসে বিয়ে হল। বিয়ের অনুষ্ঠান সব চুকে গেলে চৈত্রমাস পড়ে যাবে বলে বড়পিসী ওকে আগেই নিয়ে এলেন। বৈশাখ মাসে গরমের সময় ওর শ্বশুরবাড়ি থেকে সকলে গঙ্গার ধারে মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বাগানবাড়ি 'সুরধুনী কাননে' বেড়াতে যান। ভাল দিন দেখে প্রতিমাদিদিকেও নিয়ে গেলেন। সেখানে দশদিন কি বারদিন হবে গেছে, হঠাৎ একদিন খবর এল, নীলানাথকে পাওয়া যাচ্ছে না।

দিদিমা হলে শুয়ে আছেন। তখন বেলা দুটো কি তিনটে হবে। বাবা এসে দিদিমাকে বললেন, "নীলানাথ গঙ্গায় চান করতে নেমেছিল। আর পাওয়া যাচ্ছে না। কি ব্যাপার বুঝতে পারছি না। আমরা তিনজনে যাচ্ছি, দেখে আসি কি হল।"

ফিরে এসে বললেন, "একটা ছোঁড়া চাকরকে সঙ্গে নিয়ে নদীতে সাঁতার শিখতে গিয়েছিল। সকলে বারণ করে, কিন্তু কারও কথা শোনেনি। নদীতে বান আসার কথা জানত না। হঠাৎ বান আসতে ডুবে যায়। চাকরটা উঠেছিল, ও উঠতে পারেনি, তলিয়ে গেছে। ডুবুরী নামিয়ে যখন তোলা হল তখন আর প্রাণ নেই।" প্রতিমাদিদির কাছে শুনেছিলুম ও আর নীলানাথের ভাই নরনাথের মেয়ে তনুজা ছাদ থেকে দেখছিল। এগারটার সময় নীলানাথ

চান করতে গেল। ওরা দেখছে সে সাঁতার কাটছে, ডুব দিল। আর উঠল না। ওরা ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি নীচে এসে খবর দেয়। তক্ষুনি খোঁজ শুরু হল। মারা যাবার পরে দেহ খুঁজে পাওয়া যায়। নিয়তি যাকে টানছে তাকে বাঁচাবে কে!

তারপর নিজের জীবনের সুখ, আনন্দ গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দিয়ে আবার মায়ের সন্তান মায়ের কোলে ফিরে এল। শ্বশুরবাড়ি থেকে অপয়া অপবাদ দিলেও মা অপয়া সন্তানকে ফেলতে পারলেন না।

এরপর পাঁচ বছর প্রতিমাদিদি বড়পিসীর কাছেই ছিল।

দিদিমা মারা যাওয়ার পর রথীকাকা বিলেত থেকে ফিরে এলে রবিদাদা (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর) বাবাকে বললেন, "তোমাদের উচিত প্রতিমার আবার বিয়ে দেওয়া। বিনয়িনীকে বল যেন অমত না করে। ওর জীবনে কিছুই হল না ' ⌐ বয়সে চারিদিকের প্রলোভন কাটিয়ে ওঠা মুস্কিল। এখন না হয় মা বাপের কাছে আছে। এর পরে ভাইদের সংসারে কৃপাপ্রার্থী হয়ে থাকবে সেইটাই কি তোমাদের কাম্য? না বিয়ে দেওয়া ভাল, সেটা বুঝে দেখ।"

তখন বড়পিসী বলেন, "আমাকে যে সমাজে একঘরে ঠেলবে! আমার আরও ছেলেমেয়ে আছে, তাদের বিয়ে দিতে হবে।"

বাবা বলেন, "তোমাদের ভয় নেই। তোমাদের পিছনে আমি আছি। তোমায় সমাজ ত্যাগ করলে আমিও সমাজ ত্যাগ করব। তাই বলে একটা বাচ্চা মেয়ের জীবন এভাবে নষ্ট করতে দেওয়া যায় না। আর বাইরের ছেলে নয়। রবিকাকা রথীর (রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর) সঙ্গে বিয়ে দিতে চান। ঘরের মেয়ে ঘরেই থাকবে। তুমি অমত কোর না। এখন প্রতিমার মত নেওয়া দরকার। তাকে বোঝাতে হবে।"

প্রথমে শুনে ও রাজি হয়নি। বাবা পরে অনেক বুঝিয়ে তবে রাজি করিয়েছিলেন। বলেন, "যা তোর হয়ে গেছে সেটা স্বপ্ন ভেবে নিস্। এখন নতুন জীবন আরম্ভ করতে হবে।"

সমাজকে অগ্রাহ্য করে নিজের বাড়ি থেকে নিজে দাঁড়িয়ে বাবা বিয়ে দিয়েছিলেন। সমাজের বাধা অনেক এসেছিল কিন্তু কিছুই করতে পারল না। সমাজকে মেনে চললে কি লাভ হত বলতে পারি না। দ্বিতীয় যাত্রার ফল প্রতিমাদিদির জীবনে ভালই হয়েছিল।

বড়পিসীর ছোটমেয়ে অর্পণার বিয়ে হয় হেম মজুমদারের সঙ্গে।

(২৪)

বড়দাদার বিয়ের পরেই নতুন করে স্বদেশী আন্দোলনের জোয়ার আসে। বিলিতি জিনিস কেনা চলবে না। সবাই চরকাতে সুতো কাটতে শুরু করে। আমাদের বাড়িতেও চরকা এল। সকলের হাতেই চরকা চলছে। দিদিমার হাতে, মেয়েদের হাতে সুতো কাটা হতে লাগল। বাবা কোথা থেকে একটা পায়ে চালানো চরকা নিয়ে এসে নিজেই চালাতে লাগলেন।

৩০শে আশ্বিন ভোরবেলায় উঠে এ বাড়ি ও বাড়ির বাবুরা মিলে গঙ্গাস্নানে যেতেন। নাটোরের মহারাজা ও আরও অনেকেই সঙ্গে থাকতেন। দাদারাও সকলে সঙ্গে যেত। রবিদাদার বাঁধা গান গাওয়া হত "মিলেছি আজ মায়ের ডাকে", খোল করতালও সঙ্গে থাকত। নাটোরের মহারাজা খুব ভাল খোল বাজাতে পারতেন। সেদিন রাখীবন্ধন আর অরন্ধনের পালা চলত। চিঁড়ে, দই, মুড়কী, কলা দিয়ে ফলার হত, সে এক বিরাট ব্যবস্থা। ধামা ধামা চিঁড়ে, হাঁড়ি হাঁড়ি দই। বাড়িতে লোক ত' কম নয়, সেই পরিমাণে জিনিস আসত। গঙ্গাস্নানের পর কীর্তনের দল যখন বাড়ি ফিরতেন রাস্তার দু'ধারে কাতারে কাতারে লোক দাঁড়িয়ে থাকত। সকলের হাতে রাখী বেঁধে দিতেন। তারাও সকলে চাঁদা দিচ্ছে, কুলি মজুরেরাও একদিনের রোজগার স্বেচ্ছায় দান করছে। কেন না দেশ স্বাধীন হবে। সকলের সঙ্গেই কোলাকুলি হচ্ছে। "বিলিতি কাপড় কিনব না আমরা", "মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে রে ভাই" বলতে বলতে সবাই ফিরে গেছে। সেই টাকাতে জমিদারী থেকে তাঁতী ও তাঁত আনানো হয়। গেঞ্জীর কল বসানো হয় একতলার ঘরে। বাগানে সুতো পাট করা হত। আমরা সব দাঁড়িয়ে দেখতুম খটাখট তাঁত চলছে পিসেমশায়ের অফিসঘরের পাশে।

(২৫)

যখন কলকাতায় ইলেকট্রিক আসে তখন শহরের বড়লোকেরা বাড়িতে ইলেকট্রিক নিতে ভয় পান। লোকে ভাবত বাড়ি ছেঁদা করে আনতে হবে, তারপর হয়ত শক্ লাগাতে পারে, থাক্‌গে নিয়ে কাজ নেই। বাবাই প্রথমে বাড়িতে ইলেকট্রিক আনলেন। তাই দেখে সকলের সাহস হয়। বোধহয়

ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানীর বিজ্ঞাপনের কাজ হয়েছিল বলে বাবাকে টাকা জমা দিতে হয়নি। নতুন জিনিসের প্রতি বাবার ভীষণ ঝোঁক ছিল।

নতুন জিনিস কেনার সখ থাকায় বাবা দোকানে দোকানে খোঁজ রাখতেন। দোকানের মালিকেরাও জানত, কোন কিছু এলেই বাবাকে জানাতে ভুলত না। বিলিতি জিনিস বা দেশী জিনিস সে বিচার করতেন না। বিলিতি জিনিস বর্জন আন্দোলনের আগে খুব বিলিতি জিনিস পছন্দ করতেন বটে, কিন্তু বিদেশী চাল কখনও পছন্দ করতেন না। তিনি খুব সৌখীন লোক ছিলেন তাই বলে অযথা টাকা খরচ করতে ভালবাসতেন না। এমন জিনিস কিনতেন যাতে ছেলেদের খেলা দেওয়া হবে, শিক্ষাও হবে এবং নিজের সখও মেটান হবে। বড় ছেলেদের জন্য একবার একজোড়া লাঠি নিয়ে এলেন। তাতে পা রাখার জায়গা ছিল, তাতে উঠে চলে বেড়ান যেত। নিজে ধরে ধরে ছেলেদের অভ্যেস করিয়ে বাগানে ছেড়ে দিয়ে দেখতেন। যখন বেশ অভ্যেস হয়ে গেল তখন বাড়িতে মিস্ত্রিকে দিয়ে আরও দুটো তিনটে তৈরী করিয়ে দিলেন। এক জিনিস কখনও দুবার কিনতেন না, সেইটা দেখে বাড়িতে তৈরী করতে চেষ্টা করতেন। ছেলেদের ঘুড়ি ওড়ানো দেখে সখ করে বিলিতি ঘুড়ি কিনে ছেলেদের সঙ্গে যোগ দিয়ে ওড়ালেন। গোঁ গোঁ করে ঘুড়ি আকাশে উঠে ছিঁড়ে চলে গেল। তখন ছেলেদের নিয়ে বাড়িতে তৈরী করতে বসে গেলেন। কিন্তু বিলিতি কাঠের মত অত হাল্কা কাঠ দিতে পারলেন না বলে ঘুড়ি উপরে উঠল না। এতে ছেলেদেরও তৈরী করার ঝোঁক চেপে যেত।

তারপর এল সূর্যের ঘড়ি। কাচের বাক্সের ভিতর বালি দেওয়া টেলিস্কোপ এল। দিদিমার ছাদে রেখে সকলকে দেখাতে লাগলেন। সেই সময় ডাক্তার বস নামে এক সাহেব এসে বাবাকে ধরে চাঁদ, তারা, গ্রহ, পৃথিবী কিরকম আকাশে চারদিকে ঘুরছে তার ছবি দেখাবে ও ব্যাখ্যা করে বলবে। অমনি সবাইকে ডাকা হল। একতলার হলে চাদর খাটিয়ে দেখাল ছেলেবুড়ো সকলেরই আনন্দদায়ক।

বাবা সাধারণ সংসারী লোকই ছিলেন, তবে অসাধারণ গুণের অধিকারী তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু তাই বলে তাঁর অলৌকিক শক্তি কিছু দেখা যেত না। তবে ছেলেদের সঙ্গে ছেলেদের মত বুড়োদের সঙ্গে বুড়োদের মত মিশতেই ভালবাসতেন। এরোপ্লেন নিয়ে এসে ছেলেদের সঙ্গে খেলে বেড়াতেন। তখন আমাদের ছেলেরাও হয়েছে। যখন ছেলেরা লুকোচুরি খেলত তখন

তাদের একদলকে বলতেন, "আমার চৌকীর পিছনে লুকিয়ে থাক্।" বড় চেয়ারে বসে আঁকতেন। কেউ তার পিছনে দেখতে পেত না। আবার অন্য দলকে ইশারায় বলে দিতেন, "আমার পিছনে আছে।" তারা ছুটোছুটি করত, বাবা মজা দেখতেন। নিজে এক মনে ছবি আঁকতেন আর মুখ টিপে টিপে হাসতেন। ছোটকাকা পাশে বসে আঁকছেন আর ছেলেদের উপর বিরক্ত হচ্ছেন। বাবা কিন্তু বিরক্ত হতেন না, ছেলেদেব নানান হাবভাব দেখে কত রকম ছবি আঁকতেন। ছোটকাকা ছেলেদের বকতেন। বুঝতে পারতেন না যে দাদা শিখিয়েছেন। বাবা চুপ করে এঁকে যাচ্ছেন। বাবার ধ্যান ভঙ্গ হবার আগেই ছেলেরা তখন হাওয়া হয়ে গেছে।

কত জিনিস যে বাবা এনেছেন তার হিসেব করা শক্ত। অত বড় পরিবারের কর্তা হয়ে দেখতেন কার কোন্ জিনিসেব সখ আছে, পেলে খুশী হবে। নতুন রকম জিনিসটি খুঁজে পেতে এনে তার হাতে দিয়ে নিজেও আনন্দ পেতেন। মা জল বেশী খেতেন তাই নতুন বকমের ঘটি এনে দিলেন। মা যতদিন বেঁচেছিলেন তাতেই জল খেতেন। একবার দই পাতার জন্য তামাব উনুন আনলেন। দুধের জারে গবম দুধ দিয়ে তলায় বাতি জ্বেলে দিলে দই জমে যেত। বাবা রোজ দই খেতেন। শীতকালেও সেই দই শক্ত হয়ে যেত।

একবার চিনিদানাব মত আমসত্ত্ব এনে আমাদের খেতে দিলেন। চমৎকার খেতে। একবার চিজ নিয়ে এলেন। ছানা চটকানর মত। সবাই পচা গন্ধ বলে ফেলে দিল, কিন্তু আমার খুব ভাল লেগেছিল। আমি কনকদাদা ও বাবা তিনজনে খেয়েছিলুম। বাবা বলেন কে দিয়েছে "খুব ভাল জিনিস। ফেল না. আমরা খাব। যাদের গন্ধ লাগবে তারা খাবে না। ঐ জিনিস যত পুরনো হবে তত ভাল।"

কত বলব। সংসারের ব্যবহারের জিনিস, খাবার, কাপড, খেলনার শেষ নেই। নতুন বকম দেখলেই কিনতেন। নিজের সখ মিটে গেলে অন্য লোককে দান করে দিতে কৃপণতা করতেন না। যখন কেউ বলত কোনও জিনিস নতুন এসেছে, আমাদের কাছে তখন তা পুরনো হয়ে গেছে। দিদির বিয়ে হয়ে গেলে একবার আমি একলা বাবার সঙ্গে দোকানে গিয়েছিলুম। শো-রুমে একটা সাত আট বছরের মেয়ের মত বড় বিবি পুতুল সাজান আছে দেখে বাবাকে বললুম, "ঐ পুতুলটা দাও।" বাবা বললেন, "আজ আর হবে না টাকা ফুরিয়ে গেছে। পরে হবে।" আমি নেভি স্টোর, হোয়াইট্যাওয়ে

লেডল, হগ সাহেবের বাজারে ঘুরে ঘুরে দেখে বেড়াতেন। দরকার মত জিনিস দেখলে কিনতেন। কি সব টুকিটাকি জিনিস কিনলেন। ইচ্ছে থাকলে সাহেবকে বলতেন, প্যাক করে গাড়িতে তুলে দিতে, পরে টাকা দিতেন। এমন কত দিন করেছেন। কিন্তু সে দিনে আমার সামনে কিনলেন না। পরে একদিন সেই পুতুলটা কিনে এনে দিদিমার কাছে দিয়েছেন। আমি তখন পুতুলের কথা ভুলে গিয়েছি। হঠাৎ দিদিমা আমাকে ডেকে পাঠাতে আমি ভয়ে ভয়ে গেছি। কেন ডেকেছেন, কিছু অন্যায় ত করিনি, মনে মনে ভাবছি। তখন আমারও বয়স সাত আট হবে। গিয়ে দেখি দিদিমার কোলের কাছে শোয়ান কাপড় চাপা একটা কি রাখা আছে। দিদিমা আমাকে বললেন, "ঢাকাটা খুলে দেখ ত, কি আছে?" আমি ঢাকা খুলে দেখি সেই বড় পুতুলটা রয়েছে। আমি ত অবাক। নিশ্চয় বাবা এনে দিদিমার কাছে রেখেছেন আমাকে ঠকাবেন বলে। আমি পুতুল পেয়ে খুশী হয়ে বাবার কাছে ছুটলুম। বাবা বললেন, "এ কি, কোথায় পেলে?" আমি বলি, "দিদিমার কাছে ছিল। তুমি এনেছ।" বাবা বললেন, "না, আমি ত আনিনি। বোধ হয় স্যান্টাক্লস্ দিয়ে গেছে।" ছেলেদের সঙ্গে মজা করা অভ্যাস ছিল। দিদিমা আমাকে বললেন, "তুই অত বড় পুতুল তুলতে পারবি?" আমি বললুম, "হাঁ, পারব।" তখন বোধহয় ক্রিস্মাসের সময় ছিল।

(২৬)

বড়দাদার বিয়ের পরের বছর বৈশাখ মাসে প্রতি বছরের মত বাড়ি ভাড়া করে যাওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছিল। কিন্তু সেবার কিছুতেই বাড়ি পাওয়া যাচ্ছিল না। অনেক খোঁজাখুঁজি করে সার্কুলার রোডে একটা খুব বড় বাড়ি পাওয়া গেল বোধহয় কোন রাজার বাড়ি। উপরে ছ-খানা নীচে পাঁচখানা ঘর, বাথরুম চারটে। কিন্তু রাজার দরোয়ান বলেন, "একটা বাথরুম আর ঘর বন্ধ থাকবে। রাজার জিনিস আছে।" বাবা বললেন, "তাহলে ত কুলোবে না। ছেলেপুলে বেড়েছে, গুপুর বিয়ে হয়েছে। একটা ঘর বেশী দরকার। মেয়ে জামাই গিয়ে পড়লে কোথায় শোবে? কি আর করা যাবে। অন্য বাড়ি পাওয়া যাবে না যখন এবার না হয় বাড়িতেই থাকা যাক। সকলেই ত থাকছে। এখন প্লেগ অনেকটা কমে গেছে।"

দিদিমা বললেন, "না, তা হবে না। গরম পড়ে গেল। ঐ

বাড়িই ঠিক করা। বড় হল আছে, কুলিয়ে যাবে। ছেলেমেয়েরা এক ঘরে শোবে।"

তাই ঠিক হল। মেজকাকার পরিবার বেশী, বড় হলটায় কুলিয়ে যাবে। বাবা গাড়িবারান্দার উপরের ঘরে থাকবেন। দিদিমার ঘরের পাশে বড়দা থাকবে। সেইদিকে দুটো বাথরুম ছিল। আর একটা বন্ধ রইল। ছোটকাকা একতলার ঘরে রইলেন। নীচের হল বসবার ঘর হিসেবে রইল, লোক আসা-যাওয়া করবে। নীচে দুটো বাথরুম, একটা সবাই ব্যবহার করত, আর একটা ছোটকাকার ছিল।

বাড়ি হাতছাড়া করা হবে না। সেই মাসেই যেতে হয়। অথচ চৈত্রমাসে বাড়ি ছাড়তে নেই। বাবা ওসব মানতেন না। বললেন, "যত তোমাদের কুসংস্কার ছাড়। লোকজন সব আজই খাওয়াদাওয়া সেরে চলে যাক। আমরা চারটের সময় যাব। রাত্তিরের খাওয়ার ব্যবস্থা সেখানে গিয়ে হবে।"

তাই হল। তাড়াতাড়ি সব চলে গেলুম। সেখানে তো কোনরকমে চটপট সব সেরে শুয়ে পড়া গেল। তারপর শোনা যেতে লাগল, এ বাড়িতে ভূত আছে। চাকর দাসীরা নানান গল্প বলতে লাগল। বলে, "তাই এ বাড়ি ভাড়া হত না। রোজ রাতে দেখি সাত আট বছরের একটি মেয়ে বাগানে দৌড়ে পালায়।"

এর মধ্যে একদিন নেলীদিদি সেখানে গেল। নির্মলদাদাও সঙ্গে যায়। কি হবে? কোথায় থাকবে? বন্ধ ঘরটায় দরজায় একটা মস্ত বড় তালা লাগানো ছিল। মা বললেন, "দাঁড়াও, দেখি কারও চাবি দিয়ে খোলে কিনা।" ভাঁড়ারের বড় তালার চাবি দিতেই খুলে গেল। মা বললেন, "দিনের বেলা বন্ধ থাকবে, রাত্রে বিছানা পেতে শোবে। তা হলে দারোয়ান দেখতে পাবে না। রাজার জিনিসে কেউ হাত দেবে না।" চাকরদের দিয়ে একপাশে সব জিনিস সরিয়ে পরিষ্কার করে বিছানা পেতে দিলেন! ভুতুড়ে বাড়ির যেমন গল্প শোনা যায় ঠিক তাই। অতবড় ঘরে ভাঙা দুখানা চেয়ার, একটা সেক্রেটারিয়েট টেবিল, একখানা বই, একটা দোয়াত-কলম, একটা কারপেট —এই রাজার জিনিসের নামে ঘর বন্ধ করা হয়েছে। গুছিয়ে রাখতে ঘর খালি হয়ে গেল। বাড়ির কিছু দোষ নিশ্চয়ই ছিল, যার জন্য ভাড়াটে আসত না। পরে সে কথা জানা যায়।

সকলের মুখে শোনা যেতে লাগল রকমারী গল্প। নেলীদিদি বললে, "অনেক রাত্রে মেজজ্যাঠার মত কে বেড়িয়ে বেড়ায়। ডাকলে সাড়া দেয় না, মিলিয়ে যায়।" বাবা শুনে বললেন, "তোমরা যেখানে যাবে সেখানেই ভূত দেখবে। দাসীদের বোলো ঐ সব গুজব না রটায়।" ভয়ে সবাই চুপ করে গেল, আর কিছু বলত না। কিন্তু দরোয়ানের কানে যেতে সে এসে বলে, "ঘর খুলে অন্যায় করেছেন। রাজা জানতে পারলে আমার জরিমানা হবে।" তখন সে আবার তালা লাগিয়ে দিয়ে যায়। কিন্তু সে চলে গেলে মা আবার তালা খুলে দিলেন।

পনের দিন বাদে বড়দাদার হঠাৎ কান কটকট করে জ্বর এল। তারই মধ্যে ছোটকাকা একদিন খাটে শুয়ে দেখছেন কে খড়খড়ি ধরে টানছে। তাঁর ঘরের পিছনে মাঠ ছিল। যেমন বলেছেন, "কে রে?" দেখেন কে যেন ছুটে মাঠের দিকে চলে যাচ্ছে। উনি ভেবেছিলেন চোর-টোর হবে। জানলা খুলে দেখতে গিয়ে দেখেন সাত আট বছরের একটি সাহেবের মেয়ে বাগানে নেমে মিলিয়ে গেল।

এদিকে বড়দাদার কানের যন্ত্রণা বেড়ে চলেছে। জ্বর মোটে ছাড়ছে না। ডাক্তার মহেন্দ্রবাবুকে ডেকে পাঠান হল। তিনি ভাবলেন, "গুপুর কানের ব্যথা ত ছোটবেলা থেকেই আছে। দিদিমার আদরের নাতি। অল্পতেই ব্যস্ত হল। পরে আসবেন বলে ওষুধ পাঠিয়ে দিলেন। তাতে কিছু হল না, আরও বেড়ে গেল। বেহুঁশ জ্বর। তখন বাড়ির গাড়ি দরোয়ান পাঠিয়ে ডাক্তারকে ডেকে আনা হল। তিনি এসেও জ্বর কমাতে পারলেন না। সাহেব ডাক্তার, বাঙালী ডাক্তার, কলকাতার বড় বড় ডাক্তারেরা এলেন। জ্বর আর কমে না। তখন মাথায় পুঁজ উঠে গেছে। অজ্ঞান, অচৈতন্য। জানা গেল সেপ্‌টিক্ হয়ে গেছে। তখনকার যা চিকিৎসা সবই হল। বাথটবে জল দিয়ে ডোবান হচ্ছে, কিন্তু জ্বর নামান যাচ্ছে না।

এই সময় একদিন রাতে মেজকাকার ঘরে হঠাৎ হুড়মুড় করে জিনিস পড়ে যাওয়ার শব্দ হল। সবাই দৌড়ে গিয়ে দেখা গেল কিছুই পড়েনি। সকালে দেখা গেল কুঁজো যেমনকার তেমনি বসানই আছে, অথচ জল পড়ে যাচ্ছে। আর শামাদান বসান, অথচ ফানুসটা পড়ে ভেঙে গেছে। সকলে ভয় পেল। একী ব্যাপার! বাবা কিন্তু ভূতের কথায় কান দিলেন না। বললেন, "ও বেড়ালে ফেলেছে।"

আর একদিন রাতে মা জেগে বসে আছেন, নিচুর মা সিঁড়ির ল্যাণ্ডিং-এ বিছানা করে শুয়ে আছে, বরফ দরকার হলে ভেঙে আনছে। নির্মলদাদা সেই ভূতুড়ে ঘরে শুয়ে আছে। আগের দিন তার পেট খারাপ হয়েছিল, বার বার বাথরুমে যাচ্ছিল। অনেক রাতে সিঁড়িতে চটির আওয়াজ পেয়ে মা মনে করলেন নির্মলদাদা নেমে যাচ্ছে। মা ডেকে বলছেন, "নির্মল, নীচে কেন যাবে? উপরে আমাব বাথরুমে যাও।" তত বলছেন সে সাড়া দিচ্ছে না, চলে যাচ্ছে। মাও ঘব থেকে বলে যাচ্ছেন, "নিচুর মা, দেখ নির্মল নীচে যাচ্ছে। আলোটা দেখা।"

নিচুর মা বললে, "আমাকে ডিঙিয়ে জামাইবাবু চলে গেল। বললুম, জামাইবাবু দাঁড়াও, আলোটা দেখাই। সাড়াও নেই, শব্দও নেই, চলে গেল।" সে উঠে দেখে কেউ কোথাও নেই। মা তখন বললেন, "দেখ্ ত, নির্মল কোথায়।"

ঘরে গিয়ে দেখে নির্মলদাদা শুয়ে আছে। তার পরদিন বাবাকে বলতে বাবা বললেন, "তোমরা রাত জেগে ঘুমের ঝোঁকে ও সব ভুল দেখেছ।"

দিদিমা তখনই পালিয়ে আসতে চাইলেন। বাবা কিছুতেই শুনলেন না। বড়দাদার আরও বাড়াবাড়ি হল। নীচের ঘবে পাঁচ ছজন ডাক্তারের পরামর্শ খাওয়াদাওয়া চলতে লাগল। আর উপরের ঘরে রোগীর ব্যবস্থা হচ্ছে। আমাদের ও বৌঠানকে আব সে ঘরে যেতে দিচ্ছেন না। কিন্তু কোনও ফল হল না। সকলে বেলায় শুনি শ্বাসটান হচ্ছে। তখন আমাদের নিয়ে একবার দেখালেন। তার পবেই সব শেষ হয়ে গেল। তখন বাবার কি কান্না! আমাকে জড়িয়ে ধরে ছেলেমানুষের মত ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন। দিদিমা, মাও কাঁদছেন। কে কাকে সান্ত্বনা দেবে! তবু মায়েব মনের জোর ছিল। নিজেই সামলেছিলেন, বাবাকে, আমাদের দেখতে হবে বলে। পনেব দিনের ভিতরেই সব শেষ করে বাড়িতে ফিরে এলেন। যেমন বড়দাদার বিয়ের সময় আনন্দ করে বৌ নিয়ে এসেছিলেন, তেমনই ছেলেকে বিসর্জন দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি ফিরলেন।

কিন্তু মন কিছুতেই শান্ত হয় না। বিধবা বৌ সামনে ঘুরছে দেখে আরও যন্ত্রণা হচ্ছে। তবু মেয়েদের চেয়ে আদর কম ছিল না। মেয়ের মতই কাছে কাছে থাকত। শোক সামলাতে পারছেন না দেখে অনেকে বললে, "বাড়িতে কথকতা দিন মন শান্ত হবে।"

কণ্ঠীগলায় কথকঠাকুর এলেন। বোধ হয় নবদ্বীপের লোক। নাম ক্ষেত্রমোহন ঠাকুর। কালো, মোটা, নাদুসনুদুস চেহারা। সন্ধ্যে থেকে কথকতা চলত। এবাড়ি ওবাড়ির সকলে, পাড়া-প্রতিবেশীরাও আসত। তাঁর বলার ধরন এমন চমৎকার ছিল যে সকলেই মুগ্ধ হয়ে শুনত।

বাড়িতে ফিরে আসার পর লোকজনের মুখে শোনা গেল রাজার বাড়ির দরোয়ান বলছে, "এ বাড়ি ভাড়া নিয়ে অন্যায় করেছেন। যারাই এখানে এসেছে কেউ থাকতে পারেনি। কিছুদিন আগে এক সাহেব ভাড়াটে এসেছিল। তার একটি সাত আট বছরের মেয়ে ঐ ঘরে মারা যায়। মারা যাবার পর অনেকেই তাকে দেখতে পায়। সেই জন্যই রাজা ঐ ঘরটা বন্ধ করে রাখেন। তাই আমি ঘরটা বন্ধ করেই রেখেছিলুম। ওঁরা শুনলেন না।"

তখন আর শুনে কি হবে যা হবার তা তো হয়েই গেছে। সেই থেকে আর বাড়ি ছেড়ে কোথাও যাওয়া হত না। দিদিমা বলতেন, যে ভয় করে পালানো তাই যখন হল, তখন আর কোথাও যাব না। যা হবার এখানেই হবে।"

বোধহয় ছ'মাস ধরে কথকতা হয়। তারপর শীতের মুখে রবিদাদা বললেন, জমিদারীতে একজন কীর্তন গায়। তার নাম শিবু। ভারী চমৎকার তার গান। আনিয়ে শোন, ভাল লাগবে।"

তখনই আনানো হল। বেঁটেখাটো মানুষ, মোটা ভুঁড়িআছে, মাথায় টাক, রং খুব ফর্সা নয়। কোমরে কাপড় বেঁধে যখন আসরে নেমে গান ধরত সকলে বাহবা না দিয়ে পারত না। সে কি হাত পা মাথা নেড়ে জটিলা কুটিলার ঝগড়া করত।

বড়দাদা মারা গেলে কোথাও যদি তাকে খুঁজে পাই এই ভেবে চারদিকে ঘুরে বেড়াতুম। মা বলতেন, "সে স্বর্গে গেছে। আর আসবে না।" আমি ছাদে গিয়ে আকাশের দিকে চেয়ে থাকতুম, যদি মেঘের ভিতর দেখতে পাই। মেঘে ত কত রকম ছবি ফোটে! যখন কিছুই দেখতে পেতুম না, মনের দুঃখ মনেই চেপে চলে আসতুম। কেউ জানতে পারত না। এইভাবে কতদিন কেটে গেছে তারপর কথকতা, কীর্তনের হাওয়া এসে আমার মনকে কখন ভুলিয়ে দিয়েছে বুঝতেও পারিনি।

এইসময় থেকেই বাবারও মনের পরিবর্তন হয়। তখন থেকেই নিজেকে

যেন সম্পূর্ণভাবে ছবির মধ্যেই ডুবিয়ে দিলেন। কথকঠাকুর ক্ষেত্রমোহন ও শিবু কীর্তনীয়ার ছবি এঁকেছিলেন। সে সব ছবি নষ্ট হয়ে যাওয়ায় দেখানো গেল না। কিন্তু আমার স্মৃতিপটে তার ছাপ এখনও স্পষ্ট আছে। সেই সময় থেকে বাবা চৈতন্যের ছবি আঁকতে শুরু করেন। তা ছাড়া নানারকম ল্যাণ্ডস্কেপ, বাড়ির বাগানের দৃশ্য, গাছের ফাঁকে ফাঁকে এবাড়ি ওবাড়ির বারান্দা দেখা যাচ্ছে—এই সব ছবিও এঁকেছিলেন।

(২৭)

আমার যখন এগারো বছর বয়স সেই সময় ওকাকুরা এবং আরও দুজন জাপানী আর্টিস্ট এসে দিনকতক আমাদের বাড়িতেই ছিলেন। সেই সময় সিল্কের উপর রামায়ণ মহাভারতের গল্পের ছবি তাঁদের দিয়ে আঁকানো হয়। শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা, কৃষ্ণার্জুনের যুদ্ধযাত্রা রাবণের সীতাহরণ, পুষ্পকরথে পলায়ন, অশোক বনে সীতার বিলাপ, সীতার অগ্নিপরীক্ষা ইত্যাদি অনেক ছবিই তাঁরা এঁকেছিলেন। বাবা কাকারা থেকেই তাঁদের গল্প বলে বুঝিয়ে দিতেন। সেই সময় তাঁরা বাঙালীদের কাপড় পরবার ধরন, বসা, হাবভাবে বুঝতে না পারায় আমাকে দিশীভাবে কাপড় পরিয়ে বসিয়ে তাঁদের বুঝিয়ে দিলেন সীতার ছবি কেমন হবে। তখনই দেখেছিলুম কত তাড়াতাড়ি তাঁদের হাত চলছে। দু তিনদিনের মধ্যেই এক একটা ছবি আঁকা হয়ে যেত। তাঁরা দুটো হাঁটু মুড়ে বসতেন, কালো পালিশ করা বাটিতে খেতেন। কতকগুলো বাটি বাবাকে দিয়েছিলেন, দেখতে ঠিক কালো পাথরের মত। বাবা দিনকতক সেই বাটিতেই খেতেন। ওঁদের মত হাঁটু মুড়ে বসতে চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু পারলেন না।

জোড়াসাঁকোর পরিবারের বিশেষত্ব ছিল। সকলের দেখে নকল করতেন না। নিজেরাই নতুন ফ্যাশন বের করবার চেষ্টা করতেন। তাঁদের দেখেই অন্য সকলে শিখত। আজকাল যেভাবে কাপড় ঘুরিয়ে পরা ফ্যাশন হয়েছে, আগে সেরকম ছিল না। আগে ছিল বোম্বাই দস্তুর। বালিগঞ্জের মেজদিদিই (সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনী) প্রথম দেশী ধরনে কাপড় ঘুরিয়ে পরবার ফ্যাসন চালু করেন।

ছেলেদের জন্য বাবা একটা ক্লাব করেছিলেন। পাছে বাইরে মিশে খারাপ হয়ে যায়, তাই বাড়িতে শত ঠাকুর পরিবারের ছেলেদের নিয়ে ক্লাব হয়।

তার নাম দিয়েছিলেন 'মিলনী'। ছেলে—জামাইদের দিয়ে থিয়েটার করাতেন। তাতে আমার বড় ভগ্নপতি সাজত, সে খুব ভাল করত। প্রথম 'জুলিয়াস সীজার' হয়। খুব ভালই হয়েছিল। রবিদাদার 'বৈকুণ্ঠের খাতা' হয়। আর একবার 'অলীকবাবু' করেছিল। কমিক পার্ট ক্ষীরোবাবু নিত, খুব চমৎকার হত। ক্ষীরোবাবু ছিল নির্মলদাদার ভগ্নীপতি। রিহার্সালের সময় বাবা কাকারা তিনভাই মিলে দেখিয়ে দিতেন ও ভোগ করতেন। আমরাও সে আনন্দের কিছুটা উপভোগ করা থেকে বাদ যেতুম না। তখন আমাদের মধ্যে অনেকের বিয়ে হয়ে গেছে।

এর আগে মনে আছে 'বৈকুণ্ঠের খাতা' বাবারাও একবার করেছিলেন। অক্ষয়বাবু অবিনাশ সেজেছিলেন। তিনিও কমিক পার্ট খুব ভাল করতেন। অক্ষয়বাবু মারা গেলেও তাঁর স্ত্রী ও মেয়ে আমাদের বাড়িতে আসতেন।

থিয়েটারের সময় পরিবারের সব বাড়িতে নিমন্ত্রণ করা হত। নীচের বড় বিলিয়ার্ড ঘরে স্টেজ বাঁধা হত।

কনকদাদা থিয়েটারে খুব ভাল অভিনয় করত। যেমন বাবাও করতেন, তেমনি কনকদাদাও কম যেত না। একবার রবিদাদার 'ভৈরবের বলি' অভিনয় হয়। বাবা রাজা সেজেছিলেন, কনকদাদা শঙ্কর সেজেছিল। বাবা ও ছেলের অভিনয় দেখে অনেকেই চোখে জল রাখতে পারেনি।

একবার রবিদাদার 'বাল্মীকি প্রতিভা' নাটক হয়েছিল এমপায়ার থিয়েটার ভাড়া করে। টিকিট করে টাকা তোলা হয়েছিল, ভূমিকম্প না বন্যার জন্য, ঠিক মনে নেই। আমাদের ছেলেরাও ডাকাত সেজেছিল। হাসি লক্ষ্মী সাজে। বাবা সাজ-পোশাক ও স্টেজ সাজানোর ভার নেন। কাকা দাদারাও ছিলেন। বাবা কাকারা যা কাজ করতেন তিন ভাই একজোটে মিলেই থাকতেন। লক্ষ্মীকে এমন সাজিয়েছিলেন যে যখন ড্রপসিন উঠল তখন সবাই ভেবেছিল মাটির পুতুল কিন্তু যখন গান গাইতে গাইতে পাহাড়ের উপর থেকে নেমে আসে সকলে অবাক হয়ে গিয়েছিল।

আর একবার 'ডাকঘর' হয়। রবিদাদার লালবাড়ির হলে স্টেজ বাঁধা হয়েছিল। সেবারেও টিকিট করা হয়েছিল। বাবা 'পিসেমশায়' সেজেছিলেন, ছোট কাকা মোড়ল সেজেছিলেন। খুব টিকিট বিক্রী হয়েছিল। টিকিটের জন্য মারামারি করে লোকে দাঁড়িয়ে দেখেছে, শেষ মুহূর্তেও একশো টাকা দিয়ে টিকিট কিনেছে। তিন ভাইয়ের অ্যাক্টিং খুব চমৎকার হয়েছিল।

আমি বাবার ঘরের জানলা থেকে দেখেছিলুম। শ্বশুরবাড়ির আপত্তি থাকায় বিয়ের পর আর ও বাড়িতে যেতুম না বলে যাওয়া হয়নি।

যখন স্টারে 'চিরকুমার সভা' ও গৃহ প্রবেশ' অভিনয় হয় বাবা কাকারা তিন ভাই এবং রবিদাদা নিজে ডিরেক্শন দিতে যেতেন। দিনুদাদা গান শেখাতে যেত। বাবার মুখে শুনতে পেতুম, "পুরুষদের মধ্যে ত' ভাল ভাল অ্যাক্টর আছে। দেখিয়ে দিতে বেগ পেতে হয় না। কিন্তু মেয়েদের ভিতর একটাও ভাল অ্যাক্ট্রেস্ নেই, গানের গলাও নেই অনেক দেখে একজনকে বেছে নেওয়া হয়েছে, যে রবিকার গান দিনু শেখালে গাইতে পারবে বলে মনে হয়।" সে নীহারবালা। নীহারবালা সেই সময় রবিদাদার গান গেয়ে নাম করে ফেলে। বাবা 'চিরকুমার সভা' আর 'গৃহ প্রবেশে-র সিন এঁকে দিয়েছিলেন।

একবার বাবারা তিনভাই 'রাজা' থিয়েটার করেন। বাবা রাজা সাজেন, মেজকাকা মন্ত্রী সেজেছিলেন, ছোটকাকা বিদূষক সাজেন। কনকদাদা ছবি তুলেছিল। ভাল হয়নি বলে ফেলে দিলে আমি সেটা কুড়িয়ে এনেছিলুম, তাই এখনও দেখতে পাচ্ছি।

নবু ইদানীং বাবার সঙ্গে সঙ্গে থেকে সব কিছুই করতে পারত। থিয়েটার হলেই ছোটকাকা নবুকেই সঙ্গে রাখতেন। নবুরও ছবি আঁকার হাত খুব ভাল ছিল। বাবার জোব্বা পরা ছবিটা সেই এঁকেছিল। ইদানীং বাড়িতে বিয়ে হলেই আলপনা দেওয়া, বাড়ি সাজান, খাবার জায়গা করা, লোক খাওয়ান সব নিজের হাতে করত। খুব খাটতে পারত। বাবা কিংবা কনকদাদা নিজেরা অত খাটতে পারতেন না। বড় মানুষের ছেলে বলে ও কোনও জাঁক ছিল না। বড় ভাইকে খুব ভালবাসত, কখনও বড় ভাইয়ের মুখের উপর কথা বলতে পারত না। কেউ যদি তাকে মারে, মার খেত, তবু মারতে পারত না।

(২৯)

একবার দিদিমার দিনকতক শখ হয় গঙ্গায় চান করতে যাবেন। কাছেই গঙ্গা। পাণ্ডব বেহারাকে ডাকিয়ে পাল্কী আনার ব্যবস্থা করলেন। মা, কাকীমারা, ছোটপিসী সকলেই এক এক পাল্কীতে উঠতেন। সঙ্গে আমাদের ছোটদের একজনকে নিতেন। তখন মেয়েদের বাইরে বেরোন রেওয়াজ

ছিল না বলে লাল মোটা মশারির মত একটা ঘেরাটোপ তৈরী করিয়েছিলেন। সেটা পাল্কীর ভিতরেই থাকত। পাল্কীতেও লাল শালুর ঘেরাটোপ ঢাকা। সঙ্গে দরোয়ান, দাসীরা কাপড়-গামছা নিয়ে যেত।

আগেকার দিনে পাল্কীশুদ্ধই গঙ্গায় ডুবিয়ে দিত। তারই ভিতর বসে বসে চান করে আসতে হত। দিদিমা বললেন, "তাতে গঙ্গাস্নানের আরাম হয় না। বসে বসে ডুব দেওয়া যায় না।" আলাদা মশারির মত ঘেরাটোপের চার কোণে বেহারারা ধরত ওঁরা পাল্কী থেকে নেমে তার ভিতর ঢুকতেন। আমাদেরও তার ভিতরেই চান করাতেন। আমাদের মজা লাগত। ঘেরাটোপ তুলে দেখতুম বাইরে সকলে হাঁ করে দেখছে। বাইরে থেকে কোন লোক দেখা যাচ্ছে না। তার ভিতর চান করে কাপড় বদলে আবার পাল্কীতে উঠে আসতেন। আসবার সময় ছোট কাঁচের পুতুল, পোড়ামাটির পুতুল—নাকে নথ পরা—কিনে আনতেন। রথের সময় তালপাতার ভেঁপু পাওয়া যেত। ছোট পুতুলগুলোকে আমরা ছেনী পুতুল বলতুম। আমরা সেই ছেনী পুতুলকে আঁতুড়ের ছেলে সাজিয়ে খেলা করতুম ঘরের কোণে খেলাঘর পাতা হত।

(৩০)

ছোটপিসীর মেজ মেয়ে দাশুদিদির (প্রভাবতী দেবী) বিয়ে আমাদের বাড়ি থেকেই হয়, কালীপ্রসন্ন রায়ের ছেলে অভয়পদ রায়ের সঙ্গে। বিয়ের পর জামাই বিলেত চলে যায় ব্যারিস্টারী পড়তে। জামাই ফিরে না আসা অবধি দাশুদিদি এখানেই ছিল। ওকে পড়াবার জন্য একজন বুড়ো মাস্টারমশাইকে রাখা হয়েছিল। অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, খুব যত্ন নিয়ে পড়াতেন। ছোট পিসেমশায় তাঁকে দাশুদিদির জন্যই খুঁজে নিয়ে আসেন। মাস্টারমশায়ের বড়ছেলে মারা যাওয়ায় তিনি ছেলে পড়ানো নিয়ে ভুলে থাকবেন বলে চাকরীতে এসেছিলেন। তিনি বলতেন, "শুধু টাকা নিতে আসিনি।" তিনি ঢাকার লোক ছিলেন। একটু পাগলাটে গোছের ছিলেন। হাতে বড় বড় নখ রাখতেন। দাশুদিদি, অম্বুজাদিদি, হরিদাস তিনজনেই তাঁর কাছে পড়ত। দাশুদিদি শ্বশুরবাড়ি চলে গেলে আমি তাঁর কাছে পড়তুম। আমারও তাঁর কাছে পড়তে খুব ভাল লাগত। ঐ বুড়ো মাস্টারমশায় যেমন যত্ন নিয়ে পড়াতেন, সেরকম অন্য কোনও মাস্টারমশায়ের কাছে পেতুম না।

যতক্ষণ না বুঝতে পারতুম ছাড়তেন না। এক একদিন পাঁচটা বেজে গেলেও পড়াতেন। অন্য মাস্টারমশাইরা চারটে বাজলেই চলে যেতেন। বৃষ্টি বাদলা হলেও তাঁর কামাই হত না। কতবার কলকাতার রাস্তায় চারদিকে জল জমে গেছে, অন্য মাস্টারমশায়েরা আসতে পারেননি। কিন্তু তিনি ঠিক আসতেন। আকাশ অন্ধকার! আমরা বাইরে দক্ষিণের বারান্দায় দাঁড়িয়ে বারচোদ্দজন ছেলেমেয়ে মিলে সমস্বরে "হুড়হুড় দুড়দুড় মেঘ ডাকিছে" কবিতা আওড়াচ্ছি, আর মজা করছি। একটা বেজে গেছে। ভাবছি, আর মাস্টার-মশাই হাঁটুর উপর কাপড় তুলে ছাতা মাথায় বাড়ি ঢুকছেন। বাবা তাঁর জলের মধ্যে দিয়ে আসার ছবি এঁকেছিলেন। বোকাগোছের একটা বেয়ারা ছিল। সে আমাদের খবর দিতে আসত, "দিদিমণি, মাড্‌চারবাবু আয়া"। তাই তাকে দেখলেই আমরা বলতুম, "ঐ রে, বোকা বেয়ারা আসছে। বুড়ো মাস্টারমশাই এসেছেন"। তখন সব আনন্দ উবে যেত। আমরা তিনজন সুড়সুড় করে গিয়ে পড়তে বসতুম।

আমরা বলতুম, "এই বৃষ্টিতে কেউ তো রাস্তায় বের হতে পারছে না। আপনি কি করে এলেন?"

তিনি বলতেন, "ওরে তোরা জানিস্ না লেখাপড়া জিনিসটা কত ভাল। আজ তোদের রাগ হয় জানি। কিন্তু তোদের নিয়ে থাকতে আমার একটুও কষ্ট হয় না।"

তিনি দেরী করে যেতেন বলে দিদিমা এক প্লেট খাবার পাঠিয়ে দিতেন। তিনি খেয়েদেয়ে বেশ নিশ্চিন্ত হয়ে পড়াতেন। বাবা মাঝে মাঝে এসে বলতেন, "ওদের একটু খেলতে সময় দেবেন"। আমাদেরও এমন হয়েছিল যে অন্য কারও কাছে পড়া পছন্দ হত না। হরিদাস মন দিত না। অন্যদিকে চেয়ে থাকত। তার কান মলে দিতেন। হাতে বড় বড় নখ থাকার দরুণ কানে রক্ত বেরিয়ে যেত। তখন বলতেন, "আহা, খুব লেগেছে? আমি ত জোরে মারিনি। যা, জল দিয়ে আয়। তোদের গায়ে হাত তুলতে আমার কষ্ট হয়। ভাল করে মন দিস্ না কেন?"

আমরা বলতুম, "আপনার নখ কাটবেন। নখে লেগে রক্ত পড়ে। আর বোর্ডে যখন চক দিয়ে আঁক কাটেন, এমন কিচ্‌কিচ্‌ শব্দ হয় আমাদের গা শিরশির্ করে"।

বলতেন, "আচ্ছা এইবার কাটব। সময় পাই না, তাই কাটা হয় না।"

বড়দাদার বিয়ের পর ছোটপিসী নিজের বাড়িতে বেনেপুকুরে চলে যান। তখন বড়পুটি, ছোটপুটি আর আমি বুড়ো মাস্টারমশাইয়ের কাছে পড়তুম। বড়পুটি ও আমি মন দিয়ে শুনতুম, ছোটপুটির ধৈর্য থাকত না না। তাকে বললেন, "তুই চলে যা। তোর কিছু হবে না।"

একদিন আমাদের পড়াতে পড়াতে মাস্টারমশায় জিজ্ঞেস করলেন, "Umbrella মানে কি?" আমরা বলেছিলুম, "ছাতি"। তিনি বার বার বোঝাচ্ছেন, "বল সাতি (ছাতির পূর্ববঙ্গীয় উচ্চারণ) নয় সাতা (ছাতা)।" আমরা কিছুতেই বুঝতে না পেরে শেষে বললুম, "আমরা আপনার ভাষায় কি করে বলব?" তিনি তখন বুঝিয়ে বললেন যে তাঁর মত 'সাতা' উচ্চারণ করতে হবে না, বলতে হবে "ছাতা", কারণ ছাতি বললে অর্থ হয় বুকের ছাতি (chest)। এই নিয়ে খুব খানিকটা হাসাহাসি হল। এমনি হাসিখুশির মধ্য দিয়েই তাঁর কাছে পড়াশুনা চলত।

(৩১)

ছোটপিসী বেনেপুকুরে নিজের বাড়িতে চলে গেলে সেখান থেকে অনুজা-দিদির বিয়ে হয়। তার পরে ছোটপিসীর আরও দুটি ছেলে হয়েছিল। তাদের নাম সুমোহন আর শ্রীমোহন। আমরা মাঝে মাঝে ছোটপিসীর বাড়িতে গিয়ে থাকতুম। দুপুরবেলা অনুজাদিদি ও আমরা সকলে মিলে ছোট উনুন পেতে খেলা করতুম। বড় চাতাল ছিল। সেই চাতালে ছোটপিসীর কাছে একজন বামুনের মেয়ে থাকত। আর একজন কুমারী নামে নতুন দাসী এসেছিল। তাকে সহায় করে ভাঁড়ার থেকে ঘি, ময়দা বের করে তরকারি এনে সেই চাতালে লুচি-ভাজা, তরকারী রান্না হত। ছোট উনুনে নিজেরাই রাঁধতুম। একটা আমগাছ ছিল। শুখা নামে একটা চাকর ছিল। সেও তখন ছোট ছিল, হরিদাসকে আগলাত। তাকে দিয়ে গাছ থেকে আম পাড়াতুম, তাই দিয়ে চাটনি হত। কী ভাল লাগত! ছোটপিসী কিছু বলতেন না বলে আমাদের আরও মজা হত। সেই লুচি-তরকারী দিয়ে বিকেলে জলখাবার হত। বামুনঠাকরুণ, ঝি কাছে থাকত বলে ছোট-পিসী আর বিশেষ নজর দিতেন না। বাড়িতে থাকলে ওসব হত না। দুপুরবেলা মাস্টারমশায়ের কাছে আটকা পড়তুম, আর মায়েরাও চোখের আড়ালে যেতে দিতেন না, ভাঁড়ারের চাবিও আমাদের হাতে দিতেন না।

আমার যখন বার বছর বয়স তখন আমার সেজভাই পুরীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম হয়। ভাদ্রমাসের সন্ধ্যার সময় হয়েছিল। খুব সুন্দর দেখতে ছিল। দিদিমার ধারণা হয় 'গুপু'ই আবার এসেছে। তাই ওকে গোপাল বলে ডাকতেন। জন্মাবার সময় একটু দুর্বল হয়েছিল। মাথাব তেলো বসা ছিল। সর্ষের তেলে কাপড় ভিজিয়ে মাথায় দিয়ে বাখতেন। আস্তে আস্তে সেখানটা সমান হয়ে যায়। খুব কাঁদত। কাঁদতে কাঁদতে নীল হয়ে অজ্ঞান হয়ে যেত। সেই সব কারণে কতরকম ঠাকুবের সোনার কবচ তার গলায় ছিল, যেন একটা নেক্‌লেসের মত। দিদিমা নিচুর মাকে বললেন, "সেই গুপুই এসেছে। তুই ওকে মানুষ কর্।" বৌঠানকে বললেন, "তোর ত কিছুই হল না, ওই তোর ছেলে।" সেও ওকে খাওয়াত পরাত, খব ভালবাসত। ঐ ভাবে দিদিমা তাকে ভীষণ আবদার দিতেন। কাউকে কিছু বলতে দিতেন না। দিদিমা হোমিওপ্যাথি ওষুধ খেতেন, ও তাই খাবে। খালি শিশিতে জল ভরে খেতে দিতেন। না দিলে কাঁদতে কাঁদতে অজ্ঞান হয়ে যেত। তখন আবার ডাক্তার ডাকতে হত। বৌঠান তার কথা না শুনলে তাকে চুল ছিঁড়ে, মেরে অস্থির করত। সে বেচাবাও ওর অত্যাচাব সহ্য করত। সব সময় কাছে রেখে, রামায়ণ, মহাভাবত পড়ে গল্প বলত। এদিকে খুব চালাক ছিল। বামায়ণ, মহাভারতের গল্প শুনে শুনে এমন মুখস্থ করেছিল যে যেখান থেকেই জিজ্ঞাসা কর বলে দেবে। লেখাপড়াতেও খুব ভাল ছিল। একবার যা শুনত, শিখে নিত। দেব ভক্তিও ছিল খুব। লক্ষ্মণেব শক্তিশেলে আহত হওয়ার কাহিনী শুনতে শুনতে কেঁদে ফেলত। অভিমন্যুর মৃত্যু, উত্তরার বিলাপ সহ্য করতে পারত না। সে দুধ খেতে চাইত না, জেদ করত বলে একজন বহুরূপীকে নিয়ে আসা হয়। সে তাড়কা রাক্ষসী সেজে আসত। তাকে দেখে ভয় পেয়ে তখন শান্ত হয়ে দুধ খেয়ে নিত। এইভাবে তার বার বছব কাটে। অনেকটা শান্ত হয়ে এসেছিল। কিন্তু ফিটের অসুখ কমেনি। সাদা রং নীল হয়ে যেত, মনে হত যেন সারা গায়ে কে কালি ঢেলে দিয়েছে। পায়ে গরম জল মাথায় ঠাণ্ডা জল দিয়ে তবে সুস্থ হত। বার বছর বেঁচেছিল। তারপর একদিন সাইকেল চড়া শিখতে গিয়ে পড়ে যায়। তার ফলে লিভারে লেগে মারা যায়। দিদিমা তার আগেই মারা গিয়েছিলেন, নাহলে তিনি হয়ত সহ্য করতে পারতেন না।

আমার সেজ ভাই পূর্ণীন্দ্রনাথ যে বছর জন্মায়, আমার সেই বছর (১৩১৩ সাল) অগ্রহায়ণ মাসে বিয়ে হয়।

বড়দাদার মৃত্যুর পর অনেকদিন স্বদেশীয় ব্যাপার থামা পড়ে যায়। আবার আমার বিয়ের আগে আরম্ভ হয়। বিলিতি জিনিস আনা বন্ধ হয়। দিশি সাবান, মিলের কাপড়—যতটা পাওয়া যায় ব্যবহার হচ্ছে। তখন এসব ভাল পাওয়া যেত না। সকলেই চেষ্টা করছে যাতে দেশের জিনিস চালু হয়। আশ্বিন মাসে পুজোর সময় দিদিমা আমাদের কাপড়-চোপড় যা দেবার দিতেন, আর এক শিশি করে এইচ, বোসের দিশি সেণ্ট দিতেন। ষষ্ঠীর দিন সবাইকে বিলি করতেন। আমরা তাতেই সন্তুষ্ট হতুম। কিন্তু আমাদের মানুষ-করা দাসীরা যে চার টাকা পেত তাতে তাদের মন উঠত না। তারা আমাদের পাওনা চার টাকাও নিয়ে নিত। বলত, "দাও, ও আমাদের পাওনা।" মায়েরাও বলতেন, "দিয়ে দাও, ওটা ওরা পায়।" এরই লোভে তারা ছেলে মানুষ করবার কাজ নিত। অন্য সকলে কেউ কিছু বলতে পারত না।

আমার বিয়ের সময় সবকিছুই দেশী জিনিস দেওয়া হবে বলে ঠিক করা হয়। বিলিতি জিনিস থাকবে না। বাবা আগে থাকাত খোঁজ করে যেখানে যা দেশী জিনিস পাওয়া গেছে আনিয়েছেন। বেনারসী শাড়ি পাওয়া যেত না। জ্যাকেট করার কাঁচুলী পাওয়া যেত। কাঁচুলী আনিয়ে তার সঙ্গে রং মিলিয়ে কাপড় দিয়ে কাঁচুলীর ধরনে নতুন রকম জ্যাকেট তৈরী হল। আগেকার পুরনো দরজী ছিল কাশিম। কিন্তু সে নতুন ফ্যাশনের জামাকাপড় তৈরী করতে পারবে না বলে সে সব ফতেউল্লা দরজীকে দিয়ে করান হত। ফতেউল্লাকে পাঠিয়েছিলেন বালিগঞ্জের মেজদিদি বড়দাদার বিয়ের সময়। দিদির বিয়ের সময় কুক এণ্ড কেল্‌ভির গয়না তৈরী করিয়েছিলেন। আমার বিয়ের সময় বদরীদাসকে দিয়ে জড়োয়ার গয়না করালেন। সোনার গয়না পুরনো স্যাকরাই করত। তার নাম বেহারী। তখনকার নাম করা স্যাকরা, হাতের কাজ খুব ভাল ছিল, কিন্তু দিতে বড় দেরী করত। বর এসেছে, তখন লোক ছুটছে গয়না আনতে। সেইজন্য আমার বিয়ের সময় পরাণ নামে স্যাকরা গয়না করে। সেও খুব ভাল ছিল। ফার্নিচার আসে সাহারাণপুর

থেকে, হাতির দাঁতের কাজ করা, পিতলের কাজ করা। মুঙ্গের থেকে আবলুশকাঠের বাক্স, তেপায়া এসেছিল। খাট, আলমারী এখানকার হোসেন খাঁ নামে এক দেশী কোম্পানীর কাছে অর্ডার দিয়ে করান হল। কাচের জিনিস তখন এখানে ভাল পাওয়া যেত না, সবই বিলিতি আসত। তাই জার্মান সিল্‌ভারের বাতিদানের উপর ঢাকা কাঁচের ফানুস আসে। তখন ঐ অঞ্চলে দেশী কাচের জিনিস তৈরী হচ্ছে। অনেক খুঁজে খুঁজে সব জিনিস আনা হয়েছিল। যা দেশী পাওয়া যায়নি তা বাদ দেওয়া হয়। তখন দেশী ভাল পাউডার এবং পাউডারের পাফ্ পাওয়া যেত না বলে চন্দনকাঠ গুঁড়িয়ে বাড়িতেই পাউডার তৈরী হল। আর অনেক খুঁজে পেতে একটা হাতে তৈরী চন্দনসই পাফ্ কিনে আনলেন। তুলোর প্যাডে সুতো দিয়ে পালক বেঁধে পাপ্ তৈরী করেছিল, তাই দিয়েছিল। এর ফলে আমার বিয়ের সময় বাবা দেশী জিনিস কোথায় কি তৈরী হচ্ছে জানতে পেরেছিলেন। সেই থেকে অনেককে দেশী জিনিস তৈরী করতে উৎসাহ দিয়েছেন। সামান্য জিনিসও বিলেত থেকে আসছে, তাই আমাদের অভাব মিটছে, এ বিষয়ে সাধারণ লোকের চোখ ফুটিয়ে দেন, অনেককে এসব তৈরী করবার জন্য সাহায্য করেন।

বিয়ের আর সবকিছুই দিদিদের বিয়ের অনুকরণে হয়েছিল। বিয়ের পর থিয়েটার হয়েছিল 'দুর্গেশনন্দিনী' আর 'নসিব'। অর্ধেন্দু মুস্তফী বিদ্যাদিগ্‌গজ সেজেছিলেন। তিনি খুব লোক হাসাতে পারতেন। তিনি এমনিতেও আমাদের বাড়ি আসতেন, নকল করে কথা কইতেন।

যখন বাসি বিয়ের দিন বাবাকে প্রণাম করে যেতে হয়েছিল, বুক ভেঙে যাচ্ছে তবু কাঁদতে পারিনি। মা বলেছেন, "খবরদার কাঁদবে না। তোমার দিদির মত না হয়।" দিদিমা ও অন্যান্য সকলে বলতে লাগল, "কাছেই শ্বশুর-বাড়ি, যখন ইচ্ছে হবে চলে আসবে।" আমার মন মানছিল না, তবুও চোখের জল ফেলিনি। তখন বুঝেছি দিদিকে ন বছরে চলে যেতে হয়েছিল, সে কি করে সামলাবে। তার কথা ভেবে মা আমাকে সাবধান করতেন।

(৩৪)

আমার বিয়ের আগেই দীনেশচন্দ্র সেনকে আসতে দেখেছি। মাঝে মাঝে কত খাতা বগলে আসতেন। তাঁকে লেখবার জন্য বাবা নানাভাবে সাহায্য

করতেন। আমার বিয়ের সময় তিনি নিজের লেখা তিনখানা বই—বেহুলা, ফুল্লরা আর জড়ভরত—আর চন্দনকাঠের বিষ্ণুমূর্তি উপহার দিয়েছিলেন। এখনও তাঁর হাতের চিহ্ন আমার কাছে আছে। ঐ রকম জগদীশচন্দ্র ঘোষ, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ইত্যাদি নানান গুণী লোকের আসার অবারিত দ্বার ছিল। অনেক বিষয়ে তাঁদের উৎসাহ দিয়েছেন।

(৩৩)

আমার বিয়ের আগেই রামলালবাবুর হঠাৎ হার্টের অসুখ বেশী হয়। বাবা নিজে দাঁড়িয়ে ওষুধ খাওয়ান, দেখাশোনা করেন। কিন্তু ফল হল না, মারা গেলেন। তাঁর বড় ছেলে ইন্দুভূষণ যখন এল তখন তিনি বেঁচে নেই। বাবাই টাকা দিয়ে যা করণীয় ছেলেকে দিয়ে করালেন। অনেক দিনের পুরনো সরকার বলে তাঁর ছেলেকে তাঁরই কাজে বহাল করেন। আবার বিয়ের সময় ঐ ছেলেই কাজ করছে।

বাবার মুখে শুনেছি রামলালবাবু কি রকম বিশ্বাসী লোক ছিলেন। যখনই বাড়ি ছেড়ে কোথাও যাওয়া হত তাঁর উপরই বাড়ির ভার থাকত। দাদা-মশায়ের আমলের লোক ছিলেন বলে চাকরদাসী ও বাড়ির ছোট ছেলেমেয়ে সকলেই তাঁকে দাদামশায় বলত। তিনি মনিবের এতটুকু ক্ষতি দেখতে পারতেন না। যখন ছোটপিসীর বেনেপুকুরের বাড়ি কেনা হয়, বিশ হাজার টাকার চেক দিয়ে পাঠান হয় বায়না দিতে। সে সময় এখনকার মত গাড়ির সুবিধা ছিল না, ঘোড়ার ট্রাম ছিল। চেক ছাতার ভিতরে বেঁধে খুব লুকিয়েছেন ভেবে হেঁটেই যাচ্ছিলেন। বায়না দিতে গিয়ে দেখেন চেক নেই। ছাতা খুলে মাথায় দেবার সময় চেকটা রাস্তায় পড়ে যায়। সেই অবস্থায় সারা রাস্তা খুঁজতে খুঁজতে বাড়ি ফিরে আসেন। বাবাকে বলতে বাবা বললেন, "চেকের নম্বর নিয়ে ব্যাঙ্কে যান, খবর দিয়ে আটকে দিন, কেউ ভাঙাতে পারবে না।" কিছুতেই বুঝবেন না। কেবলই বলেন, "কোনদিন কিছু লোকসান করিনি। আর আজ কিনা বিশ হাজার টাকা ক্ষতি হবে। কিছুতেই হতে হতে দেব না।" বাবা বুঝিয়ে বলেন, "আগে ব্যাংকে যান, তারপর যা হয় হবে।" ছাতা থেকে যেখানে চেকটা পড়ে যায় পরে একজন লোক দেখতে পেয়ে সেখান থেকে কুড়িয়ে নেয়। তখন সে চেক নিয়ে ঠিকানা দেখে বাড়িতে

এসে দিয়ে যায়। সে সৎলোক ছিল। তা নাহলে আর টাকা পাওয়া যেত না। তাকে বাবা বখ্‌সিস্‌ করেন।

(৩৬)

আমার যে বছর বিয়ে হয় (১৩১৩ সাল) সেই বছর পৌষ মাসে কলকাতায় অল ইণ্ডিয়া এক্‌জিবিশন হয়েছিল। কোন জায়গায় হয়েছিল ঠিক মনে পড়ে না, বোধহয় বিডন স্কোয়ারে। আমার শ্বশুরবাড়িতে তখন মেয়েদের বাইরে যাওয়ার রেওয়াজ ছিল না। সুতরাং শ্বশুরবাড়ি থেকে আমার এক্‌জিবিশনে যাওয়া হবে না ভেবে বাবা এসে আমার শাশুড়ীকে বলেন, "বেয়ান, এতবড় এক্‌জিবিশন হচ্ছে, ও দেখতে পাবে না? আমার সঙ্গে যেতে দিন, কেউ জানতে পারবে না।" আমার শ্বশুর একটু স্বাধীনচেতা ছিলেন, বিধিনিষেধের মধ্যে থাকা পছন্দ করতেন না। তিনি বাবাকে বললেন, "আমি বলছি, তুমি ওকে নিয়ে যাও। জীবনে আর দেখতে পাবে না। এরা নিজেরাও যাবে না, অন্য কাউকেও যেতে দেবে না।"

তখন আমার দাদাশ্বশুর কালীকৃষ্ণ ঠাকুর মারা গেছেন। প্রফুল্লনাথ ঠাকুর নাবালক। বাড়িতে মতামত দেবার কর্তা কেউ নেই। তখন তাই পাথুরে-ঘাটার ঠাকুর পরিবারে যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের ইচ্ছামতই সব কাজ চলছে। আমার শাশুড়ীও মনে মনে যাবার জন্য খুব উৎসুক ছিলেন, কিন্তু একটু ইতস্ততঃ করছিলেন। বাবা তাঁকে বললেন, "আপনি তো কোন অন্যায় করতে যাচ্ছেন না! আর যদি লোকনিন্দার ভয় থাকে, চলুন, আমার বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে আপনাকে নিয়ে যাব, কেউ দেখতে পাবে না, জানতেও পারবে না। দেখবেন স্বদেশী জিনিসের কি রকম উন্নতি হয়েছে। এতবড় এক্‌জিবিশন আর হবে না।"

আগে আমি বাবার সঙ্গে দেখতে যাই। তারপরে আমার শাশুড়ীকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে বাবা দেখিয়ে আনলেন। আমার বড় জা তাঁর বাবার সঙ্গে গেলেন। তখন প্রফুল্ল ঠাকুর সাহস পেয়ে তাঁর বাড়ির মেয়েদের দেখাতে নিয়ে যান।

যা দেখেছিলুম সব মনে নেই, যে সব জিনিস চোখে লেগেছিল তাদের কথাই লিখছি। প্রথমেই দেখি ন্যাশন্যাল সোপ ফ্যাক্টরির তৈরী একটা স্টেজ, মানুষ, গাছপালা দিয়ে সাজানো। সব সাবানের। দেখে অবাক হতে হয়

এমন সুন্দর। বেনারস থেকে কতরকম বাসন, পান, আতর, বেনারসী কাপড়ের তাঁত, ভাল ভাল দামী কাপড় ও সেইসঙ্গে একটা বেনারসী মশারি। মশারিটা সত্যিই দেখার মত। মুর্শিদাবাদ থেকে আসে সিল্কের কাপড়, গরদ এবং সিল্কের গুটি থেকে কিভাবে সুতো বের করা হয় তারই একটা ছোট নিদর্শন। গ্লাস ফ্যাক্টরির মডেল ছিল কাচ গলিয়ে চোঙে ফুঁ দিয়ে বাল্‌ব তৈরী হচ্ছে; শিশি বোতল, জলের গেলাসে নাম লিখে দিচ্ছে। আর এক জায়গায় ঘর জোড়া টেবিলের উপর ওয়াটার ওয়ার্কস্ কোম্পানী সাজিয়েছিল কলকাতা শহরের দৃশ্য। ঘরবাড়ি, বস্তিতে কি রকম জলের অপচয় হয় তাই দেখিয়েছিল। মোটা পাইপ নিয়ে জল ট্যাবে তুলছে, সেই জল শহরে পাঠানো হচ্ছে। কোথাও ঝি বাসন মাজতে বসে গায়ে জল লাগবে বলে কলে কাপড় লাগিয়ে দিয়েছে, জল কাপড় বেয়ে পড়ে যাচ্ছে। কোথাও বাবুর বাড়ি চৌবাচ্চা ভরে জল উপচে পড়ে নষ্ট হচ্ছে, কারও খেয়াল নেই। রাস্তার কল থেকে জল পড়ে যাচ্ছে। তখন রাস্তায় টেপা কল ছিল না, কেউ কল বন্ধ করত না। ঐ বাড়ি, পুতুল সমস্ত কেষ্টনগরের তৈরী। খুব চমৎকার হয়েছিল। দাঁড়িয়ে দেখেও আশা মেটাতে পারিনি। বদ্রীপ্রসাদ জুয়েলার নানারকম ভাল ভাল জড়োয়া গয়না দিয়েছিল, আর সেই সঙ্গে দুটো পাখি। একটা আস্ত পান্না কেটে টিয়াপাখি করেছিল, চুণীর চোখ, সোনার ঠোঁট ও পা। টিয়াটা ছোট। আর একটা চুণীর লালমোহন পাখি। সেটা বড়। পান্নার চোখ, সোনার ঠোঁট ও পা। দেখবার মত জিনিস। আস্ত পাথর কেটে করা। একটা ঘরে নিয়ে গেল, সেখানে বসে আছি, দেখি তার দরজা জানলা সব উ’ল্‌টে গেল। বোধ হয় নাগরদোলার মত তৈরী। কিছু বুঝে উঠতে পারলুম না। এর পরে অনেকবার এক্‌জিবিশন দেখেছি, কিন্তু সেরকম আর হয়নি।

(৩৭)

আগে দোতলার হলে ও ইস্কুলে (যেখানে দাদারা পড়ত তাকে ইস্কুলঘর বলা হত) ম্যাটিং পাতা ছিল। যেবার সিঁড়ি তৈরী হল সেবার ম্যাটিং তুলে সিমেণ্ট হয়। লাইব্রেরী ঘরের দরজায় পুঁতির পর্দা ঝোলান থাকত। কতরকম ছবি—বাঘে হরিণ ধরছে, ময়ূর, ঘোড়া—আঁকা ছিল। আমরা তার থেকে পুঁতি ছিঁড়ে নিতুম। মনে করতুম বোঝা যাবে না। কিন্তু মাকে

মাঝে ফাঁক' হয়ে গেলে ধরা পড়ে যেতুম। ছোটকাকা, বাবা বকতেন, "কে ছিঁড়েছে ?" আমরা স্বীকার করতুম, "আমরাই ছিঁড়েছি।"

বলতেন, "খবরদার, আর কেউ পর্দায় হাত দিলে মার খাবে।" কিন্তু বাড়িতে অত ছেলেমেয়ে, কত নজর দিয়ে রাখবেন। শেষকালে পর্দার পাট উঠে গেল, আর পর্দা ছিল না। তখন থেকে লাইব্রেরী ঘরের সাজ বদলে গেল। সেইখানেই শোয়াবসা হত। ইলেকট্রিক ফ্যান হল, টানাপাখা বন্ধ হয়ে গেল। আগে কৌচ কেদারা কার্পেট পাতা ছিল। পরে সে জায়গায় চালা বিছানা ও দেশী ধরনের চেয়ার সোফা রাখা হয়। চারিদিকে বুক-কেস, তার মাথায় নানারকম পিতলের কাজ করা পুতুল, ফুলদানী, বাটালির কাজ করা জিনিস সাজানো থাকত। একটা জয়পুরের পাথরের গণেশঠাকুর ছিল। সোনালী কাজ করা গয়না পরানো ছিল। আমরা দেখতুম অনেকদিন থেকেই সেটা সাজানো আছে, একটা ছোট দুবছর-আড়াই বছরের ছেলের মত। কত সাহেবসুবো এসে ঐ ঘরে বসত। একবার এক সাহেব এসে সেটা দেখে ছোটকাকাকে জিজ্ঞেস করে, "ওটা মানুষ না হাতী ? ওরকম শুঁড় কেন ?"

ছোটকাকা ব্যাখ্যা করে তাকে বুঝিয়ে দেন, ও "উনি আমাদের গড (দেবতা)। আমরা ওঁর পুজো করি।" সে অমনি চেয়ে বসল, "ওটা আমাকে দাও। আমি দেশে নিয়ে যাব।" ছোটকাকা তাকে ঠাট্টা করে বলেন, "ও ঠাকুর কি তুমি বিলেতে নিয়ে গিয়ে রাখতে পারবে ?" সে বলল, "হ্যাঁ, পারব। তুমি আমাকে দাও।"

সেই গণেশ শেষকালে জাহাজে করে বিলেতে চলে গেল। কিছুদিন বাদে হঠাৎ একদিন দেখা গেল বিলেত থেকে একটা বাক্স এসে হাজির। সেটা খুলতে তার ভিতর থেকে বেরোল সেই গণেশ ও সাহেবের এক চিঠি। সে লিখেছে, "টেগোর, তোমার ঠাকুর আমায় বিকট মূর্তি ধরে রাত্তিরে ভয় দেখায়। বলে, 'তুই আমাকে যেখান থেকে এনেছিস্ সেখানে রেখে আয়। আমি এখানে থাকব না।' তুমি ওকে ফেরত নাও।" এমনি করে বিদেশ থেকে গণেশ ঠাকুর মাহাত্ম্য নিয়ে ফিরে এলেন। আসলে বোধহয় ছোটকাকার কথা শুনেই সাহেব ভয় পেয়েছিল। তখন যেখানকার ঠাকুর আবার সেইখানেই স্থান পেলেন।

ছোটকাকা যেমন মজার গল্প করতে পারতেন, তেমনি তাঁর সম্বন্ধে অনেক মজার মজার ঘটনাও ঘটেছে। একবার এক সাহেব মরে গেলে তার সখের

বাজনা 'চেলো' বিক্রী হচ্ছে শুনে ছোটকাকা কিনে আনেন। আগেই বলেছি তাঁর বাজনার খুব শখ ছিল। দাঁড়িয়ে থাকলে চেলোটা মাথা অবধি যেত। স্কুলঘরে দাঁড়িয়ে বাজান হত। ছোটকাকা বাজাতেন। কনকদাদাও বাজাতে আরম্ভ করল। তারপর একদিন দেখা গেল সেটার একটা তার ছেঁড়া, যেন কেউ বাজাতে বাজাতে ছিঁড়ে গেছে। ছোটকাকা বললেন, "আমি রাত্তিরে বাজনার আওয়াজ পেয়েছি। দারোয়ানের কাছে চাবি থাকে। নিশ্চয় চাকরেরা কেউ খুলে বাজায়। মজা দেখে। অতবড় বাজনা তো কেউ দেখেনি!" দরোয়ানকে বলা হল। সে বললে, "না, কেউ ঘর খোলেনি।"

এরপর থেকে রোজই সকালে উঠে দেখতেন একটা করে তার ছেঁড়া থাকত।

ছোটকাকা বললেন, "আমি রাত্তির দুটো থেকে তিনটে অবধি রোজই বাজনার আওয়াজ পাই। গম্ভীর আওয়াজ। তার পরেই তার ছিঁড়ে যায়। কেউ না বাজালে ওরকম ভাবে তার ছিঁড়তে পারে না।" দারোয়ানকে হুকুম দিলেন, "ঘরের চাবি বন্ধ করে আমার কাছে দিয়ে যাবে।"

কনকদাদা বলল, "আমি রাত্তির চারটের সময় উঠি। বাথরুমে যেতে হবে, আমার কাছে চাবি দিও।" স্কুল ঘর পেরিয়ে তবে বাথরুমে যেতে হত। রোজই গিয়ে দেখত একটা করে তার ছেঁড়া।

তখন দিদিমা বললেন, "মরা সাহেবের জিনিস, সে-ই আসে।" ছোট কাকাকে বললেন, "তুই ওটা বিদায় কর্।"

বাবা ত' কিছুতেই বিশ্বাস করেন না। কনকদাদাও বলে, "বড় ইঁদুর আছে, সেই দাঁতে করে টানে, ছিঁড়ে দেয়।"

তখন সকলকার ঝোঁক হল, কি করে তার ছিঁড়ে আবিষ্কার করতে হবে। আমরা রাত্তির দুটোর সময় উঠে শুনেছি বাজনার আওয়াজ আসছে। আমাদের তিনতলার ঘর থেকে শোনা যেত। এক ঘণ্টা বাদে বন্ধ হয়ে যেত।

দিদিমা বললেন, "আর কাজ নেই রেখে, বিদায় কর্।" ছোট কাকার একটু ওসবে বিশ্বাস ছিল, আর বাধা দিলেন না। কনকদাদা বললে, "আর দিনকতক দেখি।"

দিদিমা বললেন, "এত দেখেও তোদের শি.. হয় না, যতক্ষণ না বিপদ ঘটে?"

তার আগেই বড়দাদা মারা যায়। এর পরেই ছোটকাকা যেখান থেকে

বাজনাটা এনেছিলেন সেখানে ফেরত দিয়ে এলেন। কি তার রহস্য কেউই মীমাংসা করতে পারল না। অনেক ভেবেচিন্তে ঠিক হল, সাহেবের আত্মা মায়া ছাড়তে না পেরে এসে বাজাত।

এমনি করেই তখন আমাদের দিন কেটেছে। মাঝে মাঝে মৃত্যুর কালো ছায়া পড়েছে বটে, কিন্তু লক্ষ্মীশ্রী ঔজ্জ্বল্য ও বোলবোলাওকে ম্লান করতে পারেনি। সব দুঃখ ভুলিয়ে দিত এমন নিত্য নতুন ব্যাপার লেগেই ছিল।

(৩৮)

আমার বিয়ের পরই কলকাতা থেকে রাজধানী উঠে যায়। যেদিন দিল্লীতে প্রথম অ্যাসেম্‌ব্লি-র মিটিং বসে সেদিনই ভূমিকম্প হয়। সকলে বলে, "আজ দিল্লীর সিংহাসন টলল, তাই ভূমিকম্প হচ্ছে।"

আবার বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন জোর শুরু হল। ওদিকে টপ টপ জেলে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। সাহেবদের গাড়িতে বোমা পড়ছে। নরেন গোঁসাই জেলেতে খুন হল। চারিদিকে ধর পাকড় চলছে। পুলিশের ভিতরেও গণ্ডগোল বাধে। বিলেত থেকে টেগার্ট সাহেবকে নিয়ে এল।

সেই সময় থেকে বাবা কার্টুন আঁকতে শুরু করেন। তখন পুলিশে সন্দেহ করে যে ওঁরাও বোধ হয় কোন গোপনীয় দলের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন। হঠাৎ শোনা গেল, পুলিশ আসবে বাড়ি সার্চ করতে। যদিও কিছু সন্দেহজনক মাল ছিল না, বইটই, যেমন 'আনন্দ মঠ' ইত্যাদি যা দু একখানা ছিল সরিয়ে ফেলেছিলেন। পুলিশ কিছু না পেয়ে চলে যায়। দিদিমা ভয়ে অস্থির হন। তারপর তাঁতটাত সব জমিদারীতে পাঠিয়ে দেওয়া হল। গেঞ্জীর কল নির্মলদাদাকে দিয়েছিলেন ব্যবসা করতে। তখনকার মত বাবার সে সব সখ চলে গেল, কিন্তু ছবির সখ রয়ে গেল।

তখন থেকে বোধ হয় খানিকটা এই সব কারণেই বাড়িতে লাট সাহেবদের আনাগোনা বেড়ে গেল। তখনকার প্রায় সব লাট সাহেবই জোড়াসাঁকোতে এসেছেন। এইসময় কারমাইকেল লাটসাহেব হয়ে এলেন। আগে কলকাতায় অনেক বড় বড় সাহেব আসত। ক্যালকাটা ক্লাবে বাবার সঙ্গে অনেক সাহেবের আলাপ হত। কারমাইকেলের সঙ্গে বোধ হয় বাবার সেই খানেই বন্ধুত্ব হয়েছিল। কারণ যখন কারমাইকেল লাটসাহেব হয়ে কলকাতায় এলেন তখন শুনেছিলুম, বাবার সঙ্গে তাঁর আগে থেকেই আলাপ আছে।

যখন কারমাইকেল কলকাতায় আসতেন' তাঁর সেক্রেটারী হঠাৎ এক একদিন দুপুরের দিকে ফোন করে বাবাকে জানাতেন, "লাটসাহেব ওখানে যেতে চান। আপনার কোন অসুবিধা হবে কিনা জানতে চান।"

বাবা বলতেন, "না, অসুবিধা হবে না। আসতে পারেন।"

এদিকে বাড়িতে সব সাজ সাজ পড়ে যেত। দরোয়ান, চাকর, বেহারা সব পরিষ্কার হয়ে হাজির থাকত। ভিতরবাড়ির দরজা বন্ধ হয়ে গেল। ছোট ছেলেমেয়ে সব চুপচাপ বাগানে খেলা করতে চলে গেল। মনে হত বাড়িতে ছোট ছেলেমেয়ে নেই। লাইব্রেরী ঘরে বসার ব্যবস্থা হত। তখন সেখানকার ব্যবস্থার পরিবর্তন হয়েছিল। টেবিল কৌচের বদলে কাঠের ফ্রেমে পাটিবোনা তক্তপোষের উপর গের্দা দেওয়া বাবার বসবার বিছানা ছিল। চারিদিকে দেশী ধরনের কৌচ কেদারা দিয়ে সাজান থাকত। যে কেউ আসুক সেইখানেই বাবার দেখা পেত। সাদা চাদরের ব্যবস্থা ছিল না যে বদলাতে হবে। ভিজে কাপড় দিয়ে মুছে দিলেই পরিষ্কার হয়ে যেত। বাবার পোষাক বদলের দরকার হত না। পাট ভাঙা কাপড় পরাই থাকত। তার উপর অর্থাৎ একটা জোব্বার উপর আর একটা জোব্বা পরে নিলে বাইরের সাজ হয়ে যেত। আমার মেজদাদা কনকেন্দ্রনাথকে বলতেন আশেপাশে থাকতে। যদি দরকার হয় ডাকবেন। কাকারা বাগানে নেমে যেতেন। বাবা একলা থাকতেন। ঠিক সময়মত লাটসাহেবের গাড়ি এলে বাবা এগিয়ে গিয়ে তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে আসতেন। কারমাইকেল কিন্তু কৌচ কেদারায় না বসে বাবার সঙ্গে গদিতে বসে গল্প করতেন, গড়গড়ায় তামাক খেতেন। বাড়িতে চিঁড়ে ভাজা হলে চিঁড়ে ভাজা কড়াইশুটি দিলে খেতে খুব ভালবাসতেন। এখান থেকে চিঁড়ে ভাজা টিনের কৌটায় করে বিলেতে নিয়ে গিয়েছিলেন। সেখানেও চিঁড়ে ভাজার খুব নাম হয়ে গিয়েছিল। তখন যদি কেউ এইসব দৃশ্যের ছবি তুলে নিত তাহলে দেখা যেত। অনেক লোক ছিল যারা লাট সাহেবের পাশে নিজের ছবি তোলাতে খুব গর্ব বোধ করত। বাবা কিন্তু বিদেশী লাটের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে ভালবাসলেও তার সঙ্গে ছবি তুলে গর্ব করা পছন্দ করতেন না। ছবি তোলার অনেক সুযোগ পেয়েছেন, কিন্তু কখনও ছবি তোলাতে চেষ্টা করতেন না।

এদিকে নীচে রাস্তায় বডিগার্ড দুজন ঘোড়ায় চড়ে টহল দিয়ে বেড়াত। সময় হয়ে গেলে খবর পাঠাত। কনকদাদা ভিতরে গিয়ে জানালে লাটসাহেব

বলতেন, "একটু পরে যাব।" কিন্তু আবার গল্প করতে থাকতেন। সন্ধ্যে হয়ে গেলেও বসে গল্প করতেন। এমন অনেকদিন হয়েছে লাটভবন থেকে সেক্রেটারী ফোন করে জানিয়েছেন, "ডিনারের টাইম হয়ে গেছে।" তখনও বলছেন, "যাচ্ছি।" এইসব ব্যাপার কনকদাদার মুখ থেকে শুনেছিলুম। কারণ সেখানে আর কেউ যেতে পারত না।

আরও শুনেছি যখন বাবা দার্জিলিঙে গিয়েছিলেন কারমাইকেল সেখানে যান। বেড়াতে গেলে উপরের রাস্তা দিয়ে হয়ত বাবা পরিবারের সকলকে নিয়ে যাচ্ছেন, নীচের রাস্তা দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে লাটসাহেব বেড়াতে যাচ্ছেন। বাবাকে দেখলেই হেসে টুপি খুলতেন। বাবাও প্রতিনমস্কার জানাতে ভুলতেন না। তখন আমি ছিলুম না বটে তবে আর সব ছেলেমেয়েরা সঙ্গে ছিল। তারা দেখেছিল। দেশী মনোভাব থাকলেও বিদেশীদের সঙ্গে বাবার কোন সহজাত শত্রুতা ছিল বলে মনে হত না।

একবার কারমাইকেল একটা ছাপা সিল্কের রুমাল দেখিয়ে বলেন, "আমার এই রকম রুমাল এক ডজন দরকার।" "কোথায় পাওয়া যায় জান?" বাবাও সেই রকম রুমাল ব্যবহার করতেন। অনেক খোঁজাখুঁজি করে এক ডজন রুমাল আনিযে কারমাইকেলকে উপহার দেন। তখন তিনি বলেন, "আমি তো কোথাও এ জিনিস পাইনি। কোথায় এ জিনিস তৈরী হয় আমাকে বল।" বাবা ব্যবহার করতেন, কিন্তু কোথায় তৈরী হয় জানতেন না। বাবা বললেন, "সে খবর তো জানি না।" তখন কারমাইকেল বললেন, "দেখ, তোমাদের দেশের জিনিস, অথচ তোমরা জানো না কোথায় হয়।" বাবার মনে হল তাই তো, জানা দরকার। তখন খোঁজ করতে লাগলেন। অনেক খোঁজার পর জানতে পারলেন মুর্শিদাবাদে তৈরী হয়। কারমাইকেলকেও তখন জানালেন যে ঐ রুমাল মুর্শিদাবাদে পাওয়া যায়। নিজেও বুঝতে পারলেন যে আমরা কত পিছিয়ে আছি, অথচ স্বদেশী নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি। এরকম অনেক বিষয়ে সাহেবরাই আমাদের ভুল ভেঙে দিয়েছে। সেই থেকে ঐ রুমালের নাম বেরিয়ে যায় কারমাইকেল হ্যাণ্ডকার্চিফ। বিলেতে পর্যন্ত ঐ নাম প্রচার হয়ে যায়। কলকাতাতেও খুব আমদানী হয়েছিল। অনেকেই ব্যবহার করত।

কারমাইকেলের সঙ্গে বন্ধুত্বের খাতিরে কলকাতায় মুর্শিদাবাদ সিল্কের কাপড় আমদানী হল, গড়ে উঠল হোম ইণ্ডাষ্ট্রি।

দেশের ও দশের জন্য বাবা বন্ধুদের কাছ থেকে অনেক সুবিধা আদায় করেছেন। কিন্তু নিজের জন্য কখনও কিছু বলতে ভালবাসতেন না। বাবা ওরিয়েন্টাল আর্ট সোসাইটির উদ্যোক্তা ছিলেন। সে সময় রোনাল্ডসে সাহেবকে ধরে সোসাটির জন্য বছরে বিশ হাজার টাকা মঞ্জুর করিয়ে নিয়েছিলেন। এ সব কথা তাঁর মুখ থেকেই শুনেছি।

(৩৯)

বাবা যখন স্যুট পরতেন তখন গলাবন্ধ কোটপ্যাণ্ট ও পাগড়ি ছিল তাই পরতেন। ট্রেনে যেতে হলে না হয় জুরিতে যখন যেতেন তখন এই সাজ ছিল। তাঁকে হ্যাট পরতে কখনও দেখিনি। তাও অনেক দিন ছেড়ে দিয়েছিলেন, যার ফলে আমার ছোট বোনেরা এসব দেখেনি।

যখন জুরিতে যেতেন বাবা বলতেন, "আমার ভাল লাগে না। মনে হয় অন্যায় করছি। নির্দোষকে দোষী করছি কিনা কিছুই জানি না। সাজান কথার উপর হয়ত ফাঁসীর হুকুম হয়েছে, তাই শুনে আমরা দশজন একমত হলেই তার ফাঁসী হবে। সেই সময় আসামীর মুখ দেখলে আমি সেখানে দাঁড়াতে পারি না। বাধ্য হয়ে যেতে হয়। আমার ইচ্ছে হয় আর যাব না, কিন্তু ডাক পড়লে যেতেই হবে, এত পরাধীন আমরা।"

(৪০)

পলতার বাগানে দাদামশায় মারা গিয়েছিলেন বলে সেখানে খার যাওয়া হত না। আমরাও কখনও যাইনি। সেটা এমনিই পড়েছিল। তবে সেখানে দাদামশায়ের সখের বাগান ছিল। ভাল কলমের আমগাছ লাগিয়েছিলেন। খুব ভাল আম, কপি, তরকারী হত। মালি ছিল। মধ্যে মধ্যে দেখেছি আমের সময় হলে আম, তাছাড়া অন্য তরিতরকারী গরুর গাড়ি করে নিয়ে আসত। যখন ওয়াটার ওয়ার্কস্ কোম্পানী যায়, তারা বাগানটা কিনতে চাইল। বাবা দিদিমাকে এসে বলেন, "পলতার বাগানটা কোম্পানী কিনতে চাইছে। ছেড়ে দেব? ভাল দাম দেবে বলছে। ফেলে রেখে কি হবে? বিক্রী করে দিই?"

দিদিমা বললেন, "তাই দে, তবু টাকা পাওয়া যাবে।"

সেইসময় ওখানে জলের পাইপ বসে। একবার স্টীমারে বেড়াতে গিয়ে

দেখেছিলুম গঙ্গা থেকে বড় মোটা মোটা পাইপ বসিয়ে জল তুলছে। পাম্পের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। তখন কে দেখাল—ঐ আমাদের বাগান দেখা যাচ্ছে, তাই দেখেছিলুম। সেই বাগান বিক্রী করার পর বাবা শুনলেন দাদামশায় পুরীতে জায়গা কিনে রেখে গেছেন। তখন পুরীতে বাড়ি তৈরি করেন, নাম দিলেন 'পাথারপুরী'। বাবাকাকাদের কোনও বেহিসেবী খরচ ছিল না। সব কাজ ভাল করে ভেবে বুঝে দিদিমার সঙ্গে পরামর্শ করে তবে করতেন। দিদিমাও খুব হিসেবী ছিলেন। তা বলে কিন্তু কৃপণ ছিলেন না। যেখানে, যা করা দরকার তা করতেন। তখন কত লোক পোষণ হত। এখন কেউ একটা লোককে রাখতে পারে না।

পুরীতে বাড়ি তৈরী হয়ে গেলে বড়পিসী আগে বেড়াতে যান। তখন মোটে চারখানা ঘর আর সামনের বারান্দা হয়েছে। বড়পিসী দেখে এসে বললেন, "চমৎকার বাড়ি হয়েছে। সামনে একেবারে সমুদ্র অবধি খোলা। তোমরা একবার মাকে নিয়ে যাও, দেখে এস।" সেই শুনে যাওয়া ঠিক হল।

প্রায় ষাট বছর আগেকার কথা। তখন আমার বড়ছেলে পেটে। আমাকে নিয়ে যান। বাড়ি ছোট, সকলকে ধরবে না বলে দিদিরা যায়নি। আমাদের বাড়ির কাছেই শৈলেন মিত্রের বাড়ি ভাড়া করা হয়েছিল। এক বাড়িতে সবাইকে কুলোবে না বলে ভাগাভাগি করে থাকা ঠিক হল। মেল বা এক্সপ্রেস ট্রেনে অতলোকের জন্য গাড়ি রিজার্ভেশন পাওয়া গেল না। শেষে একটা প্যাসেঞ্জার ট্রেনে রিজার্ভেশনের ব্যবস্থা হল। প্রত্যেক স্টেশনে গাড়ি থামতে থামতে যাবে। তবু সেই গাড়িতেই যাওয়া ঠিক হল। সকাল বেলা নটায় গাড়ি ছাড়লে পরদিন ভোরে সেখানে পৌঁছবে। রাতের খাবারের বন্দোবস্ত হল। স্টেশনের হোটেলে টেলিগ্রাম করে দেওয়া হল। সেখানকার খাবার এনে রাত্তিরে খাওয়া হবে। মা তখন বাইরের খাবার খেতেন না। আর দিদিমার জন্যও লুচি, তরকারি ভাজাভুজি বাড়ি থেকে যা নেবার বেশী করে বাক্স ভরে নিয়ে যাবেন, যাতে আর পাঁচজনেও খেতে পারে।

ন'টার সময় ডাল-ভাত-ঝোল খেয়ে গাড়িতে ওঠা হবে। ঠাকুরঘরে প্রণাম সেরে যখন বেরোনো হবে সেই সময় আমার পায়ে পেটা ঘড়ি পড়ে পা ফুলে উঠল। সত্য জ্যাঠামশায় সব ব্যবস্থা করছিলেন। বললেন, "চল, স্টেশনে গিয়ে যা হয় ব্যবস্থা করা যাবে। আর সময় নেই।" স্টেশনে গিয়ে গুলাক্ত

লোশন, তুলো কিনে সঙ্গে দিলেন। পা তখন টনটন করছে। গাড়ি বসে সারারাত লোশন দিয়ে অনেকটা কমল।

সারারাত প্রত্যেক স্টেশনে থেমে থেমে গাড়ি চলল। আমিও বসে বসে দেখছি; ঘুম নেই। খড়্গপুরে গিয়ে একঘণ্টা দাঁড়াল। সেইখানে রাতের খাবার গাড়িতে দিয়ে গেল। খাওয়া দাওয়া হয়ে গেলে বিছানা পাতা হল। কেউ কেউ বাঙ্কে উঠল। আমার পায়ের জন্য ঘুম নেই, বসে আছি।

ভোর চারটের সময় পুরীতে পৌঁছলুম। আগের স্টেশন থেকেই সমুদ্র দেখা যাচ্ছে। বাবা সবাইকে ঘুম ভাঙিয়ে দেখাতে লাগলেন। তখনও অন্ধকার আছে। মনে হচ্ছে ঘন গাছের লাইন। আমরা বললুম "ও তো গাছ।" বাবা বললেন, "না, সমুদ্র।"

স্টেশন থেকে ঘোড়ার গাড়ি চেপে বাড়িতে পৌঁছান গেল। তখন সবে সূর্যোদয় হচ্ছে। জল যেন কাল মেঘ। সেই মেঘের ভিতর থেকে দাঁড়িয়ে দেখলুম। তখন সমুদ্রের গর্জন শোনা যাচ্ছে। কী চমৎকার দৃশ্য। আগে কখনও দেখিনি, সেই প্রথম।

ধুলো পায়ে মন্দিরে যাওয়া নিয়ম। দিদিমা আমাকে বললেন, "তুই যেতে পারবি না, পরে যাস্।" আমি বললুম, "না ব্যথা কমে গেছে, যেতে পারব।" সেই শুনে নিয়ে গেলেন। দর্শন করে এসে আবার পায়ে ব্যথা বেড়ে গেল। বাবা বললেন, "হল ত পুণ্য করতে যাওয়া। আবার লোশন দিয়ে বসে থাক।" সমুদ্রে আর চান করতে যাওয়া হবে না।" বাবাও মন্দিরে গিয়ে জগন্নাথকে প্রদক্ষিণ করবার সময় মাথা ঘুরে পড়ে যাচ্ছিলেন। পিছনে পাণ্ডারা ছিল, কনুকদাদা ছিল, ধরে বাইরে নিয়ে আসে। বাবা বেশী ভীড় সহ্য করতে পারতেন না। ঠাণ্ডা হয়ে বাড়ি ফিরে এলে দিদিমা বলতেন, "তুই পারবি না, গেলি কেন?"

তারপর কে কোথায় থাকবে তাই নিয়ে বাগ্‌বিতণ্ডা হতে থাকে। বাবা বললেন দিদিমাকে, "আপনি নতুন বাড়িতে থাকুন। আর যাদের ধরবে তারা থাক্। আমি ভাড়াবাড়িতে আর সকলকে নিয়ে থাকব।" কিন্তু দিদিমা বললেন, "তুই নতুন বাড়িতে থাক্। অবন-সমর ভাড়াবাড়িতে থাকুক।" বাবা ভাবলেন, "না ওরা মনঃক্ষুণ্ণ হবে নতুন বাড়িতে থাকা হল না বলে। আমার কিছুতেই থাকা হতে পারে না। আমি শৈলেন মিস্ত্রিয়ের বাড়িতেই থাকব।"

দিদিমা বাবাকে ছেড়ে কোথাও থাকতে পারতেন না। যেখানেই যেতেন বাবা ও তাঁর ছেলেমেয়েদের কাছছাড়া করতে পারতেন না। গাড়িতেও বাবার পাশের গাড়িতে থাকতেন। তখন বড়দাদা মারা গেছে। বৌঠান ও কনকদাদাকে নিয়ে পাশের গাড়িতে উঠেছিলেন। বাবা যখন শৈলেন মিত্রের বাড়িতে থাকাই স্থির করলেন তখন দিদিমা তাঁর লোকজনকে বললেন, "আমার জিনিস সব বড়বাবু যে বাড়িতে থাকবে সেই বাড়িতেই তুলবি।" মা ছেলের ঝগড়ার এইরকম করেই নিষ্পত্তি হত।

পাণ্ডারা আর ভিখারীর দল স্টেশনে গাড়ি দাঁড়াবামাত্রই পিছু নিয়েছিল। কিছুতেই ছাড়বে না। পাণ্ডারা খাতাবগলে হাত ধরে টানাটানি, "আমি আপনার পূর্বপুরুষের পাণ্ডা। খাতা দেখুন, সব নাম লেখা আছে।" অনেক ধস্তাধস্তির পর চিন্তামণি পাণ্ডাকে একটু ভদ্র দেখে ঠিক্ করা হল। সে-ই সব মন্দির দর্শন করায়। মন্দিরের চূড়ায় আমাদের নিশান বেঁধে দিল, তাকে বলে আট্‌কে বাঁধা। সকলের কাছ থেকে টাকা নিয়ে সেই টাকায় জগন্নাথের ভোগ দেবে। সেই ভোগ তাদের কাছ থেকে আবার কিনে যার যেমন ইচ্ছে ভিখারী খাওয়াতে পারে। সেই ভোগ পাণ্ডাদের পাওনা। প্রসাদ খেতে হলে যত দরকার তার দাম দিলে মুটে দিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দেবে। ওখানে জাতবিচার নেই। মন্দিরে যাবার সময় ঝাঁটা মারবে। ঝাঁটা নাকি সকলকেই খেতে হয়।

দর্শন করা হয়ে গেলে বাড়ি ফিরে আসতে ভোগ দিয়ে গেল। ভোগ খাওয়া হল। বলরামের ভোগ চমৎকার খেতে, ঠিক পোলাও-এর মত। অড়হর ডাল, সাদা ভাত—তাও খুব ভাল লেগেছিল।

তার পরের দিন কয়েকজন পাণ্ডা এসে হাজির, সঙ্গে একটি আট-ন বছরের ছেলে। মাথায় তার বড়ো করে চুল বাঁধা রূপোর ঘুন্টি দিয়ে পরনে লাল চেলী, কুর্তা গায়ে। সেই ছেলেই নাকি আইন অনুসারে বাবার পূর্বপুরুষের পাণ্ডা হয়। খাতা দেখাল। এই নিয়ে দুই পাণ্ডায় বচসা হতে থাকে। তারা বলে, "চিন্তামণি ঠকিয়ে নিয়েছে। ওই ছেলে আসল পাওনাদার।" খাতায় দেখাল দাদামশায়ের সই। আর গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রীর নামে আট্‌কে বাঁধা হয়েছে। আট্‌কের মর্ম তখন বোঝা গেল। চিন্তামণি যা পেয়েছিল তাকে সব বুঝিয়ে ফেরৎ দিল। তখন চিন্তামণিকে আমাদের যারা নতুন গিয়েছিলুম তাদের পাণ্ডা স্থির করা হয়। সেই সব পাওনা চিন্তামণি পেল। এইভাবে

পাণ্ডার গোলমাল মেটে। তারপর থেকে যেখানেই যাওয়া হত দুই পাণ্ডাই সঙ্গে থেকে দেখত এবং যে যার পাওনা আদায় করত।

একদিন জগন্নাথের মাসীর বাড়ি গুণ্ডাবাড়িতে যাওয়া হল। ঐভাবে যেখানে যা আছে দেখে বেড়াতে লাগলুম। একদিন ভোর চারটের সময় নটীর নাচ দেখতে যাওয়া হল। গান গেয়ে জগন্নাথের ঘুম ভাঙায়, তবে মন্দির খোলা হয়। জগন্নাথের শৃঙ্গার বেশ দেখতে একদিন যাওয়া হল। সব সোনার, হাত, মুখ, সোনার গয়না পরানো। ফিরে আসার পর বাবা পাণ্ডাদের বললেন, "তোমাদের যাত্রায় কিরকম নাচগান হয় দেখাও। বাড়িতে নিয়ে এস।"

একদিন দুপুরবেলা এল দুটি দশ এগার বছরের ছেলে। ঘুড়ি ওড়ানোর ঢঙে নাচতে থাকে ও গান গায়—

"ললনা পতঙ্গী উড়াইও রে।"

বাবার খুব ভাল লেগেছিল। এরকম প্রায়ই আনাতেন ও দেখতেন।

সকাল বিকেল সমুদ্রের ধারে দল বেঁধে বেড়াতে যেতুম। দিদিমা পায়ে হেঁটে বেড়াতে পারতেন না বলে একটা পাল্কী ভাড়া করা ছিল। দিদিমা পাল্কীতে যাচ্ছেন, আর আমরা সবাই পাশে পাশে যাচ্ছি সেই দৃশ্য বাবার মনে ছিল; কলকাতার বাড়িতে ফিরে এসে তার ছবি আঁকেন। তাঁর চিন্তা মনের ভিতর গভীর ছাপ ফেলেছিল। তাই এখানে বসে আঁকতে পারেন। জগন্নাথের মন্দিরের ছবিও এঁকেছিলেন। আমাকে একখানা দেন।

যখন পুরী থেকে চলে আসা হয়, দিদিমা বললেন, "বলরামের ভোগ আর মহাপ্রসাদ বাড়ি নিয়ে যাব। সকলকে দেব।"

কনকদাদা বললে, "না দিদি, নিয়ে যেও না। রাঁধা জিনিস প্যাক করা সারারাত থাকবে। কাল সকালে খোলা হবে। খারাপ হয়ে যাবে।"

দিদিমা বললেন, "ও কথা বলতে নেই। মহাপ্রসাদ কখনও খারাপ হয় না। সকলেই ত নিয়ে যায়।"

দিদিমা যত বলেন কনকদাদা ততই বাধা দেয়, "সে সব শুকনো জিনিস।"

দিদিমা বললেন, "জগন্নাথের মাহাত্ম্যে খারাপ হবে না। আর এখনও বেশ ঠাণ্ডা আছে।"

শুনলেন না। কুড়ি টাকা না কত দিয়ে ভোগ আনবার ব্যবস্থা হল। পাণ্ডাকে বললেন, "বেশ ভাল করে বেঁধে গাড়িতে তুলে দে।"

তারাও বললে, খারাপ হবে না।

কনকদাদা বলল, "পুরীর বাইরে গেলে আর জগন্নাথের মাহাত্ম্য থাকবে না।"

দিদিমা সে কথায় কান দিলেন না। গাড়িতে দিদিমার কামরায় এক পাশে শুদ্ধভাবে সাবধানে রাখা হল। কেউ ছোঁবে না। তারপর সকলেই মহাপ্রসাদের কথা ভুলে গেছে। সন্ধ্যের সময় থেকে গাড়িতে একটা পচা গন্ধ বের হতে থাকল। কিসের গন্ধ কেউ বুঝতে পারছে না। যত রাত বাড়ছে, ততই গন্ধও বাড়তে লাগল। তখন কনকদাদার হঠাৎ মনে পড়তে সে বললে, "দিদি, তোমার ঐ প্রসাদ নিশ্চয় পচেছে। খুলে দেখ।"

দিদিমা বললেন, "না, কখ্খনো তা নয়।"

কনকদাদা ততই বলছে, "ঐ প্রসাদ খারাপ ছাড়া আর কিছু হতেই পারে না।"

ঐভাবে তর্ক হতে হতে কলকাতায় পৌঁছোনো গেল। স্টেশনে লোকজন গাড়ি নিয়ে হাজির ছিল। সকলে ত গাড়িতে ওঠা গেল। দিদিমা বললেন, প্রসাদের ঝুড়ি সাবধানে নিয়ে আসতে। বাড়িতে এসে খুলে দেখা গেল সেই প্রসাদ পচে ভটভট্ করছে, আর গন্ধ বেরোচ্ছে।

তখন কনকদাদা বললে, "কেমন, আমি বলেছিলুম। আমার কথা শুনলে না। এখন ফেলে দাও।"

ছোটকাকা এসে বললেন, "সত্যিই ত, স্থানের মাহাত্ম্য কোথায় যাবে! জগন্নাথ দেখিয়ে দিলেন যখন ফেলে দাও। ফ্যালো, ফ্যালো, সব ফ্যালো।"

কলকাতায় ফিরে এসে বাবা হুকুম দিলেন যে পুরীর বাড়ি বড় করে তৈরী করতে হবে। এগারোখানা ঘর হবে। আবার সকলে একসঙ্গে দিদিমাকে নিয়ে গিয়ে নিজের বাড়িতে যাতে থাকতে পারেন সেই ব্যবস্থা করলেন। পরের বার সকলে একসঙ্গে থেকে আনন্দ করেছেন। তখন আমি যাইনি।

(৪১)

প্রথমবার পুরী থেকে ফিরে এসে মাঘ মাসে কনকদাদার বিয়ে হয়। মেয়ে ঠিক করাই ছিল। দিদির ননদের মেয়ে সুষমা (বাবার নাম অমরনাথ মুখোপাধ্যায়)। দিদিমা বললেন, "আর ধুমধামে কাজ নেই। বিয়ে দিয়ে

নিয়ে এস। দেখে যাই।" যেমন মেয়েদের বিয়েতে হয় তাই সব হবে। তবে ফুলশয্যার দিন বাঈনাচ হবে। তখন তাই ব্যবস্থা হল। বিয়ে হয়ে গেলে আমরা ধরলুম যে, থিয়েটার দিতেই হবে। তখন ঠিক হল বঙ্কিমবাবুর 'ইন্দিরা' হবে। আর একটা বই 'ঝকমারী' হয়েছিল।

(৪২)

১৩১৫ সালে পৌষমাসে ছোটকাকার আর্ট স্কুলে কাজ হয়। হ্যাভেল সাহেব জোর করে ধরে কাজ দেয়। হাজার টাকা মাইনে দেবে। আর্ট স্কুলের কাজ। দিদিমা শুনে খুব খুশী হলেন। বললেন, "ছোটবেলায় রং টং মেখে খেলা করত। কাপড় নোংরা করে রাখত। কত বকেছি। আর আজ সেই অবনের হাজার টাকা মাইনের কাজ হবে, কে জানত!"

চাকরি হল বলে সেই বছর বৈশাখ মাসে ঠাকুর পরিবারের সমস্ত বাড়িতে নেমন্তন্ন করে খাওয়ান হল। সামাজিক ব্যাপার নয় বলে ব্রাহ্ম বাড়িতেও সব বলা হয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও দু-দলে একসঙ্গে খেতে বসায় গণ্ডগোল বাধে। খেতে যখন বসে কেউ বুঝতে পারেনি। একজন হঠাৎ আসন থেকে উঠে পড়লে তখন সবাই কানাকানি করতে থাকে, "এ কি অপমান করা। আগে দেখে বসা উচিত ছিল।" আসন থেকে বড জা ছোট জাকে ডেকে নিয়ে গেল। ছোট জা আমাদেরই ঘরের মেয়ে। সে অতটা বুঝতে পারেনি। তাড়াতাড়ি আলাদা নিয়ে বসানো হল। সেই থেকে আমরাও সাবধানে থাকতুম। কে কার সঙ্গে খাবে না খাবে আমরাই দেখে বসাতুম। তখন আমরা বড হয়েছি বলে আমাদের উপরই সব ভার থাকত।

(৪৩)

এরপর ছোটকাকার মেজ মেয়ে করুণাদিদির বিয়ের জন্য ছেলে দেখা হতে থাকে, তাকে ঘরে রাখবেন বলে। রবিদাদা বললেন, "আমার জানা একটি ভাল ছেলে আছে, দেখ।" মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়কে নিয়ে এলেন। বললেন, "ওর মা মারা যাওয়ায় চুপচাপ থাকে। বড় ভাই, ভাজ আছে। বাপ নেই। বইটই লেখে! একটু ভাবুক গোছের। বিয়ে দিলে সংসারী হবে।" ছোট কাকার পছন্দ হয়ে গেল। লেখাপড়া আছে, দেখতে শুনতে ভাল। বিয়ে হয়ে গেল। তখন নতুন মহল উঠেছে। দোতলায় করুণাদিদি থাকত।

মেজকাকার বড়মেয়ে বড়পুটির বিয়ের সম্বন্ধও রবিদাদাই ঠিক করে দেন, তাঁর মেজ জামাই-এর ভাই শচীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের সঙ্গে। তাকেও ঘরে রাখা হবে। ছেলেকে বিলেত পাঠানো হবে ব্যারিস্টারী পড়বার জন্য। তাড়াতাড়ি বিয়ের ঠিক হল। আষাঢ় মাসে বিয়ে হয়, কারণ ছেলে শ্রাবণ মাসে বিলেত চলে যাবে। ছেলেকে আগেই আনা হয়। সে এমন বাদলে যে যেদিন এল সেদিন থেকেই বৃষ্টি আরম্ভ হল। বিয়ের দিন এমন বৃষ্টি যে কলকাতা ভাসছে। ছেলেকে রবিদাদার লালবাড়িতে এনে রাখা হয়েছিল কাছাকাছি হবে বলে। তাও আসতে পারে না এমন অবস্থা। কোথাও বিশেষ নেমন্তন্ন হয়নি। বড়পিসী, ছোটপিসী, দিদিরা আসবে। তারাও আসতে পারছে না। আমার তখন অসুখ করেছিল বলে এখানে এসেছিলুম। তা না হলে পাথুরেঘাটা থেকে আসতে পারতুম না। দিদিদের পাল্কী করে নিয়ে আসে, তাতেও কাপড়-চোপড় সব ভিজে যায়। পাল্কীর তলা দিয়ে জল উঠছে রাস্তায় এত জল। রবিদাদার বাড়ি থেকে বরকে ছাতা ধরে আনা সত্ত্বেও তার কাপড় বদলাতে হল।

তিনদিন অবিশ্রান্ত বৃষ্টির ফলে, মেজকাকার ঘরের পিছনদিকে একটা মাঠগুদোম ছিল চিৎপুর রোড়ের উপরে, সেটা পড়ে গিয়ে কত লোক চাপা পড়ে গেল। সবাই বেঁচে যায়, কিন্তু একটা বুড়ি তার পরিবার নিয়ে সেখানে ছিল, তার দুই ছেলে, দুই বৌ সব মারা গেল। একদিন বাদে মাটি সরিয়ে দেখা যায় শুধু সেই বুড়ি আর একটা কুকুর বেঁচে আছে। চালাটার নীচে ফাঁক থাকায় বেঁচে গিয়েছিল। সেই বুড়ির কপাল চাপড়ে কী কান্না! এই ত গেল ব্যাপার। তারই ভিতর বিয়ে হয়ে গেল।

তারপর জামাই বিলেত যাচ্ছে, বন্ধুদের খাওয়াবে। সেদিনও বৃষ্টিতে চারিদিক ভাসছে। যেদিন বিলেত যায় সেদিনও বৃষ্টি। এরকম বাদলে খুব কম দেখেছি। আবার বিলেত থেকে তিন-চার বছর বাদে ব্যারিস্টার হয়ে যখন ফিরে আসে সেদিনও বৃষ্টি হয়।

বড়পুটির যে আষাঢ়ে বিয়ে হয় সেই মাসেই আমার বড়ছেলে নীতি (নীতিনাথ চট্টোপাধ্যায়) জন্মায়। আমি তার মাস চারেক আগে থাকতে জোড়াসাঁকোয় এসেছিলুম। সেই সময় বাবার নতুন ঘর তৈরী হয় লাইব্রেরী ঘরের ছাদে। বাবা যে ঘরে আগে থাকতেন, সেই ঘর কনকদাদাকে দিলেন। ছাদে তখন দুধারে দুটো কাঠের দেয়াল দেওয়া টিনের চালার বাথরুম ছিল।

একটা মা ব্যবহার করতেন, একটা আমরা ব্যবহার করতুম। পগাড়ের উপর ঘর হবে না বলে আগে ঘর ছিল না। সেই সময় ম্যাকিণ্টশ্ বার্ণকে দিয়ে একখানা ঘর তৈরী করানো হয়। আর বাকী খোলা ছাদ রইল। হাল্কা করে অ্যাস্‌বেস্টস্ আর টালির ছাদ দিয়ে একটু বারান্দা হল। বিলিয়ার্ড রুমের পাশে আগে বাথরুম ছিল না। সেইবার নতুন করে একেবারে ভিত গেঁথে একতলা থেকে তিনতলা অবধি বাথরুম হল। পাশে একটা লোহার স্পাইর‍্যাল (ঘোরান সিঁড়ি) ছিল মেথর যাবার জন্ত। সেই সময় দোতলায় উত্তর দিকের বারান্দা হয়। আর বেনেবাড়ির দিক থেকে ভিত থেকে সব ঘর ওঠে, যা এখনও দাঁড়িয়ে আছে। ইদানীং দিদিমা ঐ সিঁড়ির সামনের নতুন ঘরে থাকতেন। আগে যেখানে থাকতেন, হাসি বিয়ের পর সেইখানে থাকত।

আশ্বিন মাসে আমি শ্বশুরবাড়ি থেকে বেনারসে চলে যাই। নীতি তখন তিন মাসের। সেখানে দুমাস থাকার পর কলকাতায় ফিরে আসি। নীতিই প্রথম ছেলে। মুখে ভাত দিতে হবে। সব নেমন্তন্ন হবে কথা হচ্ছে। এমন সময় আমার শশুরের (বিমলাচরণ চট্টোপাধ্যায়) হঠাৎ প্যারালিসিস্ (পক্ষাঘাত) হয়েছে বলে খবর আসে। তিনি আমাদের সঙ্গে আসতে চাননি বলে একলাই কাশীতে রয়ে গিয়েছিলেন। গোপাললাল ভিলায় লোকজন ছিল, আর তাঁর মা (আমার দিদিশাশুড়ী চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের স্ত্রী সৌদামিনী দেবী) কাছে ছিলেন। তাঁর কাছেই রেখে এসেছিলুম। এদিকে নীতির অন্নপ্রাশন বন্ধ হয়ে গেল। আমার শাশুড়ী খবর পেয়ে আমার স্বামীকে নিয়ে বেনারসে চলে গেলেন। শ্বশুরমহাশয়কে কলকাতায় নিয়ে আসা হল চিকিৎসার জন্ত। এখানে এসে অনেকটা ভাল ছিলেন। সেইজন্ত নীতির মুখেভাত বেশ ধুমধাম করেই দিয়েছিলেন, কিন্তু তখন ওর বয়স এক বছর।

আমার বড়ছেলে যে বছর হয় সেবছর মাঘ মাসে আমার ছোট ভাই জন্মায়। অষ্টম গর্ভের ছেলে। হবার সময় মায়ের খুব কষ্ট হয়েছিল, বাঁচবার আশা ছিল না। অনেক করে ছেলেকে বাঁচানো হল। মাও সে যাত্রা বেঁচে উঠলেন। কিন্তু সে ছেলে একবছর পরেই হামজর হয়ে হাম লাঠ খেয়ে মারা গেল। তার নামকরণ হয়নি, ভোম্বল বলে ডাকা হত। আমার তখন পনের বছর বয়স।

মায়ের যখন বাঁচামরা অবস্থা, মেজকাকার যমজ মেয়েদের ছোটজন মালবিকার বিয়ে হয়। বিয়ের ব্যবস্থা আগে থেকে সব ঠিক ছিল। মায়ের হঠাৎ

ঐ অবস্থা হয়। বর এসেছে, এদিকে মায়ের অবস্থা খুব খারাপ। আমাদের মহলের দরজা বন্ধ করে বিয়ে হল। যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের দৌহিত্র জলধি মুখোপাধ্যায়ের ছেলে প্রদোষ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে বিয়ে হয়। তাঁদের আগেই বলা হয়েছিল ছেলে হবার কথা, যাতে ঐ সময় বাদ দিয়ে পরে বিয়ে হয়। তাঁরা রাজী হলেন না। কি হবে, মেয়ের বিয়ে। জোর করতে পারলেন না। তাঁরা বলেন, "নেহাতই যদি হয়, দরজা বন্ধ করে বিয়ে হবে।" যদিও তখন যে অত বাড়াবাড়ি হবে জানা ছিল না।

গানবাজনা সব বন্ধ করে দেওয়া হল। চোখের জল ফেলতে ফেলতে ঘরের দরজা বন্ধ করেই বিয়ের কাজ কোনরকমে সমাধা হয়!

মেজকাকার সব কাজেই একটা না একটা বাধা পড়তই। মেজকাকার বড়ছেলে গ্যাড়াদাদার (সমীরেন্দ্রনাথ ঠাকুর) সঙ্গে ঐ জলধিবাবুর মেয়ে প্রকৃতি দেবীর বিয়ের কথা ঠিক ছিল। কিন্তু তারও যে তারিখে বিয়ের দিন স্থির হয়েছিল তার আগেই খুব জ্বর হয়। জ্বর ছাড়ছে না, বরং বেড়েই যাচ্ছে দেখে বিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয়। ডাক্তার রোগ ধরতে পারলে না। ক্রমশঃ মাথা ফুলতে লাগল। যে তারিখে বিয়ের দিন স্থির ছিল, সেই রাতেই গ্যাড়াদাদা মারা গেল। তখন শুনলুম মাথায় নাকি প্লেগ হয়েছিল।

(৪৪)

ভোম্বলের জন্মের পরের বছর শ্রাবণ মাসে করুণাদিদির প্রথম ছেলে মোহনলাল জন্মায়। সেই সময় গাঙ্গুলীমশায় (মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়) একটা "ভুতুড়ে কাণ্ড" বলে বই লেখেন। সে বই পড়ে এবং তাঁর কাছ থেকে টেবিল চালানো শিখে আমাদেরও বেশ ঝোঁক চেপে যায়। দিনরাত সময় পেলেই টেবিল ধরে বসছি। এমন কি মা, ছোটকাকা বললেন, "তোমরা কি রকম ভূত নামাও দেখি।"

মা বললেন, "আমার আঁচলে কটা চাবি আছে বলে দাও।"

মায়ের আঁচলে গোছা করা চাবি থাকত, গোণা ছিল না। টেবিলের পায়া শব্দ করে উত্তর দিল। গুণে দেখা গেল যে কটা চাবি ছিল ঠিক ততবারই শব্দ হয়েছে। তাই দেখে ছোট কাকা বললেন, "তোমরা হাত দিয়ে টেবিল ঠেলছ। ও হবে না। আমি একটা এমন প্রশ্ন করব যার উত্তর তোমরা কেউ জান না। যদি টেবিল বলতে পারে তবে বিশ্বাস করব কিছু শক্তি আছে।"

ছোটকাকা আমাকে বললেন, "তোর মা বাসী বিয়ের দিন এসে কোথায় বসেছিলেন বলতে বল্।" আমি আর করুণাদিদি দুজনে টেবিল ধরেছিলুম সবাই সাধারণতঃ হলে এসে বসে। তাই আমরা চেষ্টা করছিলুম যাতে টেবিল হলেই যায়। কিন্তু টেবিলটা খালি উল্টোদিকে টানছে, আর আমাদের হাত পিছলে যাচ্ছে। তখন ছোটকাকা বললেন, "তোমরা টেবিল ঠেলছ কেন? যেদিকে টেবিল যেতে চায় যেতে দাও।" তখন সেই টেবিল হলের উঁচু মেঝে থেকে চার পাঁচ ধাপ সিঁড়ি নেমে চলে এল বারান্দায়। তার পরে ডানদিকে বাবার শোবার ঘরে চলে গেল। তখন ছোটকাকা বললেন, "থাম, আর যেতে হবে না। বুঝেছি। তোমার মা বাসী বিয়ের দিন ঐখানে এসে বসেছিলেন।" আমরা যে কথা কেউ জানতুম না, কারও মুখে শুনিও নি। তখন ছোটকাকা ও মায়ের একটু বিশ্বাস হল যে একটা কিছু স্পিরিট আছে।

সেই থেকে আমাদের টেবিল চালানো আরও বেড়ে গেল। টেবিল চালাতে চালাতে একবার কিরকম বদ্ আত্মা ভর করে। সে কিছুতেই স্থির হয়ে কোন কথার জবাব দিত না এবং থাকতে চাইত না। আমরা জোর করে তাকে আনতুম টেবিলটা তাড়াতাড়ি উঠত বলে। আমরা শ্বশুরবাড়ি গিয়ে সেখানেও আমি ঐ খেলা আরম্ভ করলুম। একদিন একটা টেবিল হঠাৎ মড়মড়িয়ে ভেঙে যায়। সেই থেকে আমার কিরকম একটা ভয় ভয় করত। ভয় পেয়ে আমার খুব অসুখ হয়। তখন দিদিমা আমাকে শ্বশুরবাড়ি থেকে নিয়ে এলেন। ভাল গণৎকারকে দিয়ে মাদুলী দিলেন। দিদিমার ঐ সবে খুব বিশ্বাস ছিল। যাই হোক ভয় পাওয়াটা অনেকটা কমে গে- কিন্তু অল্প অল্প জর হয়ে শরীর খুব দুর্বল হয়ে যায়। ডাক্তার বললে, "গায়ে রক্ত নেই; চেঞ্জে নিয়ে যান। আবার এলাহাবাদে যাওয়া হল। দিদিরা জামাইরাও সেবার গিয়েছিল সকলে মিলে বেশ আনন্দেই কাটছিল। হঠাৎ আমার শ্বশুরের অসুখ খুব বেড়ে ওঠায় তাঁকে আবার বেনারসে নিয়ে আসা হল। কারণ তিনি কাশীতেই দেহরক্ষার ইচ্ছায় প্রতিজ্ঞা করিয়ে তবে কলকাতায় গিয়েছিলেন। এলাহাবাদে থাকতে আমার স্বামী এসে আমাকে নিয়ে গেলেন; শ্বশুরমশায় মারা গেলে আমরা কলকাতায় চলে আসি। বাবারা ওদিকে এলাহাবাদ থেকে কলকাতায় ফেরেন।

(৪৫)

কলকাতায় আসার পর একদিন ছোটপিসী বললেন, "এখন মেয়েরা সকলে বড় হয়েছে সবাই আছে, এইবেলা ওদের দিয়ে একটা থিয়েটার করালে হয় না ?" দিদিমা, বাবা সকলে বললেন, "খুব ভাল হয়। তবে সব মেয়েরা সাজবে ছেলেদের দিয়ে হবে না। শ্বশুরবাড়ি থেকে আপত্তি করতে পারে। মেয়েদের সব বিয়ে হয়ে গেছে।"

তাই ঠিক হল। কি বই হবে ? ছোটপিসী বললেন, বঙ্কিমবাবুর মৃণালিনী হোক। তখন কে কোন পার্টের উপযুক্ত হবে ঠিক করা হল। দিদি গাইতে পারত, গিরিজা হবে। নেলীদিদি মণিমালা আর বড়পুটি মৃণালিনী, বৌঠান মাধবাচার্য, মেজবৌঠান পশুপতি, আমি মনোরমা। ছোটপুটি হৃষীকেশ আর নেলীদিদির ননদ চণ্ডীদাসী ব্যোমকেশ সেজেছিল। দাশুদিদি হেমচন্দ্র সাজে।

বাবা, কাকারাই রিহার্সল দেওয়াতেন। সন্ধ্যাবেলায় যখন দিদিমা হলে বসতেন সেই সময়। ছোটপিসী রবিবারে রবিবারে আসতেন। তখন তিনি বেনেপুকুরে চলে গেছেন। তিনি এসে গান শেখাতেন। হলের একদিকে বাবার ঘরের দিকটায় স্টেজ বাঁধা হয়েছিল। বাবার ঘরের পাশে একটা ছোট ঘর ছিল সেখানে আমরা শুতুম। সেইখানে সাজঘর হয়েছিল। স্টেজের ভিতর নৌকা দেখানো, কাপড় দিয়ে জলের ঢেউ করা হয়েছিল। গিরিজা গান গাইতে গাইতে নৌকা বেয়ে চলে যায়। নৌকা দোলার সঙ্গে সঙ্গে নিজেও দুলতে থাকে। বাবা নিজে দাঁড়িয়ে থেকে স্টেজ সাজানো শিখিয়েছিলেন। কনকদাদাও সঙ্গে ছিল। আমাদের সাজানো, দাড়ি গোঁফ আঁকা সব কনকদাদাই করেছিল। খুব চমৎকার হয়। সব মেয়েদের শ্বশুরবাড়ি ও আত্মীয়দের বাড়ি নেমন্তন্ন করা হয়েছিল। পুরুষদের বিশেষ বলা হয়নি মেয়েমহলের ব্যাপার বলে! বইটার শেষের দিকে বাদ দেওয়া হয়েছিল। পশুপতি মারা যায়, মনোরমা বিধবা হবে, সে দৃশ্য দেখানো হল না। পশুপতি মনোরমার হাত ধরে কাশী চলে যাবে, সেইখানেই শেষ।

(৪৬)

ছোট পিসীর ছোট মেয়ে অম্বুজা দিদির বিয়ে বেনেপুকুরে গিয়ে হয়েছিল। সেই রাত্রেই মেজ কাকার বড় ছেলে গ্যাড়া দাদা মারা যায় বলে বিয়েতে কেউ

যেতে পারেনি। দ্বারকানাথের বৈমাত্রেয় ভাই রমানাথ ঠাকুরের বাড়ি বিয়ে হয়, তাঁর প্রপৌত্র অরবিন্দ ঠাকুরের সঙ্গে।

(৪৭)

ছোট পিসী নিজের বাড়িতে গিয়ে ছবি আঁকতে শুরু করেন, একেবারে নিজস্ব ধারায়। মাঝে মাঝে বাবাকে দেখিয়ে নিয়ে যেতেন। দিনকতক অসিত হালদারের কাছে শিখেছিলেন। বাবা কিন্তু কখনও কারও কাছে শেখেননি। নিজেই নিজের শিক্ষক ছিলেন। মনে যা এসেছে তাই হাত দিয়ে বেরিয়েছে।

আমি একবার শ্বশুর বাড়ি থেকে এসে বাইরের বারান্দায় বাবার সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে দেখি বাবা আঁকছেন, আর ছোট কাকা হাতে করে কি তৈরী করছেন। আমি ছোট কাকাকে জিজ্ঞেস করলুম, "ওটা আবার কি করছ?" তিনি দেখালেন, খানিকটা মোম নিয়ে চটকে পুতুল তৈরী করছেন। পাশে গড়গড়ার আগুনে তাপ দিয়ে নরম করছেন। আর একটু একটু ছাই দিয়ে কালো করছেন। আমার আগ্রহ হয়, জানতে চাই যে ছাই দিচ্ছেন কেন। বললেন যে মোমটা চটকাতে গেলে হাতের ময়লায় কালো রঙ হয়ে যায়, অথচ এক রঙ হয় না। তাই ছাই দিয়ে এক রঙ করছেন। তারপর নরুণ দিয়ে কেটে নাক, চোখ গড়বেন। আমারও সখ হয়। ঐ রকম করে পুতুল তৈরী করে দেখাতে যাই। তাই দেখে বললেন, "বাঃ, চমৎকার হয়েছে।" আমি তখন বাড়ি তৈরী করছি দেখেছিলেন। বললেন, "আমাকে একটা বাড়ি করে দিতে পারিস্? কাগজের বাড়িতে হবে না। আমি তাতে জল ঢেলে শেওলা পড়াব। ফোয়ারার পাশে রেখে দেব। তাতে ঝরণা থাকবে, কলের তলায় রাখলে ঝরণা দিয়ে জল পড়বে। পারবি?"

আমি বললুম, "আচ্ছা করে দেব।"

আমার ঐ সবের খুব সখ ছিল। তখন বললেন, "গাছ ছোট করে কি করে জানিস্?"

আমি বললুম, "না, তা তো জানি না।"

তিনি বললেন, "খুব ছোট জায়গায় মাটি বেশী না দিয়ে গাছ পুঁতবি। যে গাছ শীগ্‌গির মরে না, যেমন তেঁতুল, বট কিম্বা অশথ গাছ, টবে পুঁতে জল দিবি। আর ডগায় নতুন পাতা বের হলে নখে করে ছিঁড়ে দিবি। তা হলে

গাছ আর বাড়বে না। গোড়া মোটা হবে, লম্বা হবে না। বেশী মাটি পেলে গাছ বেড়ে যাবে। চেষ্টা করে দেখিস্।

আমি চেষ্টা করেছিলুম, কিন্তু ধৈর্য থাকেনি। তবে মোমের পুতুল তৈরী করেছিলুম। আরও ভাল করে রঙ দিয়ে মোমটা গালিয়ে রঙ করে নিয়েছিলুম। যশোদা গোপালকে গোষ্ঠে যাবার জন্য সাজিয়ে দিচ্ছেন। প্রথমে কেষ্ট তৈরী করে কাকাকে দেখাতে নিয়ে যাই। বাবা বললেন, "ভাল হয়েছে বটে, তবে প্রোপোর্শন ঠিক হয়নি।" তখন বুঝিয়ে দিলেন কিরকম মাপের হবে। এইভাবে আমাকে কত কি বুঝিয়ে দিয়েছেন। ঐ রকম উৎসাহ তাঁদের কাছে বার বার পেয়েছি। বাড়িতে এসে আবার মাপ করে পুতুল তৈরী করে দেখাতে যেতে বলেন, "খুব চমৎকার হয়েছে।" ছোট কাকাকেও সিমেণ্ট দিয়ে জালের উপর জমিয়ে, একটা পাহাড় অঞ্চলের বাংলো তৈরী করে দিয়েছিলুম। কয়লা দিয়ে পাহাড়, তাতে টিনের কৌটো ছেঁদা করে বসিয়ে দিই ; যাতে বেশী ভারী না হয়, সরানো যায়। কলের তলায় রাখলে পাহাড়ের গায়ে ঝরণার মতো জল ঝরে পড়ত। ছোট কাকা খুব খুশী হয়েছিলেন। বললেন, "আমি এই রকমই চেয়েছিলুম, যাতে শেওলা পড়বে। চমৎকার হয়েছে!"

কাগজের বাড়ি কত রকমের করেছিলুম। যে দেখেছে কেড়ে নিয়ে গেছে। একবার বাবা বললেন, "একটা বাড়ি করে এক্সিবিশনে দে।" সেবারও বড় করে একটা বাড়ি তৈরী করে দিয়েছিলুম। পাহাড়ের উপর শিবমন্দিরে সন্ন্যাসী ধুনী জ্বালিয়ে ধ্যান করছে। ঠিক ছবির মতন। সেটা বিক্রী হয়নি, ফিরে এসেছিল। আমার ছোট বোন সুজাতা নিয়ে যায়। রায়টের সময় মুসলমানেরা মন্দির দেখে গ্লাস্‌কেস্ শুদ্ধ উপর থেকে ফেলে ভেঙে নষ্ট করে দেয়। সে তখন তার পার্ক সার্কাসের বাড়িতে ছিল।

(৪৮)

দিদিমার একবার হঠাৎ কি খেয়াল হয়, বোধহয় বৌঠানকে খেলা দিয়ে ভুলিয়ে রাখবার জন্য বললেন, "নাতবৌ, তুই পুতুলের বিয়ে দে। তোর ছেলে, নেলীর মেয়ের বিয়ে হবে। সব জোগাড় কর্।"

দুই ভাল বিবি পুতুল এল। তাদের মাপে সব পুঁতি দিয়ে গেঁথে জড়োয়া গয়না তৈরী করা হল। মাপ করা ছোট ছোট রূপোর গয়না গড়ানো হয়। মেয়েরা সব কাপড়ে পাড় বসিয়ে জামাকাপড় সেলাই করতে লগল। সে সময়

বাড়িতেই কাঠের মিস্ত্রী কাজ করছিল। তাদের দিয়ে ছোট খাট, আলমারী, ফার্নিচার সব তৈরী করানো হল। গায়েহলুদ যাবে বলে ছোট ছোট খাবারের অর্ডার দেওয়া হয়। ছোট রূপোর বাটি, থালা আশীর্বাদী যাবে। তবে নেমন্তন্ন খালি মেয়ে, জামাই, মাসী পিসীদের ; আর বৌঠানের বাপের বাড়িতে বলা হল। নেলী দিদির শ্বশুর বাড়ি কাছেই ছিল। সেখানে ফিটন গাড়ি চড়ে বর গেল। দাসীদের ছেলেমেয়েরা ছোট ছোট নাপিত, নাপতানী সেজে সব গায়ে হলুদের তত্ত্ব নিয়ে যায়। ছোট ছোট ফুলের গয়না, অর্ডার দিয়ে তৈরী করানো, ফুলশয্যার তত্ত্ব এল। চারিদিকের সকলে দেখছে পুতুলের বিয়ে হচ্ছে। চিৎপুর রোড দিয়ে তত্ত্ব যাচ্ছে আসছে। দোতলার হলে বর-বৌ বসানো হল। শ্যামসুন্দর ওস্তাদকে দিয়ে পঞ্চাশ টাকার মধ্যে ছোট দেখে বাইজী আনানো হয়! মেয়েজামাইরা আনন্দ করবে। হল ছেড়ে দিয়ে বাবুরা সব সরে গেলেন। তখনকার দিনে রূপোর দু আনি পাওয়া যেতে। সেই দু আনি বরকনের যৌতুক পড়তে লাগল। মেয়েজামাইদের আনন্দ করতে ছেড়ে দিয়ে মা দিদিমারা আনাচে কানাচে থেকে আড়ি পাততেও বাদ গেলেন না। দানের কত পিতল কাঁসা রূপোর বাসন, সবকিছু ছোট ছোট দেওয়া হয়। আমাদের ঐ রকম আনন্দ মাঝে মাঝেই লেগে থাকত।

দিদিমা যে শুধু খেলা দিতেই পারতেন তা নয়, বাবা কাকাদের মত দিদিমাকেও দেখেছি যার যা গুণ আছে তাকে সেই সম্পর্কে খুব উৎসাহ দিতেন। একবার ১১ই মাঘের সময় জোড়াসাঁকোতে এসেছিলুম। কিন্তু তখন শ্বশুর বাড়ির আপত্তির জন্য বড় বাড়িতে যেতে না পারায় ১১ই মাঘের গানের স্বরলিপি দেখে, কনক দাদার ঘরে অর্গ্যান ছিল, তাতেই গান বাজিয়ে অভ্যাস করছিলুম। হাসি তখন ছ-সাত বছরের হবে। সে আমার কাছে দাঁড়িয়ে বাজনা শুনে শুনে গাইতে শেখে। একদিন সে নীচের বারান্দায় দাঁড়িয়ে সেই গান গাইছে, হল থেকে শুনতে পেয়েছিলেন। তিনি হাসিকে ডেকে বললেন, "বেশ তো গাইছিলি। গা দেখি, শুনি।" ও লজ্জায় কিছুতেই গাইবে না, দিদিমার দিকেও চাইবে না। তখন দিদিমা বাবাকে ডেকে বলেন, "তোর ছোট মেয়ের খুব সুন্দর গানের গলা হয়েছে। ওকে শ্যামসুন্দরের কাছে দে গান শিখতে। আমার সামনে কিছুতেই গাইছে না।" সেই হাসি বড় হয়ে কি সুন্দর গাইতে শিখেছিল, গলাও খুব ভাল হয়েছিল। বাবার গুণও কিছুটা পায়। কনে সাজানোর হাত এমন হয়েছিল যে ওর সাজানোর গুণে সাধারণ কালো

মেয়েকেও সুন্দর দেখাত। আমাদের পরিবারের ভিতর যারই বিয়ে হত, ওর ডাক পড়ত কনে সাজাতে। এমনকি বাইরের বন্ধুবান্ধবেরাও কনে সাজানোর জন্য ডেকে নিয়ে যায়। একবার বাবা অনেক বড বড় সাহেবদের পার্টি দিয়েছিলেন। তখনও ওর বিয়ে হয়নি। সেই আসরে হাসিকে দিয়ে রবিদাদার গান গাইয়েছিলেন। "জীবনে যত পূজা হল না সারা" ঐ গানটা গেয়েছিল। সাহেবরা ওর গান শুনে একেবারে মোহিত হয়ে যায়। এমন তন্ময় হয়ে শোনে যে, মদের গেলাস হাত থেকে পডে যাচ্ছে খেয়াল নেই।

(৪৯)

দিদিমা বেঁচে থাকতে কত লোক আসতে দেখতুম। একদিন হঠাৎ দেখি মুকুল দে এসেছে। ও তখন ছোট, ছোট কাকার সঙ্গে আর্টস্কুলে যায। দিদিমা চাকরদের বলতেন, "মুকুল স্কুল থেকে এসে খাবে। খাবার ঢাকা দিয়ে রাখ্।" দিদিকে সে মা বলে ডাকত। সেই মুকুল পরে আর্টস্কুলের প্রিন্সিপাল হয়েছিল। মুকুল যে কে, কোথা থেকে এল কিছুই জানতুম না। পরে শুনেছিলুম ওর কিছু হল না বলে ওর বাবা ওকে আঁকা শেখানোব জন্য বাবার কাছে রেখে যায়। প্রথমে ছোট কাকার কাছে বলেছিল। ছোট কাকা রাখতে রাজী হলেন না। তখন বাবা ওকে রেখে দেন। বাবাব কাছে কেউ এলে তাকে কোল দিতে কৃপণতা করতেন না। পরে কিন্তু ছোট কাকার সঙ্গেই স্কুলে যেত। দাদা যখন আশ্রয় দিয়েছেন তখন তিনি আর কিছু বললেন না। তিন ভাইয়ের এইরকম ব্যবহাব সব কাজেই দেখা যেত।

(৫০)

মেজ কাকার মেজ ছেলে সুধাদস দাদার (সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর) বিয়ে দিদিমা থেকে দিয়ে যান। কাজেই সব কিছুই আমাদের বিয়ের অনুকরণে হয়। বিয়ের সব ঠিক। গায়ে হলুদের আগের দিন। আমরা সব এসেছি। বাডিতে লোকে লোকারণ্য। পান সাজা তরকারী কাটা চলছে। বারান্দায় দিদিমা বসে সবাইকে নির্দেশ দিচ্ছেন। ঝিয়েরা, মেয়েরা সবাই সারি সারি বসে গেছে। বামুন, চাকর সবাই ব্যস্ত হয়ে ছোটাছুটি করছে। সে এক দেখবার মত ব্যাপার। আমরা সব বোনেরা, ভাজেরা গায়েহলুদের তত্ত্ব সাজাতে ব্যস্ত। নতুন উঠোনে ভিয়েন বসেছে। তখন বেনেবাড়ির মহল উঠেছে। থরে থরে

সাজানো আছে খাবার। ভারে ভারে দই, ক্ষীর আসছে। সরকারেরা ফর্দ করছে। বাড়ি গমগম করছে। জামাইরা সবাই উপস্থিত। আমার বড় ভগ্নীপতি প্রভাতনাথ চট্টোপাধ্যায় খেতে খুব ভালবাসত। সে উপরের বারান্দা থেকে ভিয়েনকর বামুনকে ডেকে বলছে, "কান্তি, কিছু মিঠাই ছাড়। খেয়ে দেখি কেমন হল।" পুরনো ভিয়েনকরের নাম ছিল প্রসন্ন! সে মারা গেলে এই সময় ছিল কান্তি। তার সহকারী ছিল অমূল্য। তারা জামাইবাবুকে চিনত, তখুনি চাখতে পাঠাচ্ছে।

এমন সময় ছোট পিসী বেনেপুকুর থেকে এসে হাজির হলেন। চুপিচুপি দিদিমাকে বললেন, "তোমরা তো দেখছি সব বিয়ে দেবার জন্য তৈরী। মেয়ের বাড়িতে গিয়ে দেখলুম তারাও খুব তৈরী হচ্ছে।" মেয়ের বাড়ি ছিল জোড়া-গীর্জার কাছে। জোড়াগীর্জার কর্তামার ভাইপো কুমুদ মজুমদারের বড় মেয়ে ছোট পিসী বললেন, দেখে এলুম, কালই কথামত গায়ে হলুদ হবে। কিন্তু আমার নাপিতের কাছে শুনে দেখতে গিয়েছিলুম। দেখি সে মেয়েকে কিছুতেই কালকে পি ড়িতে বসিয়ে গাযে হলুদ দেওয়া যেতে পারবে না।"

দিদিমা অবাক হয়ে বললেন, "কেন, কি হয়েছে?"

তখন ছোট পিসী বললেন, "তার হামজ্বর হয়েছে। খুব জ্বর। মুখটুখ লাল হয়ে ফুলে উঠেছে। সে উঠে বসতে পারছে না। তাব উপর ওরা তাকে ওষুধ খাইয়ে জ্বর চেপে দেবাব চেষ্টা করছে। মেয়েটা মারা যাবে। হয় দিন পিছিয়ে দাও, না হয় বিয়ে বন্ধ কর। তোমরা একবার সেখানে যাও, গিয়ে দেখে এস।" তখন মেয়ের মা মারা গেছেন। আগে থেকে কথা দেওয়া হয়েছিল। কর্তামা বেঁচে থাকতেই বিয়ের ঠিক হয়।

দিদিমা তো শুনেই ক্ষেপে গেলেন, বললেন, "ডাক্ গগনকে, সমরকে। গাড়ি যুতে আনতে বল্। আমি দেখে আসি। ও মেয়ে না হয় অন্য মেয়ে এনে এক লগ্নেই বিয়ে দেব।"

তখনই বাবা, মেজ কাকা এসে সব শুনলেন। মেজ কাকী, মেজ কাকা শুনে কাঁদতে লাগলেন। দিদিমা কাঁদছেন। এরকম ব্যাপার কখনও হয়নি। চারদিকে সব চুপচাপ হয়ে গেল। কারও মুখে হাসি নেই। যে যা করছিল সব থেমে গেল।

মেজ কাকী বলতে লাগলেন, "আমার কোন কাজ ভালভাবে হবে না!"

বাবা বললেন, তোমরা কান্নাকাটি করছ কেন? এখন থামো। গাড়ি আনতে পাঠিয়েছি, মাকে নিয়ে দেখে আসি! তারপর যা হয় করা যাবে। এখন সব বন্ধ রাখো।"

সব বন্ধ হয়ে গেল। চারিদিক থমথম করতে লাগল। দিদিমাকে নিয়ে বাবা, মেজকাকা চলে গেলেন। আমরা সব মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগলুম। দিদিমা ফিরে এলে কি ব্যাপার হবে কে জানে। সবাই অপেক্ষা করছি। দিদিমা তো এলেন। একেবারে রেগে অস্থির। বললেন, আগে একটু খবর পেলে দিন পিছিয়ে দিতে পারতুম। এখন বাধা পড়ল, অন্য মেয়ে ঐ লগ্নেই দেব। আমাদের পুরনো নাপিত চন্দ্র সেই সময় উপস্থিত ছিল। তখনকার দিনে সব ঠাকুর বাবুদের বাড়িতেই সে কাজ করত। তাকে বললেন, "তুই যা ছোট রাজার (সৌরীন্দ্র মোহন ঠাকুর) বাড়ি। আমার বোনঝির মেয়ে আছে। দেখতে সুন্দর। তার সঙ্গে ঘটকালী কর্। বখ্‌সিস্ পাবি। বল্‌গে আমি তার মেয়েকে চাই!"

নাপিত তো তখুনই যাবে বলে তৈরী। তখন বাবা দিদিমাকে ছেলেমানুষের মত ভোলাতে লাগলেন, "এখন থামুন, মন ভাল নয়। মাথা ঠাণ্ডা হলে ভেবেচিন্তে মেয়ে দেখা যাবে।"

দিদিমা কিছুতেই রাজী হতে চান না। বললেন, "যা কয়লা হাটার কাকীমাকে নিয়ে আয়। তিনি বুড়োমানুষ, কি পরামর্শ দেন, আগে শুনি।" তিনি রমানাথ ঠাকুরের পুত্রবধূ। তাঁকে পাল্কী পাঠিয়ে আনা হল। তিনি এসে বললেন, "বিয়েতে যখন বাধা পড়েছে, আর তোমাদের মনে খটকা লেগেছে, তখন না দেওয়াই ভাল।"

তিনি তো পরামর্শ দিয়ে চলে গেলেন। এদিকে দিদিমাও বেঁকে বসলেন, কিছুতেই ঐ মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দেবেন না। বাবা বললেন, "এখন তো সব বন্ধ করুন। তারপর যা হয় করা যাবে। কুমুদকে আসতে বলেছি। তার সঙ্গে কথা কই।"

দিদিমা বললেন, "তোদের তো জানি। কুমুদ এসে ধরবে, আর তুই সব ভুলে যাবি। তা হবে না।"

বাবা বললেন, "না না, তাকে বলে দেব, হবে না।"

তখনকার মত দিদিমাকে ঠাণ্ডা করলেন। এদিকে তখন সব যেখানে যেখানে ফোন আছে ফোন করা হল, আর যেখানে ফোন নেই, লোক পাঠিয়ে

চিঠি দিয়ে নেমন্তন্ন বন্ধ রাখা হল। দোকানের অর্ডারী খাবার-দাবার যতটা পারা যায় বারণ করা হল। ভিয়েন বন্ধ হল। আর যে সব মাল এসে গিয়েছিল, সব বাড়িতেই খাওয়াদাওয়া হল। অনেকে খবর না পাওয়ায় এসে পড়েছিল, তাঁরা ছাঁদা বেঁধে নিয়ে গেল। খাবার ও দই বাড়ি বাড়ি বিলি কবা হল। তখনকাব দিন বলে অত বুঝতে পাবা যায়নি যে কত অপচয় হয়েছে। ওরকম খাওয়াদাওয়া প্রায়ই হতে দেখা যেত। এইভাবে সেবার বিয়ে থামা পডল।

এরপব মেয়ের বাবা এলে ঠিক হয় যে মাঘ মাস তো গেল, তাবপর চৈত্র মাস বাদ দিয়ে ভাল দিন দেখে আবার বিয়ের দিন স্থির হবে। ততদিনে মেয়েব শবীরও সেরে যাবে। এই বলে বাবা তাঁকে বিদায় দিলেন।

এদিকে আবার দিদিমাকে জানাতে হবে কি ঠিক হল। বাবা এসে বললেন, "কুমুদ এসেছিল। তাকে বলে দিয়েছি এখন এত তাডাতাডি আর বিয়ে হবে না।'

দিদিমা বললেন, "তুই কি বলেছিস আমি তা জানি। কুমুদকে দেখেই সব ভুলে গেছিস্ তো?"

বাবা বললেন, "মেয়েব বাপেব পক্ষে ভাল ঘরে মেয়েব পাত্র পাওয়া আজ কত কষ্টকর তা তো বুঝতে পারছেন? এখানে বিয়ে ভেঙে গেলে সে কোথায় আবার পাত্র খুঁজে বেডাবে? আব আমাদেবও এতদিন আগে থেকে কথা কয়ে রাখা উচিত হয়নি।"

তখন দিদিমা বুঝলেন যে আমাদেরও অন্যায় হয়েছে অত আগে থেকে কথা দিয়ে ফেলে রাখা। সত্যিই, মেয়েব বাবা মেয়ে কোথায় যাবে? তখন বললেন, "বেশ, ঐ মেয়েব সঙ্গেই বিয়ে দেব। কিন্তু কুমুদের বাড়ি থেকে দেব না। যদি পাথুরেঘাটায় নিয়ে এসে মেজমেয়েব কাছে বাখে তবেই দেব। মেজমেয়ে হলেন আমার শাশুডী সবোজিনী দেবী। কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের মেজমেয়ে বলে সকলেই তাঁকে মেজ মেয়ে বলে ডাকত। তাঁব বড কোন নীরজিনী দেবীর নাতনী উমাশশীব সঙ্গে বিয়ে হচ্ছিল। সেই রকমই ঠিক হল। আমি গিয়ে বলতে আমাব শাশুড়ী খুশীব সঙ্গে রাজী হলেন। বললেন, "বেশ তো, মাসীমাব যখন আমার কাছ থেকে বিয়ে দিতে ইচ্ছে হয়েছে, তাই হবে। দিন স্থির করতে বল।"

আষাঢ মাসে দিন ঠিক হল। বৃষ্টিব সময় বলে বেশী কিছু কবা হবে না।

বিয়ে ভালয় ভালয় হয়ে গেলে তখন বৌ আনার পর খাওয়াদাওয়া হবে। তাই হোল। বৌ আসার পর খাওয়াদাওয়া, থিয়েটারও হয়েছিল।

তখন প্যাণ্ডেলে ইলেকট্রিক পাখা লাগাবার জন্য ফ্যান ভাড়া পাওয়া যেত না। হাতে হাতে তালপাতার পাখা দেওয়া হোত। সেবার খেয়াল হোল, কাগজের জাপানী পাখা পাওয়া যায়, অনেক একসঙ্গে কিনলে তালপাতার পাখার চেয়ে সস্তা হবে, দেখতেও ভাল লাগে, সকলের হাতে হাতে তাই একটা করে দেওয়া হবে। থিয়েটারের দিন একগাদা পাখা এল। আমাদের বললেন, "তোরা যে যা পারিস্ বেছে নে।" আমরা সব ভাল দেখে বেছে নিলুম। আর অন্যগুলো নিমন্ত্রিতদের হাতে বিলি করা হোল। থিয়েটার বোধহয় 'কাল পরিণয়' হয়েছিল।

(৫১)

এর পর কিছু দিন বাদে ছোটকাকার বড ছেলে অলোকের বিয়ে হয়। তখন অনেক বাদ দিয়ে অল্প করে নিমন্ত্রণ করা হয়, যাদের না বললে নয়। তখন অনেক কুটুম বেড়ে গেছে। নিরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের ছেলে নিত্যরঞ্জন মুখোপাধ্যায় তাঁর মেয়ে পারুলের সঙ্গে বিয়ে হয়।

তখন ছোটকাকা কাজ করছেন। প্রায় দুশো জন ছাত্র বরযাত্রী যাবে। পুরুষরা সকলে বর নিয়ে বেরিয়ে গেল। তার পর ছোটকাকা টেলিফোন করে জানালেন, "বর বিয়েতে বসেছে। বিয়ে হয়ে গেলে আমার ছাত্রদের নিয়ে চলে যাব। যেন দুশো জনের মত খাবার তৈরী থাকে।" তখনকার দিনে লোকজন এমন ছিল যে, মুখের আদেশ পেলেই কাজ আর দেখতে হত না। এখানে সব তৈরী আছে। ছোটকাকা ছাত্রদের সঙ্গে নিয়ে চলে এলেন। বললেন, "বিয়ে হয়ে গেছে। সেখানে ছাত্রদের খাতিরের অভাব হচ্ছে দেখে নিয়ে এলুম।" এখানে এসে ছাত্রেরা সকলে খেল। তখন রাত দশটা হবে। আমাদের বাড়ি দশটার বেশী রাত করা হোত না। যতই লোক হোক না কেন। সকাল সকাল খাওয়াতে শুরু করা হোত।

(৫২)

এর পর থেকেই দিদিমা আর কারও বিয়ে দেখে যেতে পারেননি। সেই থেকেই তাঁর শরীর ক্রমশঃ খারাপ হচ্ছিল। অলোকের বিয়ের সময় দ্বিজেন্দ্রলাল

মায়ের 'বিরহ' নাটকের অভিনয় হয়। তার পর থেকে বাড়িতে বিয়ের সময় থিয়েটার হওয়া বন্ধ হয়ে যায়।

দিদিমার অত নাতিনাতনী থাকা সত্ত্বেও নাতনীদের বিয়ে দিতে বেগ পেতে হয়নি। সকলকারই ভাল ঘরে বিয়ে হয়েছিল। দিদিমা নাতনীদের অনেকের ছেলেদেরও দেখে গেছেন। কিন্তু কনকদাদার একটি ছেলে দেখে যাওয়ার ইচ্ছে ছিল, তা আর হয়ে উঠল না। মারা যাবার আগে শুনে গেছেন কনকদাদার মেয়ে জন্মাবে। সব সাধ তো আর মানুষের মেটে না। তিনি তাঁর নিজের ছেলেমেয়েদের, বৌদের সকলকে রেখে গেছেন। তাঁর যখন খুব শরীর খারাপ হয়, হলে গিয়ে বসতে পারতেন না, হল ফাঁকা পড়ে থাকত। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে, বাংলা ১৩১৮ সালের ভাদ্রমাসের ভোরবেলা দিদিমা মারা যান। জোড়াসাঁকোর বাড়ি অন্ধকার করে চলে গেলেন। মা বাবা যেতে ছোটকাকা তো ছেলেমানুষের মত কাঁদতে লাগলেন। আমরা সবাই খবর পেয়ে শ্বশুরবাড়ি থেকে চলে আসি। নাতি নাতজামাইরা সকলে চারিদিকে ঘিরে শ্মশানে নিয়ে যায়। তাঁর শ্রাদ্ধে বেশী কিছু খাওয়াদাওয়া হয়নি। কাঙালী বিদায় হয়। আর বৃষোৎসর্গ করে বৃষকাঠ বাড়ির বাগানে পুঁতে তার উপর স্মৃতিস্তম্ভ করে দেন। আর বাকী টাকা যা খরচ করবার তা হাসপাতালে দিয়েছিলেন। বাবা বললেন, "লোক খাইয়ে আনন্দ করে লাভ নেই। তার চেয়ে এতে যা খরচ হবে তাঁর নামে সে টাকা হাসপাতালে দেওয়া হোক।"

সেইবারই আশ্বিন মাসে আমার মেজছেলে (দিতিনাথ চট্টোপাধ্যায়) হয়। পরের জ্যৈষ্ঠমাসে কনকদাদার বড়মেয়ে অনুভা জন্মায়। আমার বড়বোনের বড়মেয়ে সুমনা ও দুই ছেলে প্রীতিনাথ চট্টোপাধ্যায় ও মনোজনাথ চট্টোপাধ্যায়কে দিদিমা দেখে গেছেন। পরে দিদির আরও তিন ছেলে (কার্তিক, দ্বারকানাথ ও নারায়ণ) এবং দুই মেয়ে (চিত্রা এবং মীনাক্ষী) জন্মগ্রহণ করে। কনকদাদার আরও পাঁচ মেয়ে (গৌরী, বকুলা, করবী, এবং শুক্লা) ও তিন ছেলে (গীতীন্দ্রনাথ, কবীন্দ্রনাথ এবং সুশান্ত ঠাকুর) পরে হয়েছিল। নবুর দুই ছেলে (গৌরেন্দ্র ও নতীন্দ্র) ও দুই মেয়ে (আরতি ও দীপালি)। আমার ছোট বোন সুজাতার বিয়ে অনেক পরে হয়েছিল। তার একটি মাত্র ছেলে (সঞ্জয়কুমার মুখোপাধ্যায়) হয়েছে। এদের বাবা দেখে গেছেন।

দিদিমা মারা যাবার পর বাবা হলে বসতেন বটে, কিন্তু সেরকম জমজমাট

আর হোত না। হল যেন অন্ধকার লাগত। ক্রমে ক্রমে বাবা হলে বসা ছেড়ে দিয়ে নিজের শোবার ঘরে নাতিদের নিয়ে গল্প, খেলা নিয়ে থাকতেন। ছোট একটা ফিল্ম প্রজেক্টব এনেছিলেন ; সিনেমা দেখাতেন। গ্রামোফোনে উড়েদের যাত্রার রেকর্ড চালিয়ে শোনাতেন। আমার বড়ছেলে নীতি এবং দিদির দুই ছেলে প্রীতি ও মনোজের সঙ্গে নানারকম মজা করতেন। কাগজে কতবকম এঁকে তাই কেটে নিযে ছাযাবাজি দেখাতেন। বাল্মীকি প্রতিভার স্টেজ কবে সে সব ছেলেদের দেখাতেন। আমার বডছেলে নীতির সঙ্গে ক্টিনষ্টি করতে ভালবাসতেন। সে একটু ভালমানুষ ছিল, দুষ্টুমি করতে পারত না। বাবার কাছে কাছে থাকত। বাবা একটা কাঠের এরোপ্লেন নিজের হাতে তৈরী কবে ছাদ থেকে বাগানে ছাডতেন। একটু ভাবী হয়ে যাওয়ায় সেটা উপর দিকে ভাল উঠত না। সেটা নীতিকে দিয়ে দিয়েছিলেন। সে নিয়ে খেলা করত। এইভাবে বাবা প্রায়ই সন্ধ্যেবেলাটা ছেলেদেব সঙ্গে খেলা নিযেই কাটিয়ে দিতেন।

মাঝে মাঝে পচাকাকাকে কাছে বসিযে গান শুনতেন। সে ভাল শ্যামাসঙ্গীত গাইতে পাবত। গান শুনতে শুনতে চোখে জল আসত। অনেক সময় ঘর অন্ধকাব করে গান শুনতেন। একটা গান মনে পডে

"আঁধাবেতে ভয় করি না আঁধার আমি বাসি ভাল
ভয়ের আকার দেখলে পরে ডাকি আমার শ্যামা মাকে
ছাযাপথে দেখতে পাই সে মাযেব রাঙা পায়ের আলো
আঁধার দেখলে মনে পডে শ্যামা মা মোর এমনি কালো।"

গান শুনে কালীর একটা ছবি এঁকেছিলেন। শ্মশানে মডা পুডছে। চিতার উপর কালো ধোঁযার ভিতর থেকে কালীমূর্তি অভয় দিচ্ছেন। ছবিটাতে প্রাইজ পেয়েছিলেন। সেটা অনেক দামে বিক্রী হযে যায়। বোধহয় ঘব অন্ধকার করে দিয়ে অন্ধকারেব রূপ চিন্তা করতেন।

(৫৩)

এর পর বাবা দার্জিলিঙে বেডাতে যান। আমাকে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু আমার শাশুডী মত করলেন না বলে আমার যাওয়া হল না। দিদি ও তার ছেলেমেয়েদেব সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন। আমার ভগ্নীপতিও সঙ্গে ছিল। সেখান থেকে নীতিকে মজা করে কতরকম ছবি এঁকে চিঠি লিখেছিলেন। ও

তখন বিশপ স্‌ কলেজে পড়ছে। সেই সব মজার ছবি ও চিঠি আমার কাছে আজও রয়েছে। ওর জ্বর হয়েছে শুনে ওকে একটা চিঠি লেখেন। সেটা এখনো দেখানো যেতে পারে। দার্জিলিঙে বসে বরফের পাহাড়েরও কতরকম ছবি এঁকেছিলেন। নিজের ছবি—ঘোড়ায় চড়ে বেড়াচ্ছেন—এঁকে আমায় পাঠিয়েছিলেন। আমি যাইনি বলে আমাকে দেখাবার জন্য সেখানকার খুঁটিনাটি সব কিছু ছবি এঁকে পাঠাতেন। ছবি দেখে মনে হত যেন নিজের চোখেই সবকিছু দেখছি। সেখানে ফ্লাওয়ার শো হয়, তার ছবিও এঁকে পাঠিয়েছিলেন। ছবির সম্বন্ধে কত গভীর চিন্তা করতেন এইসব ছবি দেখলে বোঝা যায়। দার্জিলিঙে বেড়াতে গিয়ে বরফের পাহাড় সকলেই দেখতে পেয়েছে, কিন্তু তার মধ্যে হরগৌরীর মুখ কটা লোক আবিষ্কার করতে পেরেছে? কলকাতায় ফিরে এসে সেই বরফের পাহাড়ের ছবি দেখিয়ে আমাকে বললেন, "হরগৌরীর মুখ কোথায় দেখ্‌ত?" আমি দেখতে পেলুম না। তখন দেখিয়ে দিলেন স্পষ্ট চোখমুখ দেখা যাচ্ছে। ভুটিয়া বস্তিতে বেড়াতে গিয়ে বাবা তাদের মুখোশ পরা নাচ দেখেন। পরে কাগজ কেটে ছায়াবাজি করে তাই আমাদের দেখান। ভুটিয়া বস্তিতে ঘুরে ঘুরে কতরকম জিনিস কিনতেন। একটা আসল মুক্তোর লকেট পাঁচ টাকাতে কিনে এনেছিলেন। সেটা হাসিকে দেন। আর একবার একটা নোলকের মত বড় মুক্তো আসল ভেবেঁ কিনেছিলেন। কিন্তু সেটা আসল নয়। অনেককেই দেখালেন, কেউ নকল বলে ধরতে পারেনি। তখন দেখবার জন্য বাবা সেটা জলের গেলাসে ফেলে দেন। জলে পড়ে তার গাটা একটু কুঁচকে যায়। তখন ছুরি দিয়ে আস্তে চেঁছে দেখেন কাঁচের পুঁতির উপর কলাই করা। আমাকে দেখিয়ে বললেন, "দেখ্‌তো এটা আসল কি নকল?"

আমি তখন দেখে বললুম, "না আসল নয় এ কাঁচের"

বাবা বললেন, "কেউ ধরতে পারলে না, তুই কি করে বুঝলি?"

আমি বললুম, "কেন, ঐ তো বোঝা যাচ্ছে কাঁচের।"

তখন বললেন, "ও, আমি ছুরি দিয়ে একটু চেঁছেছি তাই দেখে ধরেছিস্‌।

আমারও একটু সন্ধানী দৃষ্টি বরাবর ছিল। চট্‌ করে কিছু বিশ্বাস করতুম না। তাতে খুশীই হয়েছিলেন।

আমার মেজছেলে দিতি যখন পাঁচ মাসের তখন পর্যন্ত আমার শাশুড়ী পাথুরেঘাটায় বাপের বাড়িতেই ছিলেন।

সেবার মাঘমাসে সরস্বতীপুজোর সময় খাবারের দোষ হওয়ায় পাথুরেঘাটায় কলেরা দেখা দেয়। আমার ভাশুরের ছোট মেয়ে কলেরা হয়ে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই মারা যায়। তারপর আমার ভাশুরেরও কলেরা হয়। সেই দেখে আমার শাশুড়ী আমাকে ছেলেদের সঙ্গে বাবার কাছে পাঠিয়ে দেন। ভাশুরের ছেলেমেয়েদেরও তাদের মামার বাড়ি সরিয়ে দিলেন। তারপর আমার ভাশুরও মারা যান। তখন পাথুরেঘাটার সকলে বাড়ি ছেড়ে পার্ক স্ট্রীটে হেম গোঁসাইয়ের বাড়ি ভাড়া নিয়ে চলে গেলেন। তখন আমার শাশুড়ী বললেন, "আমি আর পাথুরেঘাটায় গিয়ে থাকতে পারব না।" আমাদের তখন এণ্টালীতে হাতিবাগানে নিজেদের বাড়ি কেনা হয়ে গেছে, কিন্তু মেরামত হচ্ছে। পার্ক স্ট্রীট থেকে বরানগরের বাগানে চলে গেলেন। তখন আমাকেও নিয়ে গেলেন। বৈশাখ মাস, গরমের সময়। গঙ্গার ধারে বেশ ভাল লাগত। বাগান থেকে এসে বৈশাখ মাসে দিন দেখে গৃহপ্রবেশ করে তিনদিন বাড়িতে থেকে চলে গেলেন। আষাঢ় মাসের প্রথমেই নিজেদের বাড়িতে যাওয়া হল।

সেই থেকেই বাবার কাছ ছাড়া হয়ে দূরে চলে গেলুম। আমার তখন মোটার গাড়ি ছিল না। বাবা গাড়ী না পাঠালে বেশী আর জোড়াসাঁকোয় আসতে পারতুম না। জোড়াসাঁকোয় কি হচ্ছে সব খবর জানা যেত না। পরে শুনতে পেতুম। আমরাও তখন পুরো সংসারী হয়েছি। যখন জোড়াসাঁকোয় আসতুম, আমাদের তিন বোন ও দুই ভাজেদের কথা আর শেষ হত না। বাবার ঘরের সামনে বারান্দা ও খানিকটা ছাদ ছিল। সেইখানে মাদুর পেতে মা শুতেন। বাবা ঘরে খাটে শুয়ে থাকতেন। শীতের সময় রোদ পোহানো হোত, আর যত আমাদের মনের কথা হোত। গরমের সময় রোদ পড়ে গেলে দক্ষিণে হাওয়ায় আটটা অবধি বসে গল্প হোত। মেজকাকা, ছোটকাকা ও কাকীমারাও এসে গল্পে যোগ দিতেন। বাবা বলতেন, "তোরা মুখোমুখি বসে এত কি গল্প করছিস্, আর হাসছিস্?" সত্যিই সেদিন আমাদের কথা আর ফুরোত না। এমনি করেই আমাদের দিন কেটেছে। যতদিন মা বাবা ছিলেন দুঃখ কি ভাবতেই পারতুম না, তাঁদের কোলে আগলে রেখেছিলেন।

বারান্দার সামনে ছাদে মা নানারকম ফুলের গাছ লাগাতেন। একবার গিয়ে দেখি বাবা কোত্থেকে একটা ছোট কলাগাছ এনে লাগিয়েছেন, একহাঁতের চেয়েও ছোট। একদিন দেখি তাতে মোচাশুদ্ধ কলার কাঁদি ঝুলছে। এক ইঞ্চির চেয়েও ছোট ছোট কলা হয়েছিল। কি সুন্দর দেখতে! হাসি তার চারা নিজের বাড়িতে এনে লাগিয়েছিল। বোধহয় এখনও তার কাছে আছে। আমিও নিয়েছিলুম, কিন্তু আমার বাড়ি বিক্রী হয়ে যাওয়ায় নষ্ট হয়ে গেল।

(৫৫)

দিদিমার মৃত্যুর পর আরও দুবার বাবার সঙ্গে পুরীতে গিয়েছিলুম। তখন খালি বাবা নিজের পরিবার নিয়ে যান। আমরা ভাইবোনেরা সবাই ছিলুম। ছোটকাকা, মেজকাকারা কেউ যাননি। বাবা সমুদ্রের ধারে বারান্দায় বসে ছবি আঁকতেন। আমার বড়ছেলে নীতি কাছে বসে থাকত। তার একখানা পোর্ট্রেট সেই সময় আঁকেন। দিদির ছেলেরা প্রীতি, মনোজও বাবার কাছে বসে থাকত। আমি ছেলেদের পান খাওয়া পছন্দ করতুম না। বাবা খাবার পর পান খেতেন। তার থেকে নীতিকে পান খেতে দিতেন, দিয়ে সে যখন খেত আমাকে ডেকে বলতেন, "দেখ বুড়ি, তোমার ছেলে পান খেয়েছে।" আমি যেই মারতে যেতুম, তাকে কোলের কাছে লুকিয়ে রেখে তখন বলতেন, "না না ও খায়নি, আমি দিয়েছি।"

সেবার প্রতিভা পিসী (দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সেজছেলে হেমেন্দ্রনাথের মেয়ে) ও পিসেমশায়ও (আশুতোষ চৌধুরী) পুরীতে ছিলেন। বাবার সঙ্গে এসে গল্প করতেন। নীতি বেশ ছড়া বলতে পারত, ওর মুখ থেকে ছড়া শুনতেন। ওদের নিয়ে বাবা খুব হাসিঠাট্টা করতেন। প্রীতি, মনোজ খুব দুষ্টু ছিল। দুষ্টুমি করত বলে তাদের ময়লা কাপড়ের ব্যাগে পুরে আটকে দিতেন। সেইসঙ্গে নীতিকেও বাদ দিতেন না। বলতেন, "ওরা যখন ঢুকছে, ওই বা কেন বাদ যায়। ওকেও পুরে দাও।" তিনটে ব্যাগে তিনজনকে পুরে বারান্দায় ছেড়ে দিতেন। প্রীতি, মনোজ বুদ্ধি করে গড়াতে আরম্ভ করত। গড়াতে গড়াতে সিঁড়ি দিয়ে বারান্দার উপর থেকে বালিতে গিয়ে পড়ত। জানতেন লাগবে না, তাই কিছু বলতেন না। ছবি আঁকতে আঁকতে মজা দেখে মিচকে মিচকে হাসতেন। নীতিকে বলতেন, "যা যা, তুই ও গড়া" এই বলে তাকেও এগিয়ে দিতেন। ছেলেদের সঙ্গে এইরকম মজা করা তাঁর অভ্যেস ছিল।

আমাদের বাড়ির সামনে এক হোটেল হয়েছিল। সেখানে এক মেম থাকত। সে এসে মায়ের সঙ্গে আলাপ জমিয়েছিল। সে ভাঙা ভাঙা বাংলা বলতে পারত। হিন্দীতেও কথা বলত। মা হিন্দী ভাল বলতে পারতেন। সে জিজ্ঞেস করত, "এত বড় ফ্যামিলি কার? সব কি তোমার?" মা বলতেন, "হ্যাঁ, আমারই সব।" সে বলত, "ভেরি বিগ্ বিগ্ ফ্যামিলি।" মা বলতেন, "দেখলে, বিগ্ বিগ্ ফ্যামিলি বলে খুঁড়ে গেল।"

বাবা ফিরে আসার পরের বছর ছোটকাকা তাঁর পরিবার নিয়ে পুরীতে যান। সেখানে গিয়ে তাঁরা কোনারকের মন্দির দেখতে গিয়েছিলেন। ফিরে এসে বাবার কছে সেই মন্দিরের গল্প করেন। সেই শুনে বাবারও কোনারক দেখবার ইচ্ছে হয়। তার পরের বছর আবার বাবা আমাদের সকলকে নিয়ে পুরী গেলেন। সেবার কোনারকের মন্দির দেখতে যাওয়া হয়। সেখানে যেতে তখন পাল্কীতে কুড়ি মাইল যেতে হত। ওখানে ট্রেন যেত না। সমুদ্রের ধারে ধারে পাল্কী যেত। কোনও রাস্তা ছিল না। বাবা বললেন, "আগে আমি আর তোমাদের মা দেখে আসি। তোমরা বাড়িতে থাক। আমরা ফিরে এলে তারপর তোমরা যেও।"

তাই ঠিক হোল। পাল্কী ভাড়া করা হোল। খাবার দাবারের জিনিস নিয়ে গরুর গাড়িতে লোকজনকে রাত্তির আটটায় রওনা করিয়ে দিয়ে বাবা, মা খাওয়াদাওয়া সেরে রাত দশটার সময় বেরোলেন, সঙ্গে লণ্ঠন হাতে এক চাকর। ভোর চারটের সময় চন্দ্রভাগায় গিয়ে সূর্যোদয় দেখতে পাওয়া যাবে। সাত ঘোড়ার রথে সূর্য ওঠেন প্রবাদ আছে, তাই দেখতে হবে।

সেদিন গেল। পরদিনও সারাদিন, সারারাত কেটে গেল। তার পরদিন সকাল আটটা নটা নাগাত ফিরে এলেন। আমরা অপেক্ষা করছি কিরকম দেখে এলেন বাবার মুখে গল্প শুনব। বাবা মা এসে যখন পৌঁছলেন আমরা জিজ্ঞেস করতে বাবা বললেন, "সাতঘোড়ার রথে সূর্যোদয় আমি দেখেছি।" মা বললেন, "কৈ, আমি তো রথ টথ দেখিনি।" বাবা বললেন, "তুমি দেখতে পাওনি, কিন্তু আমি পেয়েছি। মেঘের ভিতর আগে ঠিক সাতটা ঘোড়ার মুখ দেখা গেল। তারপর রথের চাকা দেখা গেল। তারপরে মেঘের ভিতর থেকে সূর্যের রশ্মি দেখা গেল। তার ভিতর থেকে সূর্যোদয় হল দেখতে পেলুম। যে যেমন ভাবে মেঘের ছবি তার কাছে সেইরকম দেখায়।"

তার পরের দিন আমাদের যাওয়া ঠিক হল। মা, বাবা বাড়িতে রইলেন। ছোট ছেলেরা সব মায়ের কাছেই রইল।

এবারও আটটার সময় লোকজনেরা গরুর গাড়িতে রওনা হয়ে গেল। চারখানা পাল্কী একসঙ্গে যাবে। একটা পাল্কীতে কনকদা, একটাতে মেজবৌঠান আর একটাতে আমি। অন্যটাতে নবু আর হাসি ছোট ছিল বলে একসঙ্গে উঠল। রাত দশটায় বেরোনো হোল। এক একটা পাল্কীতে ছজন করে বেহারা। লণ্ঠন নিয়ে চাকর সঙ্গে রইল। প্রত্যেক পাল্কীর সঙ্গে থেকে একজন করে লোক বাঁশী বাজিয়ে সাড়া দেয়, যাতে কেউ দল ছেড়ে ছুটকে না পড়ে। কারণ সেখানে গাছপালা বা রাস্তার চিহ্নমাত্র নেই। কেবল বালি আর সমুদ্র। মাঝে মাঝে কেয়াবন।

সারারাত ঘুম নেই, দেখতে দেখতে চলেছি। মাঝ রাতে শোনা গেল নবু-হাসির পাল্কীটা দেখা যাচ্ছে না। বাঁশী বাজাতে বাজাতে তিনখানা পাল্কী এল। আর একখানার আর সাড়া নেই। আমাদের তো ভাবনা হতে লাগল। আমরা বললুম, "পাল্কী নামাও। আগে ওদের পাল্কী আসুক, তারপর আবার যাবে।" ছেলেমানুষ দুজন, ওদের পাল্কী কোথায় গেল? পাল্কী নামিয়ে বাঁশী বাজাতে লাগল। অনেকক্ষণ ধরে বাঁশী বাজাতে বাজাতে শেষে বাঁশীর উত্তর পাওয়া গেল। আলোও দেখা গেল। আবার এক জায়গায় এসে চারখানা পাল্কী একসঙ্গে চলল। নবু তো ভয়ে কাঁদতে শুরু করল। এবারে ওদের পাল্কী মাঝখানে রেখে সাবধানে যেতে বলা হোল। মাঝে মাঝে বাঁশী বাজিয়ে সাড়া দিতে দিতে ভোরবেলা চন্দ্রভাগায় পৌঁছনো গেল। চন্দ্রভাগায় গিয়ে সূর্যোদয় দেখলুম। কিন্তু আমরা সূর্যের রথ-টথ কিছু দেখতে পাইনি। সেই বাঁক থেকে টুপ করে সূর্য উদয় হোল।

চন্দ্রভাগা থেকে এসে মন্দির দেখতে গেলুম। মন্দিরটাই ঘোড়ায় টানা রথের মত, চাকা আছে। সেই চাকায় কি সুন্দর কাজ, যেন সূচের কাজের মত সূক্ষ্ম কাজ করা। প্রমাণ সাইজ কষ্টিপাথরের সূর্যমূর্তি, এক হাতে পদ্ম, আর একহাতে সাতটা ঘোড়ার রাশ ধরা। সূর্যমূর্তি দেখলে মনে হয় যেন মোমের মূর্তি, চকচক করছে। হাতের পদ্ম এমন সরু ডাঁটির উপর রয়েছে যে মনে হয় যেন মোচড় দিলেই ভেঙে আসবে। কিন্তু মোচড় দিয়ে ভাঙতে পারা গেল না। মন্দিরের মাথায় প্রমাণ সাইজ মানুষের মূর্তি। দূর থেকে দেখলে মনে হয় সত্যিকারের মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু কাছে গিয়ে দেখা

গেল। সেগুলো মন্দিরের গায়ে খোদাই করা। নীচে থেকে দেখে আমরা বলাবলি করছিলুম, "দেখ কারা মন্দিরের মাথায় উঠেছে।" কিন্তু উপরে উঠে দেখলুম মানুষ নয়, সেগুলো রং করা পাথরের বড় বড় মূর্তি। উপরে চারিদিকে ঘুরে দেখা শেষ হলে নেমে এসে মুখ হাত পা ধুয়ে চা খেয়ে নিয়ে যা দেখবার ছিল দেখলুম। ওখানে মন্দির ছাড়া আর কিছু বিশেষ দেখবার নেই। সমুদ্রের ঢেউ লেগে মন্দিরের ভাঙাচোরা অংশ চারিদিকে ছড়িয়ে আছে।

সেইসব দেখে আসতে আসতে খিদে পেয়ে গেল। চাকরেরা আগেই গিয়ে সব ঠিক করে রেখেছিল। ওখানকার কুয়োর জল এত চমৎকার যে একগ্লাস জল খেলেই হজম হয়ে যায়। আর জল এত মিষ্টি যে ওখানে জল খেলেই বোঝা যায়। একবার খেলে তখুনি আবার খেতে ইচ্ছে করে।

রাতের খাওয়াদাওয়া সেরেই আবার পাল্কীতে উঠতে হবে, কারণ সেখানে থাকার জায়গা নেই। সন্ধ্যে হতেই শেয়ালের ডাক শোনা যেতে লাগল। শেয়ালের ডাক শুনে নবু তো কাঁদতে শুরু করল, বললে, "ভয় করছে।" তাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে আটটা পর্যন্ত রাখা হোল। রাত নটার সময় ওখান থেকে ফের পাল্কীতে উঠলুম। এবার নবু-হাসিদের পাল্কী সাবধানে সঙ্গে সঙ্গে বাঁশী বাজিয়ে আসতে লাগল।

সকাল নটা নাগাত পুরীতে এসে পেঁছিনো গেল। এসে দেখি বাবা-মা আমাদের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছেন। আসতেই বাবা জিজ্ঞেস করলেন, "সূর্যের রথ দেখেছ?"

আমরা বললুম, "কৈ, তুমি যেরকম বর্ণনা দিলে সেরকম দেখিনি।"

তাই শুনে বাবা বললেন, "দেখলে তো তোমাদের ভাগ্যে নেই, তাই দেখতে পেলে না।"

চন্দ্রভাগায় মেঘের কালো কোল ঘেঁষে সূর্যের উদয় হয়, তখন সমুদ্রের বাঁকটা স্পষ্ট দেখা যায়। আকাশ পরিষ্কার না থাকলে সূর্যোদয় বোঝা যায় না। মনে হয় সব সমান। সমুদ্রের বাঁকও দেখা যায় না। সূর্যোদয়ের সময় সেই বাঁকের মুখে আগে সূর্যের রশ্মি চোখে পড়ে। তারপর সমুদ্রের গোল রেখা দেখা যায়। সেই রশ্মির ভিতর থেকে রথের মত দেখা যায়। তাই বলে সাত ঘোড়ার রথ সমুদ্রের রথ সমুদ্র থেকে উঠে আসে। চিন্তা করলে মনে হয় যে ঘোড়াও আছে। বাবা শিল্পীর মন নিয়ে দেখেছিলেন,

তাই সেই ছায়াতে ঘোড়াও দেখেছিলেন। আমাদের অত গভীর চিন্তা ছিল না বলে আমরা দেখতে পাইনি।

(৫৬)

জোড়াসাঁকোয় যখনই আসতুম বাবার মুখ থেকে নানারকম গল্প শুনতে পেতুম। তখন কিউবিজম্ আঁকছেন। একদিন বললেন, "বিলেত যাবি?" আমি ভাবলুম চালাকী করছেন। বললেন তা নয়, কোন সাহেব নাকি বাবাকে বলেছে, "তুমি একবার বিলেতে গিয়ে কিউবিজম্ সম্বন্ধে লেক্‌চার দেবে, চল।" বাবা বললেন, "আমি তাকে বললুম, আমি কখনও লেক্‌চার দিইনি। ও সব আমার দ্বারা হবে না। কিছুতেই সাহেব ছাড়বে না। আমি আপত্তি করলুম, আমাব পরিবার সব ছেড়ে বিলেতে গিয়ে থাকতে পারব না। তাতে বললে, তোমার কোনও খরচ লাগবে না। একবার রাজী হলে তোমার ছেলেমেয়ে যারা আছে, এমনকি তোমার হুঁকোবরদারকেও নিয়ে যাবো। তোমার কিছু চিন্তা করতে হবে না। তুমি খালি মত কর।" আমি শুনে বললুম, "তোমার দৌলতে যদি বিলেত ঘুরে আসি, নিশ্চয় যাবো।" বাবা লেক্‌চারের ভয়ে গেলেন না।

(৫৭)

বোধ হয় উনিশশো তের কি চোদ্দ সালে আমার ঠিক মনে নেই প্রতিমা দিদির যখন রথীকাকার সঙ্গে বিয়ে হয়, সেই সময় বাবা বৌঠানের বিয়ে দেবার ইচ্ছে প্রকাশ করেন। কিন্তু বৌঠান রাজী হয়নি বলে জোর করে দিতে পারলেন না। কারণ পরের মেয়েকে নিজের মেয়ের মত রেখেছেন। আবাব কার হাতে দেবেন? কষ্ট পেলে বাবাই দায়ী হবেন। তাই ভেবে থেমে গেলেন। এর কিছুকাল বাদে গলায় মাম্‌পস্ হয়ে বৌঠান দু-একদিনের জ্বরেতেই মারা যায়। তখন বাবা দুঃখ করে বললেন, "আজ আমিও বাঁচলুম।" তাতেই বোঝা যায় তার জন্য চিন্তা সব সময় বাবার মনে মনে ছিল, ভুলতে পারতেন না।

বৌঠান মারা যাবার পর মুসৌরীর পাহাড়ে যাওয়া হয়। সেবার আমার শরীর খারাপ থাকায় আমাকেও সঙ্গে নিয়ে যান। পুজোর পর যাওয়া হয়। দিন ঠিক করে বাবা আমাকে জানালেন। আমি ছেলেদের নিয়ে জোড়া-

সাঁকোতে এলুম। তখন নীতি পাঁচ ও দিতি তিন বছরের। সুব্রত তখন পেটে।

দেরাদুন এক্সপ্রেসেতে যাব, আটটা চল্লিশের গাড়ি। রাত্রের খাওয়া-দাওয়া সেরে একসঙ্গেই সব রওনা হলুম। আমার মেজমাসীর ছেলে সুপ্রকাশদাদা (সুপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়) ও তার স্ত্রী তনুও (তনুজা) আমাদের সঙ্গে গেল।

কোন স্টেশন মনে নেই, ভোরবেলা সেখানে গাড়ি থামতেই ব্রেকফাস্ট দিয়ে গেল। সবাই খেয়ে নিলুম। আবার বারটা নাগাত কারি-ভাতের অর্ডার দেওয়া হল পরের এক স্টেশনে। তখন বড় বড় স্টেশনে হোটেলের ব্যবস্থা থাকত। আগে থেকে ফোন করে দিলে তারা গাড়ি থামলে খাবার গাড়িতেই তুলে দিয়ে যেত। পরে অন্য স্টেশনে বাসন নামিয়ে নিয়ে যেত। তা ছাড়া যাবার সময় একজন বড় অফিসার সেই গাড়িতে যাচ্ছিল বলে আমাদের গাড়ির সঙ্গে ডাইনিং কার ছিল এবং বারান্দা দেওয়া গাড়ি পাওয়া গিয়েছিল। মা হোটেলে খাবার খেতেন না বলে সঙ্গে লুচি তরকারী নিয়ে যেতেন। দেরাদুনে পৌঁছতে দু-দিন দু রাত লাগবে, ঐ বাসী খাবার খাবেন বলে বাবা বকতে লাগলেন, “কেন হোটেলের খাবার খাবে না? আমি বলছি খাও। ঐ বাসী খাবার খেতে হবে না।” মা কিছুতেই শুনতেন না। মন্ত্র নিলে নাকি খেতে নেই। বাবা বলতেন, “আমার চেয়ে তোমার কাছে কে বড়? আমি বলছি, খেলে কিছু দোষ হবে না।” মা তাতেও শুনতেন না।

যাবার সময় গোপালের জ্বর হয়ে পড়ে। তার জ্বর হলেই ফিট হত বলে সঙ্গে থার্মাসে বরফ, ওডিকোলন নেওয়া হল; তার মানুষ করা দাসীকে গাড়িতে নেওয়া হয়েছিল। যাই হোক, গাড়িতে উঠে আর কিছু হয়নি। জ্বর ছেড়ে গেল, ভালভাবে রাত কেটে গেল।

বারান্দা দেওয়া গাড়ি ছিল বলে দরকার হলে চাকরদাসীদের ডাকা যাচ্ছিল। আমরা রাত্রে সবাই ডাইনিংকারে গিয়ে খেয়ে এলুম। তারপর বিছানা পেতে শুয়ে পড়া গেল। আমি, আমার ছেলেরা, মা, বাবা, নবু, হাসি একটা গাড়িতে ছিল—অনু (অনুভা) ভানি (গৌরী) একটু বড় হয়েছে, প্রীতি তখন ছ-মাসের হবে। সুপ্রকাশদাদা ও তনু ওদের গাড়িতেই ওঠে।

অনেক রাত্রে যখন শোণ ব্রিজের উপর দিয়ে গাড়ি যাচ্ছে, বাবা আমাদের

ডেকে বললেন, "দেখ, আমরা শোণ নদের উপর দিয়ে চলেছি।" আমরা সব উঠে দেখলুম। রাত তিনটের সময় গাড়ি কেটে রেখে দিয়ে গেল। বাবা বললেন, "ওঠো, এইবার টানেলের ভিতর দিয়ে যাবে।" তখন ভোর হচ্ছে। কিন্তু টানেলের ভিতর দিয়ে যাচ্ছে বলে চারিদিক অন্ধকার। গাড়িতে আলো জ্বালতে হল, না হলে কিছুই দেখা হচ্ছে না।

ভোর চারটের সময় দেরাদুন স্টেশনে এসে পেঁছিলুম। তখন অল্প অল্প বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে। স্টেশন থেকে ট্যাক্সিতে সাতটা নাগাত রাজপুরে আসা হল। লোকজন ছিল, জিনিসপত্র নামিয়ে নিয়ে তারা পরে আসবে। আমরা আগে চলে এলুম। রাজপুরে হোটেলে মাথাপিছু দশটাকা করে নিয়ে তারা নাওয়া-খাওয়ার সব বন্দোবস্ত করে দিল। রাজপুরেই সকলে মুখ-হাত-পা ধুয়ে তৈরী হয়ে নিল, ঠাণ্ডায় চান করা আর হল না। হোটেলের খাবার খেয়ে ডাণ্ডীতে ওঠা হল আটটা নাগাদ। তখনও গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে। সেইটাই খারাপ লাগে। যদিও তখন শীত পড়েনি, তবু উপরে উঠতে বেশ ঠাণ্ডা বোধ হচ্ছিল। গোপালের জ্বরটা তখন সব ছেড়েছে, তাকে বেশ করে কম্বল মুড়ে দেওয়া হল।

প্রত্যেকের একটা করে ডাণ্ডী। ছোট বাচ্চারা মায়েদের সঙ্গে উঠল। নবু-হাসি তখন ছোট বলে একটা ডাণ্ডীতে ওঠে, আর একটায় নীতি আর গোপাল একসঙ্গে। আমুদিনী নামে মেজবৌঠানের দাসী ছিল, তার সঙ্গে অমুকে দেওয়া হয়; সে এক দৃশ্য, পাহাড়ের উপর ডাণ্ডীর প্রোসেশন চলল। কথা রইল হাফ-ওয়েতে গিয়ে সকলে জিরিয়ে আবার ওঠা হবে। সেখানে ডাকবাংলো আছে। ফোন করে খবর দিলে তারা আবার খাবারের ব্যবস্থা করে দেবে। সেখানে এসে দেখা গেল আর সবাই এসেছে, কিন্তু গোপালদের ডাণ্ডীটা ভুল পথে গেছে। আসতে দেরী দেখে আবার জিরিয়ে খেয়ে লোকজনদের আগে খাইয়ে জিনিসপত্র সঙ্গে দিয়ে রওনা করিয়ে আমরা পরে যাত্রা করলুম। লোকজনদের বলা হল জল গরম করে রাখবে, গিয়ে সবাই চান করবে। আর রান্নার ব্যবস্থাও করতে হবে। লোকজনেরা চলে গেল তখন দশটা এগারটা হবে। বারটার পর আমাদের যাত্রা শুরু হল।

আমাদের বাড়িতে পেঁছুতে তিনটে বেজে গেল। ক্যামেল ব্যাক রোড়ের উপর ছোট্ট নতুন বাড়িটি। চমৎকার পরিষ্কার। লাল টালির ছাদ। রাস্তা থেকে খানিকটা নেমে গিয়ে পাহাড়ের উপর তিনটে মাত্র বাড়ি সেখানে।

আর বাড়ি ছিল না। আমাদের বাড়িটা দোতলা ছিল। পাহাড়ের গায়ে গাছপালার মধ্যে দূর থেকে ঠিক একটা ছবির মত দেখতে। দোতলায় মাঝে হল। পিছনদিকে দুটো বেডরুম, লাগাও বাথরুম। পাশে খাবার ঘর। খানিক নেমে গিয়ে রান্নাঘর, চাকরদের ঘর, দোতলার শোবার ঘরের একটাতে একপাশে আমি আমার ছেলেদের নিয়ে থাকতুম আর একপাশে নবু-হাসি শুত। আর একটা ঘরে মা, বাবা গোপালকে নিয়ে থাকতেন। নীচের একটা ঘরে কনকদাদা, মেজবৌঠান ছেলেমেয়েদের নিয়ে ছিল। আর তার পাশের ঘরে সুপ্রকাশদাদা থাকত। তার ছেলেমেয়ে ছিল না। নীচের হলে সকাল সন্ধ্যেয় বসা হত। উপরের হলটা খালি ছিল দেখে বাবা পরে দিদিকে আসতে লিখে দেন। আসবার সময় দিদি কান্নাকাটি করেছিল বলে বলেছিলেন, "বাড়ি ছোট। যদি কুলিয়ে যায় দেখি পরে লিখব, তুমি যেও। এখন মন খারাপ কোর না।" আমার ভগ্নীপতি খবর পেয়ে দিদিদের পৌঁছে দিয়ে আসে। তখন দিদির সবে চারটি ছেলে হয়েছে—প্রীতি, মনোজ, কার্তিক ও দ্বারিক। বড় মেয়ের তখন বিয়ে হয়ে গিয়েছিল। সে যায়নি, শ্বশুরবাড়িতে ছিল।

সেখানে পৌঁছে জিনিস গুছিয়ে, ঘর খুলে চান করতে করতে বেলা চারটে বাজল। চাকরদের বলা হল, সকাল সকাল সব খাওয়া সেরে শুয়ে পড়া হবে। যেন দেরী না করে। তখন ওখানে বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে। বিছানায় কম্বল পাতা, তবুও ছ্যাকছ্যাক করছে। রাত্তির আটটার মধ্যেই খাওয়াদাওয়া সেরে শুয়ে পড়া গেল। সকলেই ক্লান্ত ছিল। শোবার সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়ল।

ভোরবেলায় চোখে রোদ পড়তে ঘুম ভেঙে গেল। আমি যে ঘরে ছিলুম সেটা পূবদিকে। সূর্যোদয় দেখা যেত। কাঁচের জানলা দিয়ে বাইরে দেখি কি চমৎকার পাহাড়ের দৃশ্য। মেঘ কেটে গিয়ে পরিষ্কার রোদ উঠে চারিদিক যেন হাসছে। মনটাও কলকাতার বাঁধন থেকে বেরিয়ে এসে আনন্দে নাচতে লাগল। এর আগে আমি পাহাড়ে যাইনি, সেই আমার প্রথম যাওয়া।

চা-টা খাওয়া হলে বেড়াতে বেরনো গেল। বাবাও জোব্বা গায়ে, লাঠি হাতে, মাথায় লম্বা টুপি পরে বেরিয়ে পড়লেন। মা বাড়িতে সব খাওয়ার বন্দোবস্ত করতে লাগলেন। আমাদের বাড়ি থেকে উপরের বাড়িটাতে এক নবাব ছিলেন। বাবা তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে গেলেন। নবাবের স্ত্রীর সঙ্গে

আমাদের আলাপ হয়েছিল। আমাদের বাড়িতে এসে রান্না শেখাতেন। কড়াইশুটি দিয়ে মুর্গীর মাংস কী চমৎকার রাঁধতেন। নবাবও প্রায়ই বাবার কাছে এসে খুব গল্প করতেন।

আমাদের বাড়ির সামনের রাস্তার উপরে একটা ম্যাল ছিল। সেখানে বেঞ্চ পাতা ছিল। ছেলেরা সেখানে গিয়ে খেলা করত।

বাবা নীচের হলে পাশের জানলা খুলে পাহাড়ের দৃশ্য দেখতেন, আর সেইখানে বসেই ছবি আঁকতেন। তার পাশেই জানলার নীচে একটা খদ ছিল, গাছে ঢাকা। সেখান থেকে ঝরঝর আওয়াজ পাওয়া যেত, কিন্তু কিছুই দেখা যেত না। ওখানকার চাকরেরা সেদিক দিয়ে পাকদণ্ডীর রাস্তা ধরে আসত। একদিন বাবা তাদের জিজ্ঞেস করলেন, "ওখান থেকে কি করে তোরা আসিস্? চারিদিকে তো জঙ্গল।" তারা বললে, "পাহাড়ের গায়ে গায়ে রাস্তা আছে। আমরা গাছের ডাল ধরে উঠি। পথ কম হয়।" বাবা প্রশ্ন করেন, "জলের আওয়াজ শোনা যায় যে, ওখানে কি ঝরণা আছে?" ওরা বলল, "হাঁ বাবু, অনেক নীচে দিয়ে ঝরণার জল আসে। অনেক সময় ওখানে ভালুক আসে জল খেতে।"

আমার তখন ছোট ছেলে (সুব্রত) পেটে থাকায় শরীর খাবাপ ছিল। ওখানে গিয়ে আরও শরীর খারাপ হয়। খেতে পারতুম না। বাবা তো ব্যস্ত হতেন। বলতেন, "এখানে এসে খেতে না পারলে, ওরকম শুয়ে পড়ে থাকলে শরীর সাববে কি করে? ডাক্তার দেখানো দরকার।"

মা বললেন, "ডাক্তার কি করবে? দুদিন বাদে এমনি সেরে যাবে। ডাক্তার এলেও আমি ওষুধ খেতে দেব না।"

বাবা শুনলেন না। ডাক্তার নিয়ে এলেন। তাঁকে বলা হল, "যাতে অম্বল টম্বল না হয়, হজম হয় এমন ওষুধ দিন।" সেইরকম প্রেসক্রিপশন দিয়ে গেলেন। তাতেই বাবা সন্তুষ্ট। বাবা ছবি আঁকতেন, আমি সেখানেই কৌচে শুয়ে থাকতুম।

একদিন হঠাৎ একজন লোক এসে বাবাকে বলে যে, যা ছবি দেবেন সে সেটা দেশলাইয়ের কেস বা সিগারেট কেসের উপর ছেপে দেবে। দেড় টাকা করে লাগবে। বাবা দেখলেন যে তাঁর নামের সঙ্গে দুই জামাইয়ের নামের সম্পর্ক আছে। একজন প্রভাতনাথ (সূর্য), আর একজন নিশানাথ (চন্দ্র)। তাই আকাশে (গগনে) পাহাড়ের মাথায় সূর্যোদয় আর চন্দ্রোদয়ের

দুটো ছবি আঁকলেন। সে এচিং করে দেয়। বাবা দুই জামাইকে দুটো দেশলাইয়ের কেস উপহার দিয়েছিলেন। বাবা নিজে কখনও এচিং করেন নি।

মেজকাকা, ছোটকাকাও সেবার মুসৌরী গিয়েছিলেন। কিন্তু আমরা চলে যাবার পরে তাঁরা রওনা হন। কারণ ছোটকাকা তখন কাজ করতেন। আর্ট স্কুল থেকে ছুটি নিতে চাইলেন। তখন হ্যাভেলের বদলে নতুন এক সাহেব এসেছিল। সে ওঁর কদর বুঝল না। ছুটি দিতে চাইল না। উনি বললেন, "রইল তোমার চাকরী। আমার চাকরীতে দরকার নেই। আমাকে চেঞ্জে যেতেই হবে।" এই বলে চাকরী ছেড়ে দিয়ে চলে এলেন। সত্যিই তখন তাঁর চাকরীর কোনও দরকার ছিল না। হ্যাভেল সাহেব জোর করে চাকরীতে বসিয়েছিলেন। এ সাহেব ভাবলে হাজার টাকার চাকরী, সহজে ছেড়ে যেতে পারবে না। এক কথায় ছেড়ে দিলেন।

মেজকাকা, ছোটকাকা যে জায়গায় গিয়ে উঠেছিলেন সেটা দূর ছিল বলে রোজ রোজ যাওয়া আসা সম্ভব হোত না। মাঝে মাঝে যাওয়া হোত।

একদিন সবাই দল বেঁধে কেম্‌প্‌টি ফল্‌স্‌ দেখতে যাওয়া হল। মস্ত বড় ঝরণা। উঁচু পাহাড়ের উপর থেকে জল এসে নীচে পড়ছে, সেখানে একটা চাতালের মত হয়ে গেছে। আমরা সেখানে দাঁড়িয়ে দেখলুম। গায়ে জলের ছিটে এসে লাগছিল। তার উপরে আর যাবার রাস্তা নেই। এত উঁচু যে মাথা উঁচু করে দেখতে হয়। সেই চাতালের মত জায়গাতে জল এসে পড়ে আবার ছাপিয়ে নীচে পড়ে যাচ্ছে। জল কী পরিষ্কার! সেখানে পিকনিক করে সন্ধ্যের সময় বাড়ি ফিরে আসা হল।

আমাদের বাড়ির কাছে ক্যামেল ব্যাক রোডে একটা হোটেল ছিল। নামটা ভুলে গেছি। সুপ্রকাশ দাদা একদিন আমাদের সকলকে সেখানে লাঞ্চ দিল।

এইসব দেখে বেড়াতে বেড়াতে আমাদের থাকার মেয়াদ ফুরিয়ে এল। তখন খুব ঠাণ্ডা পড়েছে। নীচের হলে ফায়ার প্লেসে আগুন জেলে বসে গল্প করা হোত। তনু বেশ ভাল গান গাইতে পারত। সেই গান করত। তারপর যে যার ঘরে শুতে যেতুম। একদিন কি হল, রাত্রে নীতি বমি করতে শুরু করল। একে ঠাণ্ডায় জমে যাচ্ছি, তার উপর বিছানা ভিজে গেল। তার

এমনিতেই অম্বলের ধাত ছিল। বাবার কাছে চকোলেট, কলা, আবদার করত। যা চাইত তাই দিতেন। বাবা জানলার কাছে বসে ছবি আঁকতেন, ও চুপ করে বসে বসে দেখত। ও বড় হয়ে নিজেও আঁকতে শিখেছিল। কিন্তু যখন উনিশ বছর বয়স, এমন টাইফয়েড হয় যে বাঁচবার আশা ছিল না। সেই থেকে সব নষ্ট হয়ে গেল।

আমরা অক্টোবর মাসে গিয়েছিলুম। ঠিক ছিল নভেম্বরের শেষাশেষি নেমে আসা হবে। দিন দেখা হতে লাগল। ঠাণ্ডার জন্য সকলেই যখন নামবে তখন ভীড় হবে। আমরা তার আগেই চলে যাব। দিন স্থির হল। যে দিন ঠিক হল সে দিন অশ্লেষা মঘা, দিন ভাল নয়। মা বললেন, "ঐ দিনটা বাদ দিয়ে দিন ঠিক কর।"

সুপ্রকাশদাদা বলল, "অশ্লেষা মঘা তো কি হয়েছে? কত সাহেব তো যাচ্ছে। তাদের কিছু হচ্ছে না, আমাদেরই হবে? কিছু হবে না।"

ঐ দিনই ঠিক হল। মা কিন্তু খুঁত্‌খুঁত্‌ করতে লাগলেন।

এর ভিতর একদিন হঠাৎ আমার স্বামী গিয়ে উপস্থিত। দু-একদিন থেকে যেদিন আসা হবে সেদিন ভোরবেলা ব্রেকফাস্ট খেয়ে আমাকে ও ছেলেদের নিয়ে দেরাদুনে আমার সেজ ভাশুরের (কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের পৌত্র প্রফুল্লনাথ ঠাকুর) বাড়িতে গেলেন। তখন তাঁরা সেখানে ছিলেন। আমার স্বামী বললেন, "একবার দেখা করে যাব। ওখানেই খাওয়াদাওয়া সেরে রাত্রে স্টেশনে গিয়ে সকলের সঙ্গে মিলব।"

আমার জিনিসপত্র সব রইল, বাবা সঙ্গে নিয়ে যাবেন ঠিক হোল। সকাল আটটার সময় দেরাদুনে এসে পৌঁছলুম। সেখানেই নাওয়া খাওয়া করে সারাদিন কাটল। রাত দশটার ট্রেন। তাই ওখানেই খাইয়েদাইয়ে গাড়ি করে স্টেশনে পৌঁছে দিলেন। আমার স্বামীও সঙ্গে এলেন। বাবারা কখন নেমেছিলেন জানিনা। একেবারে স্টেশনে দেখা হল। জিনিসপত্র লোকজন সব গাড়িতে উঠলে তবে বাবার ব্যস্ততা কমল।

গাড়িও ছেড়ে দিল। বেশ রাত কাটল। আবার টানেলের ভিতর দিয়ে এলুম। রাত ভোর হল। গাড়িতে বসেই ব্রেকফাস্ট খাওয়া হল। এবার কিন্তু ডাইনিংকার ছিল না। স্টেশনে টেলিগ্রাম করা হবে· খাবারের জন্য স্টেশনে যা ফল পাওয়া গিয়েছিল কিনে নেওয়া হয়েছিল গাড়িতে—আতা, কলা, পানফল, কমলালেবু। পানফলগুলো যেমন বড় তেমনি মিষ্টি। খেতে খেতে

আসা হচ্ছে। এমন সময় হঠাৎ মাঠের মাঝে গাড়ি থেমে গেল। কি হল কেউ বলতে পারছে না। সবাই উৎসুক, নামতেও পারছে না। কেউ চেন টানল কি না সবাই দেখছে। কিন্তু যখন জানা গেল না তখন কনকদাদা ও আরও অনেকেই গার্ডের গাড়িতে গিয়ে জেনে এল লাইন খারাপ আছে, গাড়ি যাবে না। সবাই ভাবছে একটু পরেই গাড়ি ছাড়বে, গাড়ি আর ছাড়ে না। মাথার উপর রোদ ক্রমেই বাড়তে লাগল। গরমে সব ছটফট করছে। ছেলেরা গাড়িতে থাকতে চাইছে না, চ্যা ভ্যাঁ আরম্ভ করে দিয়েছে। গাড়িতে যা খাবার ছিল তাই নিয়ে ছেলেদের খাওয়ানো হোল। খুব ছোট যারা তাদের তবু টিন্‌ড্‌ ফুড্‌ ছিল। সঙ্গে স্টোভ ছিল, জল গরম করে খাওয়ানো হল। তার থেকে বড়দেরও তেষ্টা নিবারণ হোল। জল ফুরিয়ে গেল। কোথাও কলও নেই। খাবার জল পাওয়া গেল না। বাথরুমের জলে রুমাল ভিজিয়ে গায়ে মাথায় দেওয়া হতে লাগল। তবু ঠাণ্ডা হচ্ছে না। এগারটা বাজল। বারটা বাজল। গাড়ি চলে না। কি হবে? মাঠের মাঝে বসে প্রাণ যায়। খাবার নেই। অন্য কামরার লোকেরা মাঠে নেমে শুকনো ডালপালা কুড়িয়ে রান্না করছে দেখছি। তাদের সঙ্গে চাল ডাল ছিল। আমাদের তাও নেই, হোটেল ভরসা। গাড়ির জলও ফুরিয়ে গেল। তখন সুপ্রকাশদাদাকে সবাই বলতে লাগল, "তোমার জন্যই এই কাণ্ড হল অশ্লেষায় বেরিয়ে।" সবাই গার্ডের গাড়িতে যাচ্ছে খোঁজ নিতে কখন ছাড়বে। সেও বলতে পারছে না। বললে, আগের ট্রেন ডিরেল্‌ড্‌ হয়ে লাইন বেঁকে গেছে। কোনও সিগন্যাল ছিল না। গার্ড দূর থেকে দেখতে পেয়ে গাড়ি থামিয়েছে। তা না হলে এটাও উল্টে যেত। খুব বেঁচে গেছে। এখন কি হবে জানতে চাইলে সে বললে, "ট্রলি করে লোক চলে গেছে। ফিরে এলে জানতে পারব কি হবে। তারপর মিস্ত্রী আসবে, লাইন মেরামত হবে, তবে গাড়ি ছাড়বে।"

গাড়িতে জল নেই বলায় বলল, "এখন কোনও উপায় নেই! কোন স্টেশনে না গেলে জল দিতে পারব না।"

সঙ্গে মায়ের যা খাবার ছিল তাও ফুরিয়ে গেল সকলে ভাগ করে খেয়ে।

এইভাবে তিনটে অবধি কেটে গেলে গার্ড এসে বলে গেল, "লোক এসে গেছে। এক ঘণ্টার মধ্যেই গাড়ি ছাড়বে। এর পরে প্রথমেই যে স্টেশন আসবে সেখানে একঘণ্টা দাঁড়াবে। যার যা দরকার নিয়ে নেবেন। কারণ

এত লেট হয়েছে বলে আর কোনও স্টেশনে দাঁড়াবে না। একেবারে রাত ছটোর সময় বেনারসে পাঁচ মিনিটের জন্য দাঁড়াবে।" গাড়ি থেকে সবাইকে ওঠানামা করতে বারণ করে গেল।

গাড়িতে বসে বসে সবাই দেখছি। পাঁচটা নাগাত গাড়ি ছাড়ল। পরের স্টেশন, নাম মনে নেই, আসতেই সবাই নেমে পড়ল। মেথর এসে গাড়ি পরিষ্কার করে দিল। বাথরুমে জল ভরে দিয়ে গেল। কনকদাদা নেমে কারিস্তাতের অর্ডার দিতে গেল। অত লোকের খাবার তারা দিতে পারল না। ট্রেনশুদ্ধ লোক খাবার চাইছে। যা দিল তাতে ছেলেদের কোনরকমে খাওয়ানো হোল। আমরা চা, ফলটল খেয়ে রইলুম। লোকজনদের টাকা দিয়ে দেওয়া হোল খাবার কিনে খেতে। বেনারসে আমাব ছোটমাসী ছিলেন তাঁকে টেলিগ্রাম করা হোল, যদি কিছু খাবার তুলে দিতে পারেন তা হলে স্টেশনে আসতে। লেখা হোল "গাড়ি বেশীক্ষণ দাঁড়াবে না। আমাদের খাওয়া হয়নি। গাড়ি ডিরেল্ড্ হয়ে দেরী হয়েছে। স্টেশনে খবর নিও।" আমার মামীশাশুড়ী (কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের পুত্রবধূ) ছিলেন। তাঁকেও টেলিগ্রাম করা হোল। তাঁকেও বলা হোল যদি কিছু খাবার পাঠাতে পারেন।

রাত দশটায় টেলিগ্রাম পেয়ে কেউই বিশেষ খাবার জোগাড় করতে পারেন নি। আমার মাসীর ছেলেরা ওখানকার বাসিন্দা বলে দোকান খুলিয়ে হালুয়াসন, শোনপাঁপড়ি, আর যা জোগাড় করতে পেরেছিল এনেছিল। অত রাত্রেও ছুটতে ছুটতে এসে কোনরকমে তুলে দিল। দাঁড়িয়ে কথা কইতেও সময় পেল না। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই গাড়ি ছেড়ে দিল। আমরা তখন তাই খেয়ে জল খেয়ে সকলে শুয়ে পড়লুম। গাড়ি তখন হু হু করে ছুটে চলেছে। কোথাও থামছে না, কোথাও এক মিনিট থামছে।

ভোর ছটার সময় কোন এক স্টেশনে আসতে ব্রেকফাস্টের জন্য ফোন করা হোল। পরের স্টেশনে হোটেলের বয় এসে খাবার তুলে দিয়ে দাম নিয়ে চলে গেল। তারপর দু তিন স্টেশন বাদে আবার এসে বাসন নিয়ে গেল।

যাক্ সে যাত্রা ভগবানের কৃপায় ভালয় ভালয় একঘণ্টা দেরীতে কলকাতায় এসে পৌঁছনো গেল। এসে দেখি লোকজন সব গাড়ি নিয়ে আমাদের অপেক্ষায় স্টেশনে দাঁড়িয়ে আছে। হাওড়া থেকে যে যার বাড়িমুখে রওনা হোল। আমি স্বামীর সঙ্গে একেবারে হাতিবাগানে চলে গেলুম। সুপ্রকাশদাদা তখন

জোড়াসাঁকোতেই থাকত, দিদির বাড়িও পাশেই ছিল। ওরা সব জোড়াসাঁকোর দিকেই গেল। ছোটকাকা, মেজকাকারা পরে ফিরেছিলেন।

(৫৮)

দিদিমা বেঁচে থাকতে বাগবাজারের দিদি, বাবাদের পাঁদাড়ি পিসীমা, মাঝে মাঝে এসে অনেকদিন আমাদের বাড়িতে কাটিয়ে যেতেন। তিনি বেশ মোটাসোটা কালো ধরণের লোক ছিলেন। তাঁর নাতনীর বিয়ে দিদির জ্যাঠাশ্বশুরের (অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়) সঙ্গে হয়েছিল। সেখানেও যেতেন। একবার কি হয় তাঁকে নিয়ে আমাদের বোনেদের ভিতর ঠাট্টা তামাসা চলছিল। এমন সময় তিনি হলে এসে বসলেন। দিদিমার পাশে তাঁর তাকিয়া থাকত। দিদিমার কাছে মতি আব সত্য বলে দুজন দাসী ছিল। সন্ধ্যেবেলা উনি হলে এসেই তাকিয়ায় চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ে দাসীদের ডাকতেন। দাসীদের মধ্যে একজন একটু কালা ছিল। তাই খুব চেঁচিয়ে বলতেন, "আমার পানের বাক্সটা দিয়ে যা।" সেই শুনে মেজকাকার মেজ মেয়ে ছোট পুটি কবিতা বানাতে থাকে। তার ঐ বকম মজা করা অভ্যেস ছিল। বড পুটি, করুণাদিদি ও আমিও সেখানে ছিলুম। যত তাকে বলছি, "ওরকম করিস্ না, শুনতে পাবেন" সে ততই হাসতে হাসতে কবিতা বানাতে থাকে। বলে, "দেখ কেমন হয়েছে ?

কালামতি, সত্যবতি, দেখবি যদি আয়
কেমন করে চিতিয়ে পড়ে তুললে দুটো হাই।"

আমরা তো শুনে খুব হাসতে থাকি। তার পরদিনই বাগবাজারের দিদি পাল্কী ডাকিয়ে দিদির শ্বশুরবাড়ি চলে গেলেন। দিদিমা জিজ্ঞেস করলেন, এই এলে, এর মধ্যেই চলে যাচ্ছ ?" কিছু বললেন না। চলে গেলেন।

সেখানে গিয়ে আমাদের খুব নিন্দে করেছেন ও কেঁদেছেন, "আমি গরীব বলে মেয়েরা আমাকে গ্রাহ্য করে না, তামাসা দেখে।"

দিদি শুনে এসে দিদিমাকে বলে। দিদিমা বললেন, "ডাক মেয়েদের। কে তাঁর অপমান করেছে দেখব।" আমি তখন একটু বড় হয়েছি, ছেলে হয়েছে। কাজেই একটু গম্ভীর হয়ে দলছাড়া ছিলুম। তাই বেঁচে গিয়েছিলুম। যখন দিদিমা আমাকে জিজ্ঞেস করলেন কি হয়েছে আমি বললুম, "ছোটপুটি কবিতা বেঁধেছে।

কবিতা শুনে দিদিমাও হাসি চাপতে পারলেন না। কিন্তু ছোটপুটিকে বকতে লাগলেন, "গরীব মানুষ, এসে থাকেন, তাই তাঁর নামে কবিতা বেঁধেছিস্! এখুনি তাঁকে আনতে লোক পাঠাচ্ছি তাঁর কাছে মাপ চাইবি।"

তিনি আসতে তাঁকে বললেন, "ঠাকুরঝি, ওরা তোমায় কিছু তো বলেনি। তোমার নাতনী হয় বলে ঠাট্টা করে ঝিয়েদের নাম দিয়ে ছড়া বেঁধেছে। তাই তুমি রাগ করে চলে গেলে? আমাকে একবার জানতে দিলে না কেন?" কবিতাটা তাঁকে শোনালেন। ছোটপুটিকে দিয়ে মাফ চাইয়ে তবে তাঁকে ঠাণ্ডা করলেন। আমাদের বললেন, "খবরদার, আর কখনও এরকম কাজ করিস্ না।"

ঐ রকম লোক ঠাকুরবাবুদের বাড়িতে সব জায়গায়ই থাকত। সকলেই আত্মীয়দের পুষত বলে বাবা রবিদাদা ও অন্যদের সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক করলেন যে সব বাড়ি থেকে কিছু কিছু চাঁদা তুলে ফাণ্ড করলেন সেই ফাণ্ড থেকে দুঃস্থ লোকেদের সাহায্য করা যায়। তা হলে কারও গায়ে লাগে না। তাই "পারিবারিক হিতকারী সভা" নাম দিয়ে একটা কমিটি গঠন করেন। সকলে মিলে দেখাশোনা করতেন। সেই ফাণ্ড থেকে খালি ঠাকুরবাবুদের আত্মীয়দের ভিতর মাসোহারার বন্দোবস্ত থাকবে। পরিবারের বাইরের লোক থাকবে না। আর ফাণ্ড বাড়াবার জন্য বছর বছর দানমেলা হবে। সব বাড়ির মেয়েরা হাতের সেলাই, খাবার ও চাটনী যে যা পারবে করে মেলায় দেবে। বিক্রী হলে টাকাটা ফাণ্ডে জমা হবে। বেশ ভালভাবেই কমিটির কাজ চলছিল। প্রত্যেক বাড়িতে একদিন করে মিটিং হত। কিন্তু ইদানীং কমিটির মধ্যে মনোমালিন্য দেখা দেওয়ায় বাবা সরে দাঁড়ালেন। ঝগড়াঝাঁটি বাবা পছন্দ করতেন না। গণ্ডগোলের কারণ হল, ইদানীং যত বাইরের লোককে সাহায্য দেওয়া হোত। যাদের জন্য ব্যবস্থা করেছিলেন তারা পেত না। বাবা ছেড়ে দেওয়ার পর অনেকেই ছেড়ে দিয়েছিলেন। মেয়েদেরও উৎসাহ দেওয়ার জন্য ঠিক হয়েছিল যার হাতের কাজ ভাল হবে সে প্রাইজ পাবে। এক ঢিলে দুই পাখি মারবার ব্যবস্থা ছিল। খুব ভালভাবেই অনেকদিন চলেছিল।

কিন্তু বাবা ছাড়তে চাইলেও কেউ তাঁকে ছাড়তে চাইত না। একবার দানমেলার সময়, আমি তখন আমার নিজের বাড়িতে হাতিবাগানে ছিলুম, আমার এক নন্দাই গিয়ে বলেন, "তোমার হাতের কাজ কি আছে দাও,

দানমেলায় দেব।" আমি বললুম, "এখন আর কিছু নেই, দিতে পারব না।" তিনি বললেন, "তা হবে না। এবার কেউ ভাল জিনিস দেয়নি। তুমি যা হয় দাও।" আমি দেব না, তিনিও ছাড়বেন না। আমার টেবিলের উপর ক্রুশের একটা টেবিল ঢাকা ছিল, আমার হাতে বোনা। সেইটা তুলে নিলেন। আমি তাঁকে বললুম "ওটা ব্যবহার করে আধময়লা হয়ে গেছে, নেবেন না।" তিনি শুনলেন না। বললেন, "দেখো তুমিই হয়ত প্রাইজ পেয়ে যাবে। কারণ এবার সেরকম কাজ জোগাড় হয়নি।"

বাবা জানতেন না যে দানমেলায় আমরা হাতের কাজ দিয়েছি। অন্যান্য সকলে তখন দেখাশোনা করত। বাবা বড় একটা খবর রাখতেন না। দিদিও ঘরে রসগোল্লা ও গুড়িয়া পুতুল—সাপুড়ে—করে দিয়েছিল। দুটো প্রাইজ ছিল। রণেন্দ্র মোহন ঠাকুরের স্ত্রী ফার্স্ট প্রাইজ পঁচিশ টাকা, আর প্রদ্যোত কুমার ঠাকুরের স্ত্রী সেকেণ্ড প্রাইজ দেবেন ঘোষণা করেন। বাবাকে বিচারের ভার দেওয়া হয়। বাবা নামের তালিকা না দেখে হাতের কাজ দেখেই প্রাইজ দিলেন। আমি পেলুম প্রথম প্রাইজ, দিদি পেল দ্বিতীয়। তাঁর বিরুদ্ধ পক্ষের যারা ছিল, তাদের বাড়ির লোকেরাও জিনিস দিয়েছিল। তারা বলল, "গগনবাবু নিজের মেয়েদের দেখে প্রাইজ দিয়েছেন।"

বাবা অপ্রস্তুতে পড়ে গেলেন। বললেন, "তোমরা সকলকে দেখাও। তাঁরা যা বলবেন তাই হবে।" তখন অন্য যাঁরা ছিলেন, সকলেই বাবার বিচার মেনে নিলেন। কিন্তু যিনি আপত্তি তুলেছিলেন তিনি মানলেন না। তখন বাবা বললেন, "তোমরা এক কাজ কর। যারা প্রাইজ দেবে তাদের কাছে জিনিস পাঠিয়ে দাও। তারা যাকে মনোনীত করবে সেই পাবে।" তাই ঠিক হল। সব জিনিস তাঁদের কাছে পাঠিয়ে দিলে তাঁরাও বাবার মতেই মত দিলেন। কিন্তু রণেন্দ্রমোহন ঠাকুরের স্ত্রী বললেন, "গোলমালে কাজ নেই। আমি আর একটা তৃতীয় প্রাইজ দিচ্ছি, দশ টাকা।" তাই করে তবে তাঁদের থামানো যায়। বাবার শিল্পীর মন, শিল্প দেখে বিচার করেছিলেন। তাঁর মনে কোনও প্যাঁচ ছিল না। সেই থেকে বাবা একেবারেই হিতকারী সভার সংস্রব ছেড়ে দিলেন। চার পাঁচ বছর আগেও শুনেছি আর দানমেলা-টেলা হয়নি বটে, তবে হিতকারী সভার কাজ হয়। কিন্তু সব বাইরে চলে যায়, আর চুরিও হয়। আজকাল যত কাজ লোকের হাতে পড়েছে। খুব কায়েমী ভাল বন্দোবস্ত করেছিলেন, তাই এখনও চলছে।

লাইব্রেরী ঘরের পাশে যখন মেজ কাকার কাপড় ছাড়বার ঘর ছিল, সেই সময় মেজকাকার কাছে একজন বেয়ারা ছিল। তার নাম ছিল সকলু। সে কালো বেঁটে চেহারার লোক ছিল। সেই মেজকাকার কাপড়চোপড় রাখত। সিড়ির সামনেই কাপড় ছাড়বার ঘরের দরজা ছিল। লাইব্রেরী ঘরের পাশে দেয়াল দেওয়া ছিল। যখন নতুন করে বাথরুম ওঠে তখন দেয়াল ভেঙে দিতে লাইব্রেরী ঘর বড় হয়ে যায়। তখন দুপুরবেলা উত্তরদিকে মেজকাকা বসতেন। বাবা মাঝখানে মাদুরের তক্তপোষে বসতেন। ছোটকাকা বসতেন দক্ষিণের বারান্দার দিকের কোণে। তাঁর পিছনদিকের ঘরে টেলিফোন ছিল। সেই ঘরে কুমারস্বামী এসে দিনকতক আমাদের অতিথি হয়েছিলেন।

একদিন কুমারস্বামী তাঁর সোনার কলম টেবিলের উপর রেখে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। ফিরে এসে আর কলম দেখতে না পেয়ে বাবাকে বলেন, "টেগোর, আমার কলমটা পাচ্ছি না।" বাবা তখনই মন্নুকে ডেকে বলেন, "সাহেবের কলম কোথায় গেল দেখ। যেমন করে পার খুঁজে বের কর।"

তখন মন্নু বললে, "কনট্র্যাক্টরবাবুকে আমার সন্দেহ হয়।"

সেই সময় একজন অভাবগ্রস্ত দূরসম্পর্কের আত্মীয়কে সাহায্য করবেন বলে বাবা অল্পসল্প ভাঙাচোরার কাজ দিতেন। তখন বেনেবাড়িতে মেরামতের কাজ চলছিল। কনট্র্যাক্টর আসাযাওয়া করতেন। তাঁর সর্বত্র অবাধ গতি ছিল। কেউ তাঁকে আত্মীয় বলে কিছু বলতে সাহস করত না। বাইরের ঘর থেকে প্রায়ই জিনিস সরে যেত। মন্নু সেটা লক্ষ্য করেছিল।

বাবা শুনে বললেন, "কাল যখন আসবেন, তখন তাঁকে ছেড়ে দিও না। আমাকে ডেকে দিও।"

অছিলাল দরোয়ানকে বলে দিলেন যেন বেরিয়ে যেতে না দেয়। তার পরের দিন যখন কাজ হয়ে গেলে বেরিয়ে যাবেন তখন মন্নু দেখে যে, তাঁর পকেটে সেই কলম রয়েছে।

মন্নু তাঁকে বলে, "বাবু কলমটা রেখে যান। ওটা কুমারস্বামীর কলম। বড়বাবু জানতে পারলে আমাদের জরিমানা হবে।"

সেই কথা শুনে, পকেট চেপে ধরে ছুটে চলে যাচ্ছিলেন। মন্নু এসে বাবাকে খবর দিলে বাবা গিয়ে দেখেন অছিলাল আটক করেছে। তিনিও পালাবার

জন্ত জোর করছেন। বাবা গিয়ে পিছন থেকে জাপটে ধরে বললেন, "কলমটা দিয়ে যাও। আর যদি ভালয় ভালয় না দাও; দরোয়ান চাকরের সামনে অপমানিত হবে।"

কিছুতেই না দিয়ে পালিয়ে যেতে চাইছেন দেখে বাবা অছিলালকে বললেন, "চেপে ধর।" বাবা পকেট থেকে কলমটা বের করে নিয়ে বলেন, "দেখ, আর বেশী কেলেঙ্কারী কোর না। আমার জিনিস হলে কেউ জানতেও পারত না। গেস্ট, এসে আছে, তার জিনিস বলেই এতদূর এগোতে হল। আশা করি তুমিও সাবধান হবে। তোমাকে আর কাজ করতে হবে না। তোমার যা পাওনা হয়েছে নিয়ে মানে মানে চলে যাও। ভদ্রলোকের ছেলে বলে ছেড়ে দিলুম।"

(৬০)

একবার এক মজার ঘটনা ঘটে। একবার জোড়াসাঁকোয় এসে শুনি হাসির বিয়ের ঠিক হচ্ছে। আমাদেরই আত্মীয় এক জুয়েলার পুরণো গয়না বেচাকেনা করতেন। খবর পেয়ে তিনি কিছু পুরণো ধরনের গয়না নিয়ে বাবাকে দেখাতে আসেন। বড় বড় মুক্তোর নথ দেখালে বাবা বলেন, "আজকাল আর নথ পরার রেওয়াজ নেই। আর ওর নাক বিঁধনোও নেই। নথ নিয়ে কি হবে?" এই বলে হাতে করে দেখে তাঁকেই ফেরৎ দেন।

তার পরদিন তিনি বলে পাঠালেন, "নথে নোলকটা পাওয়া যাচ্ছে না। বোধ হয় ওখানে পড়ে গেছে। যদি একবার খুঁজে দেখেন, বড় ভাল হয়।"

তখনই সব জিনিস, বিছানা সরিয়ে খোঁজা হল। কোথাও পাওয়া গেল না। তখন বাবা বলে পাঠালেন, "এখানে পড়েনি। তুমি তোমার কাছেই দেখ, পাবে।" কিন্তু কোথাও তার দেখা মিলল না। কি হবে! মা বললেন, "ওরা ভাববে, তুমি নিয়েছ।" বাবা বললেন, "ভাবলে তার আমি কি করব? তা বলে তো আর বলতে পারিনা যে আমি নিয়েছি।"

তারপর অনেকদিন চলে গেছে। হাসির বিয়েও হয়ে গেছে। বাবার অভ্যেস ছিল, আজ যে কাপড় পরতেন, কাল সে কাপড় ছেড়ে দিয়ে আবার ধোপার বাড়ির পাটভাঙা কাপড় পরতেন। একদিন যখন ভাত খেয়ে শুতে গেছেন ধোপার বাড়ির কাচা কাপড় পরে পকেটের মাড় ছাড়াতে গিয়ে একটা ছোট এলাচের মত কি হাতে ঠেকে। তখন সেটা বের করে দেখেন, সেই

হারানো মুক্তো পকেট থেকে বের হল। ছাড়া কাপড় ধোপার বাড়ি, চলে গেছে, কাচা হয়ে ইস্ত্রী হয়ে এসেছে। তখনও ভাঙেনি।

তখনই সেই মুক্তো জুয়েলারকে পাঠিয়ে দিলেন। বলে পাঠালেন যে, "অদ্ভুত ব্যাপার। কি করে যে মুক্তো পকেটে গেল বোঝা গেল না।"

যাই হোক, মুক্তো ফেরৎ পেয়ে সেই জুয়েলার অনেক খাবার পাঠিয়ে দিলেন। এইজন্য বোধহয় লোকে বলে, ধর্মের কল আপনি নড়ে।

(৬১)

আমার মা যখন এলাহাবাদে জন্মান, তখন নিরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের ভাগ্নের স্ত্রী কাশীর দিদির কাছে সাহায্যপ্রার্থী হয়ে আসেন। তিনিও তাঁকে পরিবারভুক্ত করে নেন। তিনি মাকে মেয়ের মত মানুষ করেছিলেন। মা তাঁকে বড়মা বলতেন। আমরাও মায়ের দেখাদেখি বড়মা বলতুম। তিনি আগেকার মানুষ ছিলেন। বাবাকে দেখলেও লজ্জা পেয়ে মাথায় ঘোমটা টেনে দিতেন। হঠাৎ বাবার সামনে পড়ে গেলে "ওমা, জামাই এসেছে।" বলে জিভ কেটে পালিয়ে যেতেন। আমরাও তাঁর মজা দেখব বলে বাবা এলে বলতুম না। তিনি বলতেন, "তোরা ভারী দুষ্টু। আগে বলতে হয়।" বাবাও মজা দেখতেন। পা টিপে টিপে আসতেন। তিনি আবার মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বাড়ি যেতেন। তিনি তাঁর হাতের রান্না খেতে ভালবাসতেন, তাই এক ভাগ তরকারী রেঁধে খাওয়াতেন।

একদিন বাবার মাথায় খেয়াল হয় ওঁকে ঠকাতে হবে। আমার মেজবৌঠানকে বলেন, "সুরমা আয়, তোকে রাজার বাড়ির দারোয়ান সাজিয়ে দেব। বড়মার কাছে গিয়ে বল্, "মহারাজা আমাকে পাঠিয়েছেন আপনাকে নিয়ে যেতে।" মেজবৌঠানকে দেখতে বেশ লম্বা, চওড়া। খুব ফর্সা রং। লাল টকটকে চেহারা। তাকে এমন সাজালেন, মাথায় পাগড়ী, মস্ত গোঁফ, হাতে লাঠি নিয়ে যখন এসে দাঁড়াল, কে বলবে যে ভোজপুরী দরোয়ান নয়। বড়মার কাছে বলা হয়, "বড়মা, আপনাকে নিয়ে যেতে মহারাজা দরোয়ান পাঠিয়েছেন।" তাই শুনেই ভাল করে তার দিকে না দেখেই বলেন, "চল যাই।" বলে মাথায় ঘোমটা টেনে উঠে চলে যাচ্ছিলেন। তখন মা গিয়ে বলেন, "ও বড়মা, কোথায় যাচ্ছ? ও তো সুরমা। তোমাকে ঠকাবে বলে মেয়েরা দরোয়ান সাজিয়েছে। ভাল করে দেখ।" তখন রেগে বলেন, "আমি

আর থাকব না। এখুনি চলে যাব।" তখন আবার মান ভাঙাতে মেয়ে বৌদের পায়ে ধরতে হয়, তবে রাগ পড়ে। তখন আমরা বলি, "তুমি অত ঘোমটা টানবে তো দেখবে কি করে?"

বাবা ওদিকে চুপ করে বসে আছেন। যেন কিছুই জানেন না।

(৬২)

বাবা ওরিয়েন্টাল আর্ট সোসাইটির উদ্যোক্তা হিসাবে সেখানকার কাজে ব্যস্ত থাকতেন। বাবা কাকারা তিন ভাইই সেখানে যেতেন। নবুও সেখানে কাজ করত। সে সময় আমার বড় ভগ্নীপতি প্রভাতনাথ চট্টোপাধ্যায়কে সেক্রেটারি করেছিলেন। তারাও যেত। ইদানীং সন্ধ্যে অবধি সেখানেই কাটাতেন। তখন নবুর বিয়ে হয়েছে। হাসিরও বিয়ে হয়ে গেছে। ওদের ছেলেমেয়ে হয়েছে। আমাদের ছেলেরা তখন সব বড় হয়ে গেছে, গল্প করবার সুবিধে হোত না। হাসির একটিমাত্র ছেলে সঞ্জয়। তাকেই টাইফয়েডের পর ভুলিয়ে রাখবার জন্য বানিয়ে গল্প বলতেন। তার থেকেই দাদা ভাইয়ের "দেয়ালা" নাম দিয়ে একটা গল্প লিখেছিলেন। [সেইটাকেই মোহনলাল "ভোঁদড় বাহাদুর" নাম দেয়।] আমাদের বাড়ির চৌতলার ছাদে ভোঁদড়ের বাসা ছিল। রাত্রে ছাদে খুব ছুটোছুটি করত। আমরাও ছোটবেলায় ভয় পেতুম। ঠিক মনে হত মানুষে বল খেলছে। আগে ছাদে রেলিং বা পাঁচিল ছিল না। পাছে ছোট ছেলেরা যায় তাই ছোটকাকা বলতেন, "ছাদে ব্রহ্মদত্যি আছে। কেউ যেও না।" আসলে দ্বারকানাথ ঠাকুরের বাবুর্চিখানার ধোঁয়া বেরোবার চিম্‌নি ছিল। পরে নীচের থেকে বন্ধ করে দিলেও উপরে গর্ত ছিল। সেখানে ভোঁদড়ে বাসা করেছিল। তার থেকে বাবা গল্প বানাতে শুরু করেন।

এরপর মাঝে মাঝে গান ও থিয়েটার হয়েছে, কিন্তু আগের মত জমজমাট হত না। একবার বিষ্ণুদিগম্বরের গান হয়েছিল। অনেকেই শুনতে আসে। একবার উদয়শঙ্কর আসে কলকাতায়। অনেক জায়গায় নাচে। কিন্তু কোথাও সেরকম আদর পায়নি। তখন বাবাকাকাদের এসে ধরে, টাকা না নিয়ে নাচ দেখাবে। তার উদ্দেশ্য ছিল নাম করা। ওরিয়েন্টাল আর্ট সোসাইটিতে নাচের ব্যবস্থা হল। আমরাও সব দেখতে গিয়েছিলুম। খুব ভাল লেগেছিল। বাবাকাকারাও খুব বাহবা দিলেন। আর একদিন

টাকা দিয়ে নাচের জোগাড় হয়। সেদিন অনেক নিমন্ত্রিত লোক এসেছিলেন। সকলেই প্রশংসা করলেন।

তারপর ছোটকাকার কাছ থেকে দেশী আর্ট সম্বন্ধে লিখিয়ে নেয়। সেই থেকে তার কাগজে নাম বেরিয়ে গেল। তখন উদয়শঙ্কর সঙ্গতের দলবল নিয়ে বিলেতে চলে যায়। সেখানেও তার নাম হয়।

একবার সিমকি আসে নাচ দেখাতে। তার নাচ পছন্দ করলেন না। বললেন, "ওর বিলিতি ধরনের নাচ।"

শীতকালে প্রায়ই আর্ট সোসাইটিতে ছবির এক্‌জিবিশন হত। তাই নিয়ে বাবাকে খুব ব্যস্ত থাকতে দেখতুম। ভাল ভাল ছবি বিক্রী হয়ে যেত। যেগুলো বিক্রী হোত না, তার থেকে আমাদের দিয়ে দিতেন। আমাকে একটা ছবি দেন, "মৌমাছির রাণী"। সোনার জলে আঁকা। সেই ছবিটা প্রাইজ পেয়েছিল। আরও অনেক রকম ছবিই দিয়েছিলেন।

(৬৩)

ছোটকাকার ছোটমেয়ে স্বরূপার যখন বিয়ে হয়, আমার খুব অসুখ করেছিল। আমি সেই প্রথম বাড়ির বিয়েতে উপস্থিত থাকতে পারিনি। আমারই ভায়ের সঙ্গে বিয়ে হোল। বাবা টেলিফোনে সব খবর জানাতে ভোলেননি। যখন বর আসে, জানালেন, "বর এসেছে। সম্প্রদান হচ্ছে।" তারপর জানালেন, "বিয়ে হয়ে গেছে। বর উপরে গেছে।" রাত দশটার সময় আবার বললেন, "খাওয়াদাওয়া সব চুকে গেল। লাস্ট ব্যাচ এইমাত্র খেয়ে উঠল।" তাঁর মনে হচ্ছিল, ও আসতে পারেনি; খবর পেলে খুশী হবে। তাঁর স্নেহ-ভালবাসার কথা কি সহজে ভোলা যায়!

(৬৪)

সেবার অনেকদিন জোড়াসাঁকোয় না যাওয়াতে মনটা বড় ব্যস্ত হচ্ছিল। ফোন করে গাড়ি চেয়ে নিয়ে গেছি। দোতলায় উঠতেই ছোটকাকার সঙ্গে দেখা হল। তিনি বললেন, "তোর মায়ের যে খুব অসুখ, শুনিস্‌নি?" আমি বললুম, "কই, আমি তো কিছু জানি না!" বললেন, "ডাক্তারে বলছে, ওঁর মনের অসুখ।" মা বলছেন, ঘুম হয় না, খেতে পারেন না, হাঁপ ধরে, শুতে পারেন না।

তাড়াতাড়ি উপরে গিয়ে দেখি মা ঘরে বসে আছেন। সাদা ফ্যাকাশে চেহারা হয়ে গেছে। মুখে চোখে কালি পড়েছে। আর ফুলো দেখাচ্ছে। আমি জিজ্ঞেস করতে সব কষ্টের কথা বলে বললেন, "ডাক্তারে ধরতে পারছে না। বলছে, মনের অসুখ। আমার মন অত পল্‌কা নয়। কবিরাজও দেখেছে। সেও বুঝতে পারছে না।"

আমি আড়ালে বাবাকে বললুম, "তোমরা রোজ দেখছ; বুঝতে পারো না, মায়ের চেহারা আমি খুব খারাপ দেখছি। মেয়েদের ডাক্তার কেদার দাসকে একবার এনে দেখালে হয় না? মায়ের অত মনের জোর আছে, মনের অসুখ হতেই পারে না।"

বাবা বললেন, "হ্যাঁ, ঠিক করেছি দাসকে একবার দেখাব।" আমি বললুম, "দেরী কোর না, কালই ডাকো।"

কেদার দাস এসে দেখেই বললেন, "আর বেশী দেরী করবেন না, এখুনি রাঁচীতে নিয়ে যান। ক্যান্‌সার হয়েছে। এখনও অল্প আছে। এইবেলা রেডিয়াম দিলে সেরে যাবে। বেড়ে গেলে আর কিছু করা যাবে না, কারণ এখানে সেরকম পাওয়ারফুল রেডিয়াম নেই।"

তখনই রাঁচী যাবার বন্দোবস্ত করা হোল।

বালিগঞ্জের মেজদিদির (সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনী দেবী) রাঁচীর বাড়িতে যাওয়া হবে। হাসিকে সঙ্গে নিয়ে, মাকে নিয়ে বাবা চলে গেলেন। আর সবাই বাড়িতেই রইল। সেখানে তিনমাস থেকে রেডিয়াম দিতে মা ভাল হয়ে গেলেন। আবার ছমাস বাদে যেতে হবে বলে দিল।

পরের বার যখন যাওয়া হোল সকলেই ছিল। আমিও সঙ্গে গিয়েছিলুম। আমরা নীচের বাড়িতে ছিলুম। মেজদিদি, নতুনদাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর পাহাড়ের উপরে থাকতেন। মা তখন অনেকটা ভাল আছেন। সন্ধ্যে হোলে সবাই হলে বসে গান করা হোত। ভোরবেলা পাহাড়ের উপর নতুনদাদা উপাসনায় বসতেন। আমরা সকলে সেখানে উপস্থিত থাকতুম। কী চমৎকার লাগত! উপাসনার পর গান হোত। তারপর সবাই নেমে এলে খাওয়া-দাওয়া চলত। মেজদিদিও এসে বসে কত গল্প করতেন। বলতেন, "তোদের সব মেয়ে-বৌদের নিয়ে বৌমা বসে থাকে, দেখে আমার বড় ভাল লাগে। আমাদের আগেকার কথা মনে পড়ে যায়।"

মেজদিদির বাগানে পেয়ারা গাছ ছিল। ছোট ছোট গাছ। তাতে উঠে

বসে আমরা পেয়ারা খেতুম। বাবা বলতেন, "দেখুন মেজমা, আপনার গাছের সব পেয়ারা আমার মেয়েরা খেয়ে দিলে।"

তিনি হেসে বলতেন, "আর কে খাবে। ওরা খাবে বলেই তো হয়েছে।"

একদিন বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছ থেকে চিঠি এল। তিনি তখন শান্তিনিকেতনে ছিলেন। বাবাকে লিখেছেন, "গগন, আমার সব পাখিরা আসে খেতে। তার মধ্যে একটা শালিক কদিন হোল আসছে না। আমার মন খারাপ হযে আছে। তাকে আমি একটু বকেছিলুম। বলেছিলুম, 'খাবার সময় তুমি বড বিরক্ত করছ।' সেইদিন থেকে সে অভিমান করে আর আসেনি।"

তার কিছুদিন বাদে আবার চিঠি এল, "আবার শালিক ফিরে এসেছে।" বনের পাখীদের সঙ্গে যে তাঁর ঐরকম ভালবাসা ছিল তা আমরা জানতুম।

বাবা সেখানে কেদার বলে একজন বাবুর্চিকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন। সে জাতে মগ ছিল। একটু তোতলা ছিল, তাই তাকে রাগিয়ে দিলে তার তোৎলামি বেড়ে যেত। তার অভ্যেস ছিল, প্রতি কথার 'বিবেচনা করুন' বলা। তাই শোনার জন্য দেখা হোলেই বাবা বলতেন, "কেদার, আজকাল তোমার রান্না ভাল হচ্ছে না কেন?"

সে বলত, "বি-বে-এ-চনা করুন, বো-উ-মা, বি-বে-এ-চনা করুন, আ— আমি কি করে রাঁধব বি-বে-এ-চনা করুন—"

বাবা বলতেন, "তোমার পুডিংটাও ভাল হয় না।'

সে বলত "বি-বে-এ-চনা করুন, বৌ-উ-মা রে-ডিফিট (রেডি ফি) দেবেন না, বি-বে-এ-চনা করুন কি কো-কোরে ভা-ভাল হবে।"

আমরা মুখ টিপে হাসতুম। বাবা গম্ভীর হযে বলে যেতেন।

সেবার রাঁচীতে জানা লোক অনেকেই গিয়েছিল। মদনদাদা, প্রকৃতি বৌঠান (মদনমোহন চট্টোপাধ্যায় ও তাঁর স্ত্রী) ওরা ছিল। পাহাড়ের উপরে বটু ঘোষ তার পরিবার নিয়ে গিয়েছিল। আমাদের বেড়াবার সঙ্গী অনেক জুটেছিল।

একদিন ঠিক হোল, পিক্‌নিক্ করতে যাওয়া হবে। সবাই বলল, চল হুণ্ড ফল্‌স্ দেখা হয়নি, দেখে আসা যাক। ভোরবেলা গিযে সেখানে পিক্‌নিক্ করা হবে ঠিক হোল। সবাই মিলে চাঁদা দিয়ে একটা বাস ভাড়া করা হোল।

একটা বসোতেই সব ধরে যাবে। রাঁধবার সরঞ্জাম সব নেওয়া হোল, নিজেরাই রাঁধব।

ভোরবেলা বেরিয়ে সেখানে সাতটা নাগাত পৌঁছনো গেল। খুব বড় ঝরণা। তবে মুসৌরীর কেম্প্‌টির চেয়ে ছোট। ঝরণার জল এসে পড়ছে, কি পরিষ্কার জল! এক জায়গায় নদীর মত হয়ে অনেক দূরে বয়ে যাচ্ছে। আমরা সেখানে চানটান করে খিচুড়ি চড়িয়ে দিলুম। যে যা পারল সব খিচুড়িতে দিল। শীতের তরকারী, চাল, ডাল, ডিমসিদ্ধ তাই তখন অমৃত মনে হচ্ছে।

খাওয়াদাওয়া হয়ে গেলে ঝরণার ধারে বসে গান হোল। যারা গিয়েছিল তাদের অনেকেই ভাল গাইতে পারত। ওখানে আর কিছু বিশেষ দেবার ছিল না। সারাদিন খুব আমোদে কেটেছিল। পাঁচটার সময় তল্পিতল্পা গুটিয়ে আবার বাসে ওঠা গেল। বাসে উঠেও গাইতে গাইতে আসা হোল। মদনদাদার ছেলেমেয়েরাও সঙ্গে ছিল। গলা ছেড়ে গান ধরল। এইভাবে গাইতে গাইতে আসায় পথের কষ্ট লাঘব হোল। সাতটা আটটা নাগাত বাড়িতে ফিরে এলুম। কলকাতায় ফিরে আর কারও সঙ্গে দেখা হোত না, সেইটাই খারাপ লাগত।

সেবারও মায়ের রেডিয়াম দেওয়া হয়ে গেলে খুব উপকার হয়েছিল। তাহলেও ডাক্তার বলল, তিনমাস বাদে আবার একবার নিয়ে আসতে হবে।

(৬৫)

এর পরের বার যখন রাঁচীতে যাওয়া হয় তার আগে আমার খুব অসুখ হয়েছিল। তাই আমাকেও সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন। সে বার 'বলিহার লজ' ভাড়া করা হয়। সেবার গাড়ি সঙ্গে গিয়েছিল। গাড়ি চড়ে একদিন পুরুলিয়ায় যাওয়া হোল, মেজকাকার সেজমেয়ে বুলার (সুপ্রিয়া) বাড়ি। তার স্বামী ব্রহ্মনাথ চট্টোপাধ্যায় তখন ঐখানে কাজ করত। একদিন নেতার হাটে যাওয়া হয়। সেদিন আমি যাইনি। হাসি, মেজবৌঠান ওরা গিয়েছিল। সরোজের (আমার ছোট ভগ্নীপতি সরোজকুমার মুখোপাধ্যায়) বন্ধু সূর্যবাবুও ছিল। দিতিও সঙ্গে ছিল। দু-তিনখানা গাড়ি এক সঙ্গে যায়। সেদিন ওদের অ্যাক্সিডেন্ট হতে হতে বেঁচে গিয়েছিল। ওরা এসে বললে, দৃশ্য খুব চমৎকার। কিন্তু পাহাড়ের বাঁক এত খারাপ ও রাস্তা এত সরু যে উল্টো

দিক থেকে গাড়ি এসে গেলে আর সরবার জায়গা থাকে না। ওরা ওঠবার সময় হঠাৎ উপর থেকে লাটসাহেবের গাড়ি সবেগে বাঁক ঘুরে একেবারে মুখোমুখি এসে পড়ে। নেহাৎ বাবার ড্রাইভার খুব ভাল চালাত বলে সামলে নেয়।

সেইবার আমাদের পিছনের বাড়িতে মেজকাকার ছোটমেয়ে নেভীবা (অনিমা) ছিল। তার শ্বশুর ছিলেন বাবার পিসতুতো ভাই ইন্দুপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়। ফলে বাবার গল্পের লোক জুটেছিল।

গাড়িবারান্দার উপর বসে বাবা ছবি আঁকতেন। নবুর ছোট মেয়ে দীপালিকে ডাকতেন। সে গিয়ে বাবার ছবি আঁকার সরঞ্জাম সব গুছিয়ে দিত, তাই তাকে ভালবাসতেন। গাড়িবারান্দার আচের ভিতর থেকে বাইরের দৃশ্য আঁকতেন। কি খেয়াল হোল, একদিন সন্ধ্যেবেলা শার্শির পিছনে আলোর সামনে আমাকে ও হাসিকে বসিয়ে শার্শিতে আমাদের ছায়া দেখে ছবি আঁকতে শুরু করলেন। দু বোনের ছবি প্রায় একই রকম দুটোকে পাশাপাশি রাখলে সহজে বোঝা যেত না কোনটা কার। হাসিরটা রায়টের সময় নষ্ট হয়ে যায়। আমারটাই ছিল। কিছুদিন আগে বিশ্ব-ভারতীর একজিবিশনে সেটা দেখতে পেলুম।

একদিন দুপুরবেলা আমরা গাড়িবারান্দায় রোদ পোহাচ্ছিলুম। বাবা আমাদের কাছেই বসেছিলেন। এমন সময় একজন ভিক্ষে করতে আসে। সে গণৎকার। বাবাকে দেখে সামনে এসে বলতে লাগল, "আপনি ভাগ্যবান মহাপুরুষ ছিলেন। কিন্তু আর আপনার বেশি দিন নেই।" যেমন এই কথা বলেছে আমরা তাকে তাড়িয়ে বাড়ির বার করে দিলুম। বাবার মুখে সরল হাসি ছাড়া আর কিছুই দেখা গেল না। সব কথা তাঁর হেসে ওড়ানো ছাড়া কারও মুখের উপর প্রতিবাদ করার স্বভাব ছিল না। কাউকে কটু কথা বলতে জানতেন না। তার পরেই একদিন হাত থেকে তুলি পড়ে যায়।

আর একদিন সবাই মিলে সাঁওতালী নাচ দেখতে হেঁটে বেড়াতে বেড়াতে গ্রামের দিকে যাচ্ছিলুম। মা, বাবাও সঙ্গে ছিলেন। বাবার উদ্দেশ্য ছিল নাচের ছবি আঁকা। সবাই আগে আগে যাচ্ছে। আমি বাবার পিছনে ছিলুম। সরু কাঁচা রাস্তা। মাঠের উপর দিয়ে যাচ্ছি, হঠাৎ বাবা বসে পড়লেন। আমি চেঁচিয়ে সবাইকে ডাকলুম, "দেখ, বাবা পড়ে গেছেন।" ধরে তুললুম। জিজ্ঞেস করলুম, "কি হল? কোথায় লাগল?" বললেন, "কোথাও লাগেনি" সবাই

ছুটে এস। মা বুঝতে পেরেছিলেন যে, পায়ের জোর কমে গেছে। যত জিজ্ঞেস করা হচ্ছে, "কেন পড়লে? কি হল, হোঁচট খেলে?" ততই বলছেন, "না, কিছু হয়নি।" আর সরল হাসি হাসতে লাগলেন। এখনও যেন সেই হাসি দেখতে পাচ্ছি।

(৬৬)

তারপর কলকাতায় চলে আসা হল। মায়ের অসুখ একেবারেই সেরে গিয়েছিল। সেবার পৌষ মাসে একদিন সকালবেলা হঠাৎ সাতটার সময় কনকদাদা ফোন করে জানাল, "ভোর চারটের সময় বাবা বিছানা থেকে উঠতে গিয়ে পড়ে গিয়ে কথা বন্ধ হয়ে গেছে। ডাক্তার এসেছে। এখন জ্ঞান নেই। চব্বিশ ঘণ্টা না কাটলে বোঝা যাবে না। স্ট্রোক হয়েছে। গাড়ি পাঠাচ্ছি, চলে এস।" তখন আমিই কেবল দূরে ছিলুম। দিদি, হাসি কাছেই থাকত। আমি তখুনি চলে গেলুম। গিয়ে দেখি শুয়ে আছেন, জ্ঞান নেই।

রাত্রে মাকে জাগতে দেওয়া হোত না। আমরা মেয়েরাই পালা করে জাগতুম। ছেলেরাও দরকার হোলে আসত। মা ভোরে উঠতেন। তখন থেকে সারাদিন কাছে থাকতেন। ডাক্তারে বলেছিল, জ্ঞান হলে যদি আবার উঠতে চেষ্টা করেন বা আবার পড়ে যান, মাথার শির ছিঁড়ে মারা যাবেন। খুব সাবধানে থাকলে আস্তে আস্তে সেরে উঠবেন। তাই হোল। ঐ ভাবে তিনদিন কেটে গেলে ভয় কেটে গেল। আস্তে আস্তে ছ-মাস বাদে অল্প অল্প চলতে পারলেন। কিন্তু কথাটা আর হোল না। চেহারায় কোন বদল হয়নি। যেমন সুন্দর চেহারা সেইরকমই ছিল। বোধশক্তিও কোনরকম লোপ পায়নি। একটা বাচ্চা চাকর কাজ করত। বাবা ঘরে বসে থাকতেন, তাকের উপর টিনে বাবার বিস্কুট থাকত। চাকরটা অন্য কেউ না থাকলে চুপি চুপি টিন পেড়ে খেত। জানত যে বাবু তো আর কিছু করতে পারবে না। বাবাও দেখতেন, ছেলেমানুষ খাচ্ছে খাক। পরে মা এসে টিন বের করে বাবাকে জিজ্ঞেস করেন, "বিস্কুট কি হল, তুমি কি খেয়েছ?" বাবা ইশারায় বুঝিয়ে দেন, তিনি নয়, সেই চাকরটা খেয়েছে। তখন মা তাকে ডেকে বললেন, "কি রে বিস্কুট খেয়েছিস?" সে ভাবলে বাবু তো আর কথা বলতে পারে না, বলল, "না, বাবু খেয়েছেন।" মা তো খুব রেগে গেলেন। নিজে খেয়ে আর এরকম মিথ্যে কথা বলে। বাবার অসুখের সুযোগ নিয়ে আরও কি করবে তার ঠিক

কি! বাবাও এমনিতে কিছু বলতেন না, কিন্তু ঐরকম মুখের উপর মিথ্যে কথা বলছে দেখে তক্ষুনি ছাড়িয়ে দিতে বললেন। তখনই তাকে বিদায় করা হোল।

মা এবং আমার ভাইদের সেবা যত্নে বাবা আরও দশ বছর বেঁচে ছিলেন। হাসিও কাছে থেকে বাবার সেবা করতে পেরেছিল। ডাক্তারে মুর্গীর স্যুপ, মাংস খেতে বলে। তখন বাবুর্চি ছিল না। হাসি ইলেক্‌ট্রিক স্টোভে রেঁধে দিত। ছোটকাকা 'বীটন্‌স্‌ কুকারি বুক' বের করে ছিলেন। তাই দেখে যেদিন যা বিলিতি রান্না খেতে চাইতেন হাসিই করে দিত। ইশারায় জানাতেন, খুব ভাল হয়েছে। বরাবরের খাওয়া অভ্যেস ছিল, হাসির রান্না খেয়ে খুশী হতেন। কিন্তু হাতের তুলি আর কাজ করল না।

ইদানীং দিদির বাড়ি বিক্রী হয়ে গেলে দিদি বালিগঞ্জে চলে গেল। হাসিও নিজের বাড়িতে পার্কসার্কাসে চলে যায়। তখন গাড়ি করে বিকেলবেলায় হাসির বাড়িতে যেতেন। নিজের আঁকা ভাল ভাল ছবি দিয়ে হাসির বাড়ি সাজিয়ে দিয়েছিলেন। সেই সব ছবির বেশির ভাগই রায়টের সময় নষ্ট হয়ে যায়।

বছর দশেক ঐভাবে থাকার পর শেষে হঠাৎ একদিন কাঁপতে কাঁপতে শুয়ে পড়লেন। ডাক্তার দেখে বলল, "বুকের একদিকে কাশি বসেছে। আর রক্ষে নেই।" হাত পাও অবশ হয়ে গেল। সেই অবস্থায় দু তিনদিন থাকেন। তারপর ফাল্গুনী পূর্ণিমার রাতে দশটা নাগাত তাঁর তিনতলার ঘরে জোড়াসাঁকোর বাড়িতেই তিয়াত্তর বছর বয়সে জীবনাবসান হয়। শেষ অবধি জ্ঞান ছিল। ছেলেমেয়ে, নাতি-নাতনী সকলকে রেখেই চলে গেলেন। তারপরই বাড়ি বিক্রী হয়ে যায়। কে কোথায় চলে গেল!

(৬৭)

বাবাকে সব সময় দেখতে পেতুম নতুন কিছু করবার জন্য ব্যস্ত থাকতেন। মেয়েদের গয়না, নিজের বেশভূষা থেকে ঘরের সাজসজ্জা, সব কিছু নতুন ধরনের করেছিলেন। এলাহাবাদে গিয়ে হিন্দুস্থানীদের গয়না দেখে দিদির ও আমাদের সকলের বিয়েতেই নিজে ডিজাইন করে নতুন ধরনের গয়না গড়িয়ে দেন। আমাদের কাপড় দেখে নতুন রকমের গায়ের জোব্বা তৈরি করালেন। সারা ঠাকুর পরিবারের মধ্যে তার চলন হয়ে গেল। নতুন জিনিসের খবর সব

সময় তাঁর কাছে পাওয়া যেত। যেখানেই যেতেন, নতুন কিছু তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারত না।

তিনি খুব সৌখীন লোক ছিলেন। কুকুর, বেড়াল, পাখি, ঘোড়া, গাড়ি সব কিছুরই সখ ছিল। কিন্তু পরে সব সখ চলে গিয়েছিল। মোটর আসতে ঘোড়ার সখও চলে যায়। তবু ভাল ঘোড়া দেখলে বাহবা না দিয়ে থাকতে পারতেন না। 'চিনি' নাম দিয়ে দুটো জাপানী কুকুর পুষেছিলেন। তাদের একটা মরে যেতে অন্যটা দিদিকে দিয়ে দেন। পোষা জিনিষ মরে গেলে সহ্য করতে পারতেন না। সব কিছুর সখ চলে গেলেও ছবির সখই আরও বেশি হয়েছিল। আমি আমার ছ বছর বয়স থেকে বাবাকে আঁকতে দেখেছি। যতদিন সুস্থ ছিলেন তুলি ছাড়তে দেখিনি। বরং নতুনের দিকেই এগিয়ে যাচ্ছিলেন। কত দূরের জিনিস আমাদের কাছে এনে দিয়েছেন। মনে হয়েছে যেন সব নিজের চোখে দেখছি।

আমাদের বাগানে পুকুর ছিল। সে পুকুর আমরা জন্মাবার আগে বুজিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু বাবা স্মৃতি থেকে ছবি এঁকেছিলেন। শিশুগাছের ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে, দাসীরা কাপড় কাচছে। আর বারান্দায় চাঁদের আলোতে বসে দাসীরা সলতে পাকাচ্ছে আর গল্প করছে। ঐ সব ছবি দেখে মনে হত যেন সব কিছু আমরাই দেখেছি। সব মিলিয়ে গেছে। শুধু বহুদিন ধরে শিশু গাছটাকেই দেখেছি এইভাবে দাঁড়িয়ে আছে পুরনো স্মৃতি নিয়ে।

কত রকমের ছবি বাবার হাত থেকে বেরিয়েছে। নতুনের পূজারী কেবলই নতুনের দিকে এগিয়ে গেছেন। যখন ছবি আঁকতেন, তখন দেখেছি এক মনে বসে কোন ছবি দেখছেন। দেখতে দেখতে যেন আর ভাল লাগছে না, সেটা ফেলে দিয়ে আবার আঁকতে শুরু করলেন। কিন্তু যা চাইছেন তা মনে আসছে, হাতে আসছে না। লোকে যেমন প্রিয়জনকে নানান সাজে সাজিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে, ছবি নিয়ে তিনিও তাই করতেন। একবার দূরে রেখে, আবার কাছে এনে আলোর সামনে ধরে দেখেও আশা মেটাতে পারছেন না। তখন সামনে কেউ এলে বলতেন, "দেখ তো কেমন হোল?" সে হয়ত বলত, "বেশ ভাল হয়েছে।" তার হয়ত ভাল লাগত। কিন্তু সে কথা তাঁর যেন বিশ্বাস হোত না। মুখে সরল হাসি ফুটে উঠত। যেন বলতে চাইছেন, "আমার চিন্তার পূর্ণ বিকাশ এখনও হয়নি।" আবার রং ফলাতে ফলাতে নিজের চিন্তার

মধ্যে ডুবে যেতেন। আমরা তাঁর কতটুকুই বা বুঝতে পারতুম! ওকে যতটুকু বুঝেছি তাই লিখে আনন্দ বোধ করছি।

যখন বাড়িতে শোকের ছায়ায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলেন, তখন কথকতা ও কীর্তনের মাধ্যমে মনে শান্তির আভাস পেয়ে নিজেকে ভগবৎপ্রেমের চিন্তায় মগ্ন করে চৈতন্যলীলার রূপ দিলেন, যা জীবন্তরূপে মূর্ত হয়ে উঠল। তার পরে এল আঁধারেতে শ্মশানকালীর অভয়বাণী। সেই ছবি একজিবিশনে প্রাইজ পেল। এর পর আঁকলেন প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি। বরফের পাহাড়ে হরগৌরীর মুখ, আরও নানারকম দৃশ্য, ফুলপাতার রং ফলান, সোনার জলে মৌমাছির রাণী। এবার শুরু হোল স্বদেশী আন্দোলনের ছবি, বিদেশী শাসন কামানের মুখে ইত্যাদি। কতরকম কার্টুন আঁকলেন —'বাংলার কালি ধুলেও যায় না', শিশু বাংলার জন্ম, বড় বড় মহারথীদের কাঁধে চড়ে বুড়ো বাংলার গঙ্গাযাত্রা। এঁকেছেন ব্যঙ্গ-চিত্র—যত মানুষ তত ফ্যাশন 'চুলের কেতা', কিন্তু শেষ পরিণাম মহাকাল, তার কোনও ভুল নেই। সমাজের দোষত্রুটি সম্পর্কে সকলকে সচেতন করে দিয়েছেন বাল্যবিবাহ, বিধবার সংযম-শিক্ষা ইত্যাদি ছবিতে। বইয়ের চাপে পিষে 'সোনার চাঁদ' হলে ছেলেদের দাম বাড়ল, কিন্তু কাবুলীওয়ালার তাগাদায় মেয়ের বাপের প্রাণ যায়। চায়ের আসরে দেশী কাপড়ের মর্যাদা দিল চাপরাশী। ঘরের লক্ষ্মীদের সম্মান, নারীর সৌন্দর্য লজ্জায়, টবেতে অদ্ভুত জীবের সৃষ্টি, 'সব চলে তলে তলে', জীবন্ত গাছের বাগান, ধুতির আদর নেই ইত্যাদি অসংখ্য ব্যঙ্গচিত্রের পর যখন তা পুরণো হয়ে গেল তখন আঁকলেন স্বপন পুরীর গোপন ভাষা রঙের খেলা, সাত ভাই চম্পা। তারপর আরও গভীর চিন্তায় এগিয়ে গেলেন। এল কিউবিজম্, রংতুলির খেলা, নিজের মনের গোপন ভাষার প্রকাশ রামধনুকের রঙে। সেখানে কারও নকল কোন ভেজাল নেই। ভোরবেলা সূর্যের দিকে চেয়ে থাকতেন। বলতেন, "সূর্যের ভিতর সাতটা রং দেখা যায়।" তাঁর কল্পনায় রূপকথার রাজারাণী, আরও কত কি ফুটে উঠেছিল, তা তিনিই জানতেন। ছবির মধ্যে তার যেটুকু প্রকাশ পেত আমরা তাই শুধু দেখেছি। এরপর শুরু হল কাল সাদার ছায়াছবি, মৃত্যুদূত এল ঘোড়ায় চড়ে। জীবনেও মৃত্যুদূতের ডাক এসে পৌছল। সে জানাল, "আর যাবার পথ নেই, সব অন্ধকার। এর পিছনে কি আছে তুমি আবিষ্কার করতে পারবে না। তোমার তুলি থামাও।" হাত থেকে তুলি পড়ে গেল। তবু এগোতে গেলেন, কিন্তু বাধা পেলেন। রাঁচীর গণৎকারের কথাই

ফলে গেল্ম। রাঁচী থেকে ফিরে এসে অন্ধকার যাচ্ছে আলো আসছে সেই সময় বিছানা থেকে পড়ে গেলেন। আঁকাও বন্ধ হয়ে গেল।

রাঁচীতে সকালবেলায় বলিহার নজের গাড়ি বারান্দায় বসে আর্চের ভিতর থেকে প্রাকৃতিক দৃশ্যের একটা ছবি আঁকেন। সেই ছবিই তাঁর শেষ ছবি। এরপর আর বোধ হয় আঁকা হয়ে ওঠেনি। যখন আঁকতেন দেখেছি আর্চের দিকে চেয়ে ভাবছেন। ভাবতুম রাঁচীর দৃশ্য আঁকছেন। যখন ছবি শেষ করে দেখালেন, দেখি আর্চটা আছে, কিন্তু সে দৃশ্য রাঁচীর নয়। সে ছবিটা এত সুন্দর হয়েছিল যে দেখলেই মনে হোত সে যেন শহরের কোলাহলের বাইরে নির্জন মনের কল্পনার দৃশ্য। নদীতে নৌকা চলেছে। কোথাও কোন লোকালয়ে চিহ্নমাত্র নেই, শুধু জল আর জল। উপরে নীল আকাশ। গাছপালা, পাহাড় দেখা যাচ্ছে।– তার মধ্যে তাঁর মন নিবদ্ধ হয়ে আছে। সে ছবিটা কার কাছে আছে ঠিক বলতে পারি না। এর পরে নতুন কল্পনার আর অবকাশ পেলেন না।

(৬৮)

অনেকে আমাকে জিজ্ঞেস করে পলিটিক্সে তাঁর কি রকম মতামত ছিল। স্বাধীনতা আন্দোলনে বাবাকাকারা নানাভাবে সাহায্য করেছেন বটে, কিন্তু আমি বাবাকে কখনও কারও সঙ্গে মতামত নিয়ে তর্কবিতর্ক করতে শুনিনি। তাঁর স্বভাব ছিল যেখানে গোলমাল দেখতেন বা মতের মিল হোত না, সেখান থেকে সরে যেতেন। সামাজিক গলদ, ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গী বা পলিটিক্স নিয়ে তর্ক করতে গেলে অশান্তি আসে, কিন্তু মীমাংসা হয় না। অপ্রিয় কথার সৃষ্টি বাঁচিয়ে তিনি তুলির মুখেই সকলকে খোঁচা দিয়েছেন। বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট, বা ভারতবাসী কারও দোষ ত্রুটিকেই বাদ দেন নি।

দেশকে ভালবেসেছেন বলে কিন্তু বিদেশীকে বাবা কখনও ঘৃণা করতেন না। তাদের গুণের আদর করতে ভুল করেননি। ভালবাসা দিয়েই সকলকে আকর্ষণ করেছেন। ভালবাসাই ছিল তাঁর জীবনের মূলধন, বিধাতার কাছ থেকে পাওয়া। সেখানে আপনপর গরীব-বড়লোক বিচার ছিল না। ভালবাসা দিয়ে শত্রুকেও জয় করেছিলেন। এমন অনেকে রাগ করে তাঁকে কথা শোনাবে বলে এসেও সামনে পৌঁছে আর কিছু বলতে পারেনি।

সংসারে বাস করেও কারও সঙ্গে সামান্য ঝগড়াঝাঁটি না করেও জীবন

কাটানো সম্ভব তা বাবার জীবনেই দেখেছি। দিদিমার মৃত্যুর পরে যখন সংসারে সকল ঝামেলা থেকে নিজে অবসর নিয়ে আমার মায়ের উপর সংসারের ভার দিয়েছিলেন, সেই সময় দেখেছি কোনকিছুতে মতান্তর হলেই মা রাগারাগি করতেন। মা এক তরফাই বলে যেতেন, বাবা কোন কথা বলতেন না। মা বাবার ধৈর্যের বাঁধ ভাঙতে না পেরে বিরক্ত হয়ে বলতেন, "তোমাকে বলাও যা, দেয়ালকে বলাও তাই। কোনও কিছুই শুনতে পাবে না।" আমরা দেখে হাসতুম। কিন্তু বাবার মুখে কোন ভাবান্তর হোত না। মুখ দেখে মনে হোত যেন বলছেন, "তোমাকে তো স্বাধীনতা দিয়েছি, ছেলেরা আছে, পরামর্শ কর। আমাকে বিরক্ত কোর না।" শেষে মাও হেসে ফেলতেন। আমাদের বলতেন, "দেখনা, রাগ ধরে না!" বাবারই জয় হোত।

বাবাকাকাদের সংসার দেখলে অবাক হতে হোত। মাথার উপরে বাবা ছিলেন না। নিজেরাই কর্তা। তা সত্ত্বেও তিন ভাই এক মতে সদ্ভাব বজায় রেখে কাজ করতেন। চলা, বলা, খাওয়া, পড়া সব এক রকমের। শুধু চেহারা তফাৎ না থাকলে যমজ বললে ভুল হোত না। মেজকাকা গুণে ভাইদের চেয়ে কিছু কম ছিলেন না। সব সময় দাদার পাশে পাশে থাকতেন. দাদা যা মত দিতেন তাই মেনে চলতেন। তিনি একটু গম্ভীর প্রকৃতির লোক হলেও আমোদপ্রিয় ছিলেন। ভাল গান গাইতে পারতেন, অভিনয়েও দক্ষ ছিলেন। 'রাজা' নাটকে তিন ভাইয়ের এক সঙ্গে অভিনয়ের ছবি দেখলে সে কথা বোঝা যাবে। ফরাসী ভাষাতেও মেজকাকার বিশেষ দখল ছিল। বাগান ও গাছের সখ ছিল। বাবা গাছ জোগাড় করতেন, তিনি সাজাতেন। একই বাগানে তিনজনের মত অনুযায়ী সকলেই সখ মিটিয়েছেন। ছোটকাকার পাখির সখ ছিল, বাগানে বড় বড় খাঁচায় পাখি রেখেছিলেন। রোজ ভোরবেলায় ফড়িং ওয়ালা এসে ফড়িং দিয়ে যেত, মেজকাকাই দেখতেন। কারণ, ছোটকাকা একটু বেলায় উঠতেন। এইভাবে এক ভাই আর এক ভাইকে সাহায্য করে চলতেন।

মেজকাকার উপর জমিদারীর সেরেস্তার ভার ছিল, তিনিই সব দেখাশোনা করতেন। ছোটকাকা ওসব পারতেন না। বাবা উপর উপর দেখতেন। কিন্তু প্রজারা কোন বিষয়ে মাফ করাতে হলে বাবার কাছেই আসত।

ছোটকাকার সঙ্গে বাবার মাঝে মাঝে মতান্তর হত, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যেত একমতেই কাজ হয়েছে। এরকম না হলে শেষ অবধি একতা

বজায় রাখতে পারতেন না। বাবা যখন মারা গেলেন, ছোটকাকা দুঃখের সঙ্গে বলেছিলেন, "আজ তিনটি ধারার একটি ধারা শুকিয়ে গেল।" তখন বাড়ি বিক্রীর কথা হচ্ছিল বলে বলেছিলেন, "আমার মনে মনে ভয় ছিল, আজ বাঁচলুম।" কারণ ছোটকাকা সব সময় ভাবতেন, বাড়ি বিক্রী হয়ে গেলে কে কোথায় দলছাড়া হয়ে চলে যাবেন। বাবা তখন কথা বলতে পারতেন না, তাঁরই হয়ত কষ্ট হবে বেশি। বাবার মৃত্যুতে সেই ভয়ের অবসান হোল। সেদিন শান্তিতে নিজের জায়গায় থেকেই চলে গেলেন। ভাগ্যবান পুরুষ ছিলেন তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কারণ কথা বন্ধ ছাড়া আর কোনরকম বিকৃতি হয়নি বা জ্ঞান হারাননি। মুখে তখনও সাজানো দাঁত, মাত্র একটি দাঁত পড়েছিল। লোকে ভাবত বাঁধান দাঁত।

ছোটকাকা একবার ছোট ছোট ছেলেদের মুখোস পরিয়ে যাত্রা করান। তখন বাবার অসুখ ছিল। একটু একটু চলতে পারতেন, কিন্তু কথা কইতে পারতেন না। উপর থেকে নেমে এসে বসলেন। যাত্রা দেখে খুব আনন্দ পেয়েছিলেন। বাইরের লোক যারা আসে তাদের জানিয়ে দেওয়া হয় যে উনি কথা বলতে পারেন না। কারণ তখনও এমন সুন্দর চেহারা ছিল যে দেখে বোঝা যেত না যে তাঁর কোনও অসুখ আছে।

নিজেকে বাবা কখনও বড় করে প্রচার করতে চাইতেন না। কিন্তু তাঁর শক্তির প্রসার যে কত তা জানা গেল তাঁর মৃত্যুর পর দেশী বিদেশী বন্ধুদের শোকবার্তা থেকে। তাঁর যেমন সুন্দর চেহারা ছিল, তেমনি অমায়িক সরল প্রকৃতি। লোকে আকৃষ্ট হয়ে বন্ধুত্ব করতে বাধ্য হোত। ঠাকুর পরিবারও নেহাত ছোট ছিল না। কিন্তু সকলেই বাবাকে বেশী পছন্দ করতেন ও মনের কথা জানাতেন। অন্য লোকের কাছে হোত না। বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর পাখির দুঃখ বাবাকেই লেখেন। তিনি জানতেন বাবাই তাঁর কথা বুঝতে পারবেন। রবিদাদাও সকল কাজে বাবাকেই ডেকে নিতেন। এমনি করে নিজের ব্যক্তিত্বে ব্যাপ্ত হয়ে ছিলেন সবার মাঝে।

(৬৯)

যখন কলকাতার মাড়োয়ারীরা বড় বড় বেনেদের ও ঠাকুরবাবুদের বাড়ি কিনছে তখন অনেকেই ভাল দামে বাড়ি বেচে দেয়। সেই সময় আমাদের বাড়িও কেনবার জন্য মাড়োয়ারীরা আসে। তখন ওপাড়া মাড়োয়ারীতে

ভরে গেছে। বাবাকাকারা নেচে উঠলেন। বলেন, "সে রকম দাম পেলে ছেড়ে দেব।" বারো লক্ষ থেকে দর উঠতে উঠতে কুড়ি লক্ষ হতে সবাই মত করে, "কুড়ি লক্ষ দেয় তো বেচে দাও। এত বড় বাড়ি, মেরামত করতে না পারলে পড়ে যাবে। আর যা দিন আসছে, ক্রমেই ট্যাক্স বাড়বে।"

তখন মা শুনে বলেন, "আমি কিছুতেই এ বাড়ি বিক্রী করতে দেব না। দ্বারকানাথ ঠাকুরের বাড়ি, সাতপুরুষের ভিটে বেচে দেবে? আমি থাকতে হবে না।"

বাবা বললেন, "বিশ লাখ টাকায় তিনটে বাড়ি হয়ে যাবে। পরিবার বাড়ছে, কতদিন রাখা যাবে?"

মা-ই খালি বাধা দিয়ে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন।" বললেন, "তোমরা সবাই চলে যাও, আমি আমার ঘর ছাড়ব না। দেখি কেমন করে দাও? এমন কি দায় ঠেকেছে যে পূর্বপুরুষের ভিটে বেচে দেবে?"

বাবা ভয় পেয়ে মায়ের কাছে আর কথা তুলতে সাহস করলেন না। ছোট কাকা বলতে এসে ধমক খেলেন। মা নিজের মত ছাড়লেন না। এমন মনের জোর ছিল। তখন অবস্থা খারাপ ছিল না। ওঁরা আর বিক্রীর কথা তুলতেন না। পরে যখন জমিদারী গেল, অবস্থা খারাপ হয়ে এল, বাড়ি বিক্রী করতে বাধ্য হলেন। চার পাঁচ লাখে বিক্রী হয়ে গেল। তখন বাবা মারা গেছেন। মা বললেন, "আগে বাধা না দিলেই ভাল করতুম।" যারা কেনে তারা আধখানা ভেঙ্গে দিয়েছিল। দ্বারকানাথ ঠাকুরের স্মৃতি রাখার জন্য রবিদাদা চেষ্টা করে গভর্ণমেণ্টকে দিয়ে মাড়োয়ারীর কাছ থেকে কিনে নেওয়ার বন্দোবস্ত করায় বাকীটা থেকে গেছে।

বাড়ি বিক্রী হয়ে গেলে মা ল্যান্সডাউন প্লেসে চলে যান। মেজকাকাও হাজরা রোডে চলে গেলেন। সেখানে তাঁর সঙ্গে দেখা হোত। কিন্তু ছোটকাকা বরানগরে যেতে তাঁর সঙ্গে আর দেখা হোত না। যখন তাঁর অসুখ শুনে দেখতে গেলুম আমাকে চিনতে পারলেন না। তখন তাঁর স্মৃতিশক্তি হারিয়ে ফেলেছেন। ছোটপিসী সঙ্গে ছিলেন, অনেক চেষ্টা করলেন। বললেন, "দাদার মেজ মেয়ে পূর্ণিমা।" কিছুতে মনে করতে পারলেন না। জিজ্ঞেস করলেন, কে সুনন্দিনী?" ছোটপিসী বললেন, "চিনতে পারছ না? বুড়ি, দাদার মেজ মেয়ে।" ছোটকাকা বললেন, "না একে দেখিনি।" তখন আমার স্বামী

মারা গেছেন। আমার দাদা বেশ আগে তো দেখেন নি। দিদিকে দেখেছিলেন তাই মনে ছিল।

মেজকাকা সংসারে অনেক শোকতাপ পেয়েছিলেন। মেজকাকীর হার্টের অসুখ ছিল। ছোট মেয়ের বাড়িতে গিয়ে সেইখানেই হঠাৎ হার্ট ফেল করে মারা যান। আমাদের কারও সঙ্গেই দেখা হয়নি। কিন্তু মেজকাকা শেষ সময় আর কোন কষ্ট পাননি, সহজভাবেই মারা যান। ছোটকাকী ছোট কাকাকে রেখে আগেই চলে গেছেন। আমি যখন কেষ্টনগরে, খবর পেলুম ছোটকাকী মারা গেছেন। তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়। কলকাতায় বোমা পড়ার ভয়ে পালিয়েছিলুম কেষ্টনগরে। আমার স্বামী সেখানেই মারা গেলেন। তখন তাঁর অসুখ ছিল, আর সেখান থেকে ফিরতে পারলেন না। আমরা ফিরে আসার পর কলকাতায় বোমা পড়তে শুরু করল।